জাগরণ ও বিস্ফোরণ

[বাঙ্গলার সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত]

প্রথম খণ্ড

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
শ্রাবণ, ১৩৬৯

প্রচ্ছদসজ্জা :
বিভূতিসেনগুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

'যাদুদা'র

(ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায)

করকমলে

শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

স্নেহধন্য

কালীচরণ

ভূমিকা

কোনও বিশিষ্ট ঘটনার অভিব্যক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সশস্ত্র-বিপ্লব-সংক্রান্ত সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন অতি গোপনে সম্পন্ন করতে হয়েছে। যাঁরা এইসব দুঃসাহসিক বিপদসঙ্কুল কাজের উদ্যোক্তা, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী ছাড়া অন্য লোকের পক্ষে মন্ত্রগুপ্তি ভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এরকম ক্ষেত্রে নিছক আক্রমণাত্মক কার্য্য-কলাপের বিষয় নিয়ে বই-লেখায় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর। পুলিশ-দপ্তরে যে-সকল নথিপত্র আছে, তার সাহায্যে একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। প্রধানতঃ ঐসকল তথ্য গুপ্তচরের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সে-কারণে সেগুলি কেবল অসম্পূর্ণ নয়, ভ্রমপ্রমাদ নিয়ে গড়া। উপরন্তু, আসল তথ্যপূর্ণ 'ফাইল' দেখবার সুযোগ এপর্য্যন্ত কেউ পেয়েছেন বলে শোনা যায় না।

এসব কারণে বাঙ্গলার (সশস্ত্র) বিপ্লবের ওপর ইতিহাস তো নয়ই, "গল্প হলেও সত্যি" কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। যাঁরা কোনও কোনও বিশিষ্ট ঘটনার কথা জানতেন, তাঁরা কেউ বলেননি। অতি অল্পসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিপ্লবের স্মৃতি ছাড়া, বিশেষ নির্ভরযোগ্য "কাহিনী" কিছুকাল পূর্ব্বেও খুব বেশী ছিল না। সম্প্রতি কয়েকজন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক তাঁদের প্রকাশিত রচনা দিয়ে এ-অভাব কিছুটা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় সে-সকল মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়।

পূর্ব্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি যে-পুঁথি প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তার ঐতিহাসিক মূল্য যে কতখানি, সেটা পাঠকের বিচার্য্য বিষয়। তবে মনে হয়, এখানি পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে কিছুটা কাজে লাগতে পারে, তার বেশী এর প্রয়োজনের কথা বলা কঠিন।

বাঙ্গলায় ধীরে ধীরে ইংরেজের রাজশক্তি-গ্রহণ, জাতীয় চেতনার বিকাশ, সশস্ত্র বিপ্লবের বজ্রাগ্নিস্ফুরণ, অহিংস নীতির প্রভাব এবং পরিশেষে যুগপৎ অহিংস ও সহিংস সংগ্রামের ধারার পরিচয় দিয়েছি। যাঁরা প্রথমযুগে বাঙ্গলাকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদের দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, মহানুভবতা, সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। এঁদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে দেশকে স্বাধীন করতে একদল এসেছিলেন, যাঁরা মানুষের যা-কিছু কাম্য—বিদ্যা, বিভব, খ্যাতি, সুখশান্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের "আখের"-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি তুচ্ছ মনে করে অকল্পনীয় কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করেছেন—দেশজননীর

বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করে বিলীন হয়ে গেছেন। তারই পরে, যাঁরা বৈপ্লবিক কার্য্যের সংস্রবে ফাঁসি, আইনের বাঁধনে আবদ্ধ অবস্থায় থানাতে এবং অন্তরীণ থাকা-কালীন পুলিশের প্রহারে, বন্যজন্তুর দংশনে, আত্মহত্যায় বিলুপ্ত হয়েছেন—তাঁদের বিষয়, এবং যাঁরা স্বাধীনতালাভের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছেন, তাঁদের হত্যা-কাহিনী বলা হয়েছে।

যাতে বিপ্লবের গতিবেগ সম্যক্ শক্তিলাভ করেছে এরকম ঘটনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদের শেষ পরিণতি সবিস্তারে বিবৃত করতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তাঁদের সঙ্গে স্মরণ করেছি, যাঁরা বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে তিন বছর অথবা তার বেশীকাল স্থানীয় জেলে বাস থেকে "কালাপানি" পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন। এ তালিকা হতে বহু বৈপ্লবিক ঘটনা ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণের নাম বাদ পড়াই সম্ভব। তিন বছরের অনধিক কালের জন্য দণ্ডিত দেশসেবকদের সংখ্যা বিরাট। অনেকেই দৈবক্রমে দীর্ঘ মেয়াদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এঁদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। স্বল্প মেয়াদের দণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হয়নি। পূর্ব্ববঙ্গ (বাঙ্গলা দেশ)-র পত্রিকাদিতে যে-সকল বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং নিশ্চেষ্ট থাকা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না।

বৈপ্লবিক ঘটনা ও জাতীয় আন্দোলনের চাপে যে-সকল শাসন-সংস্কার ('রিফর্ম্ম') এসেছে, সংক্ষিপ্তভাবে যথাস্থানে তারও উল্লেখ আছে। এরা স্বাধীনতার অগ্রগতির পথে নিশানা (landmark) রেখেছে। এ বিষয় জানার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্বাধীনতার ইতিহাস বোঝবার পক্ষে খানিকটা সুবিধা হবে।

বাঙ্গালীর বড় দুর্নাম—সে কাপুরুষ, কর্ম্মবিমুখ। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ১৯৪৮ ডিসেম্বর ১৭-ই, বলেন: "Bengalis are not strong, they only know how to weep. I am a blunt man and I would say what I feel." স্পষ্টবক্তা সর্দ্দারজীর মতে: "দুর্ব্বল বাঙ্গালী কেবল কাঁদতেই জানে"। এ উক্তির সারবত্তা বিচার করবার জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' কিছু রসদ সরবরাহ করতে পারে।

গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তু কিছুসংখ্যক পাঠকের কাছে অপরিচিত না-হবার কথা। 'প্রবাসী', 'অমৃত', 'কম্পাস', 'জয়শ্রী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় সবটাই প্রকাশিত হয়েছে। এ সুযোগ দেবার জন্য আমি সম্পাদক-মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুস্তক-প্রণয়নে বহু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধবের সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের একাংশেরও নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মধ্যে কয়েকজন মাননীয় সদাশয় ব্যক্তি ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাচীন নথিপত্রের ভাণ্ডার (Archives) এবং সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি থেকে বহু অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়েছি। লাইব্রেরিয়ান শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁর সহকর্ম্মিবৃন্দ অকাতরে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সরবরাহ করেছেন। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বন্ধুবর ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় জে. সি. মৈত্র মহাশয়ের পরিচয়ে—হাইকোর্টে সযত্ন-রক্ষিত দলিলপত্র পরীক্ষা করবার অনুমতি দান করেন তদানীন্তন মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় দীপনারায়ণ সিংহ মহাশয়। এঁদের অনুকম্পা অভিভূত চিত্তে স্মরণ করি।

পুলিশ (C.I.D.)-বিভাগের পর পর তিন ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল (D.I.G.) শ্রীপ্রসাদকুমার বসু, শ্রীবিষ্ণু বাগচী ও শ্রীরঞ্জিৎকুমার গুপ্ত মহাশয়গণের সহৃদতায় সাধারণের অনধিগম্য বহু তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি। এঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। পুলিশ-দপ্তরে কাজ করবার সময় যথানিয়মে মাঝে মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দেখা দিয়েছে; এরকম অবস্থায় পশ্চিমবাঙ্গলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী, পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তক্ষেপে সে-অসুবিধা বহুলাংশে দূর হয়েছে। তাঁর নিঃস্বার্থ সহায়তা সকল প্রশংসাবাণীর ঊর্দ্ধে। এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

পুস্তকের ভাষা ও প্রুফ-সংশোধনে এবং মুদ্রণ-ব্যাপারে যথাক্রমে কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস-এর প্রীতিভাজন শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাস্পদ শ্রীপ্রশান্তকুমার (গৌর) সেনের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেছি। বই-প্রকাশের ভার নিয়েছেন পরমহিতৈষী অকৃত্রিম বন্ধুবর শ্রীত্রিদিবেশ বসু মহাশয়। তাঁকে আমি আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আমার অযোগ্যতা ও দুঃসাহস গ্রন্থের সকল অনুপপত্তির মূলে অবস্থিত। সহৃদয় পাঠক এগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, নিজেকে ধন্য মনে করবো।

কালীচরণ ঘোষ

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
২৪	১১	স্কুলের	কলেজের
১৩০	১৩	১১০৫	১৯০৫
	১৯	নাথ	প্রসাদ
১৩১	৪	এই	পূর্ব্বের
২৪৫	৩	Lagislative	Legislative

সূচীপত্র

জাগরণ

জন্মগত অধিকার

প্রত্যেক জাত উদ্ভবের সঙ্গেই স্বাধীনতার অধিকার লাভ করে থাকে। ভাগ্যদোষে প্রবলের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হয়ে কোনও না কোনও একসময়ে প্রায় সকল জাতিকেই অন্য দেশের শাসন মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু সে-অবস্থায় একটা আত্মসম্মানদৃপ্ত জাতি চিরকাল শান্ত হয়ে থাকেনি। কালের গতিতে, অনুকূল পরিবেশে সঙ্কল্পের বীজ অংকুরিত হয়ে স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রাম দেশে দেশে কালে কালে চলে আসছে। যদি শক্তিমান কর্তৃক পররাজ্য অধিকারের কাহিনী ইতিহাসের অঙ্গ হয়, তাহলে বিজিত জাতির মুক্তি-সংগ্রামের বিবরণ তা হতে সংক্ষিপ্ত ত নয়ই, বরং সেটাই ইতিহাসের বৃহত্তর ও মহনীয় সম্পদ।

ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ জাতিপুঞ্জের মধ্যে ইংরেজ-বিতাড়ন অধ্যায়কে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বলে বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ সঙ্ঘর্ষ অতি আধুনিক কালের পরিচয়। ভারত বহিরাক্রমণ-বিমুখ হলেও বহুকাল হতে মাঝে মাঝে পররাষ্ট্র কর্তৃক নিজ রাজ্য অধিকারের স্বাদে বঞ্চিত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীকে বিতাড়নেব চেষ্টাও চলেছে। ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করছে।

আর্য্যদের ভারত অভিযানের কথা উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট, তার বেশী আর প্রয়োজন নেই। তাঁদের অবস্থানই ভারতেব প্রকৃত পরিচয়; আর সে ঘটনা কত শত বা সহস্র বৎসর আগে ঘটেছে সে-আলোচনার স্থান এটা নয়। যখন 'সময়'কে সাল-তারিখের মাপকাঠিতে বাঁধা আরম্ভ হয়েছে, সেই সকল দিনের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের ঘটনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট হবে।

ভারতবর্ষ যদি সভ্যতার প্রাচীনত্ব দাবী করে তাহলে সম্ভবতঃ চীন ও মিশর ছাড়া অন্য দেশের সঙ্গে কালের ব্যবধান নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ হবে। সে ঐতিহ্য ভারতকে রক্ষা করতে পারেনি। খৃষ্টজন্মের পাঁচশ' বৎসর আগে পারস্যের আক্রমণকে প্রথম বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তারপরে মাসিদন-সম্রাট আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকদের আক্রমণ, খৃঃ পূঃ ৩২৬। মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি ইউয়ে-চি (Yueh-Chi) খৃষ্টজন্মশতকে ভারতে প্রবেশ করে এবং উত্তর-পশ্চিমের ক্ষুদ্র এক অংশ দখল ক'রে নিজেদের শাসনাধিকারে রাখে। এদেরই পরবর্ত্তী বংশধরদের এক শাখা কুশান বলে পরিগণিত হয় এবং ভারতের বিস্তৃত অংশে আধিপত্য করে; এটা অনুমান ৪৮ হতে ২২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এদের মধ্যে কণীষ্ক (এবং বাসুদেব) খ্যাতিলাভ করে ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান গ্রহণ করে আছেন। বর্ত্তমান পেশোয়ার তাঁর রাজধানী এবং রাজ্যসীমা পূর্ব্ব আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের

বিস্তৃত অংশ পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। কণীষ্ক পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শিল্পকলা, স্থাপত্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর যা অবদান তাতে তাঁকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে গ্রহণ করা হয়। বস্তুতঃ (শক) কুশান আক্রমণ কণীষ্কের আমলে নবরূপ ধারণ করে।

ভারতের সর্ব্বংসহা আপন-করে-নেওয়া শক্তির মধ্যে শকরা মিলিয়ে যায়। এমন সময় হূণ (White Huns or Epithalites)-এর আবির্ভাব। পঞ্চম শতাব্দীতে তারা গুপ্ত সম্রাটদের শক্তির নিকট পরাভূত হলেও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম অংশে গঙ্গার অববাহিকা প্রদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করে বসে। শকল বা শিয়ালকোট তাদের রাজধানী। সম্রাট কণীষ্কের গুণের কোনও অংশ পেয়েছিল বলে কোথাও উল্লেখ নেই, তবে তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা মিহিরগুল নিষ্ঠুরতার জন্য ভীষণ দুর্নাম অর্জ্জন করেন। শেষ পর্য্যন্ত পারস্যের হাতে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটায় ভারতের ভূমি থেকে তাদের অন্তর্দ্ধান ঘটে।

প্রতিটি বহিরাক্রমণ প্রতিহত করবার প্রবল চেষ্টা তার সঙ্গে-সঙ্গেই হয়েছে। পুরু বা পোরস্, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, যশোবর্ম্মণ, বলাদিত্য প্রভৃতি শূরবর্গ বিদেশী প্রভাব ক্ষুণ্ণ অথবা নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বহিরাগত জাতিপুঞ্জ কেউ বা প্রত্যাবর্ত্তন আর কতক বা ভারতবাসীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে।

মুশ্লিম অভ্যুদয়

যখন ভারতবর্ষে নানা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন চলছে, তখন ভারতের সন্নিকটে ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটেছে। নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ পরলোকগমন করেন ৬৩২ খৃষ্টাব্দে। ধর্ম্মপ্রসারের সঙ্গে মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে এবং অচিরকালের মধ্যে নবধর্ম্মাবলম্বীরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ে।

দেশ অধিকার করার কথা মনে না করলেও, বলা যায়, ৬৬৪ সালে মুহল্লাব নামে এক মুসলমান আরব দেশ থেকে ভারতে এসে প্রবেশ করেন। নতুন দেশের সন্ধান করাই হয়ত তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মুলতান পর্য্যন্ত এসে তাঁর দলবল ফিরে যায়।

প্রকৃত আরব আক্রমণ, শক্তির প্রয়োগ ও শত্রু পরাজয়ে অধিষ্ঠান ঘটে ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাশেমের নেতৃত্বে। সিন্ধু দেশের রাজা ডাহির পরাভূত হলেন। কিছু-সংখ্যক তুর্কী (মুসলমান) ভারতে থেকে গেলেও এক বৎসরের মধ্যেই অবশিষ্ট মুসলমান ভারত ত্যাগ করে চলে যায়।

তখনকার মত আপদ বিদায় হ'ল ; কিন্তু ভারতের ভাগ্যাকাশে নতুন মেঘ জমে উঠছিল। তদানীন্তন ভারতের সীমান্ত থেকে ২০০ মাইল দূরে গজনীতে আলেপ্‌টিগিন কর্ত্তৃক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর দেহাবসানে ক্রীতদাস সবক্তিগিন রাজ্যভার গ্রহণ করেন। লাহোরের হিন্দু রাজা জয়পাল ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গজনী অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু শেষ ফল শুভ হয়নি। সন্ধি ও পরে বিচ্ছেদ এবং পুনরায় সংগ্রাম। সবক্তিগিন ৯৬১ সালে জয়পাল ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ অপর রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন। সবক্তিগিন নিজে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন, কিন্তু রেখে গেলেন একজন মুসলমান প্রতিনিধি।

প্রতি-আক্রমণে হিন্দুরাজগণের আপ্রাণ চেষ্টার কথা লিখতে গেলে নূতন ইতিহাস গড়ে ওঠে। সুতরাং সে প্রচেষ্টা বর্জ্জন করাই সমীচীন। তবে সকল ক্ষেত্রেই অল্প-বিস্তর সফল-বিফল সঙ্ঘর্ষ, ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে, সে সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করে। যখন মুসলমান শাসন দক্ষিণ ইউরোপ দিয়ে শেষ প্রান্ত স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে, হিন্দুস্থানের দিকে তারা অগ্রসর হতে পারেনি। হিন্দু রাজাদের পরাক্রম তাদের আগমন রোধ করেছে। ভারতের দিকে আগমনের বিলম্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হাণ্টার বলেছেন, "The long delay was due, not only to the daring of individual tribes, such as the Sind Rajputs, but to the military organisation of the Hindu Kingdoms."

আরও বলেছেন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (smaller States) রাজাদের (হয়ত অন্তর্দ্বন্দ্বে মগ্ন) "had a certain power of coherence to oppose a foreign invader, while the large number of the groups and units rendered conquest a tedious process. For even when the overlord or the central authority was vanquished, the separate groups and units had to be defeated in detail, and each State supplied a nucleus for subsequent revolt". (W. W. Hunter, *Imperial Gazetteer*, Vol. VI, p. 268-9)

প্রতিরোধশক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলমান আক্রমণ প্রবল বন্যার মত এসে পড়েছে। গজনীর মামুদ ১০০১ থেকে ১০২৪ পর্য্যন্ত সতেরো বার ভারতবর্ষের নানা স্থান লুণ্ঠন করেছেন। তারপর ঘোর, দাস, খালজি, তুঘলক্, সৈয়দ, লোদী পর্য্যন্ত নানা বংশের আবির্ভাব তিরোভাব ঘটেছে ১০২৪ থেকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

তারপর মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। বাবর (১৫২৬ খৃষ্টাব্দ) থেকে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত সকলে মিলে ২৩৫ বছর কাটিয়েছেন। মোগলশাসনকে রাজপুত, শিখ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বড় বড় শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে—জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। যদি শ্বেতাঙ্গ জাতি এসে না পড়তো তাহলে মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসাবশেষের ওপর মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব ছিল না।

মোগল সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাসকাল ১৭০৭-১৭৬১। আওরঙ্গজেবের পর এক মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮) ব্যতিরেকে যাঁরা এসেছেন, ছায়াবাজীর ন্যায় এক থেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছেন। আর মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে পারস্যাধিপতি নৃশংস নাদীর শাহ কর্ত্তৃক দিল্লীতে হত্যা ও লুণ্ঠন (১৭৩৯-৪০) ঘটে। এই গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার রাজ্যে শ্বেতাঙ্গরা কেমনভাবে বল অপেক্ষা ছল ও কৌশলের সাহায্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

আওরঙ্গজেবের ভগ্নদশাকালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন (১৭০২)। মুর্শিদের মৃত্যুতে সুজাউদ্দিন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নবাব হন (১৭২৫-১৭৩৯)। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুতে সরফরাজ খাঁর এক বছর মাত্র (১৭৩৯-৪০) নবাবী আমলে বিহারের নবাব নাজিম আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক গিরিয়ার (রাজমহল) যুদ্ধে নিহত হন এবং বিজেতা বাঙ্গলার মসনদে নবাব (১৭৪০-১৭৫৬) হয়ে বসেন।

আলিবর্দ্দীর শূন্য আসনে বসলেন হতভাগ্য দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। ইতিহাস নতুন ধারায় লেখা আরম্ভ হ'ল।

বণিকের রূপান্তর

পলাশী-প্রাঙ্গণে বাঙ্গলা স্বাধীনতা হারিয়েছে বলে প্রচলিত জনমত। প্রকৃত-পক্ষে তার অনেক আগে থেকে ইংরেজ এমন শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে যে পলাশী-প্রহসন মঞ্চস্থ না হলেও ইংরেজ বাঙ্গলা (তথা ভারত) শাসন-নাট্যক্ষেত্রে স্বরূপে প্রকাশিত হওয়ার প্রতিকূলে এক চক্ষুলজ্জা ছাড়া আর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। যুদ্ধটা জয় করে তার বোরখা খুলে গেল মাত্র।

যখন রাজ্যলাভের স্পৃহা খুব স্পষ্ট ছিল না, তখন মোগল বাদশাহদের সুদিনের মধ্যেও বিদেশীরা নিজেদের বাণিজ্য বিষয়ে নানা সুযোগ আদায় করে নিয়েছে। এইগুলিই সময়কালে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সহায়ক হয়েছে। ইংরেজ না হলে ওলন্দাজ, আর তা না হলে ফরাসী একদিন ভারতের অন্যতর রাজশক্তি হয়ে বসতো। তবে তাদের শঠচূড়ামণি "ক্লাইভ" ছিল না। হয়ত একটু বেশী সময় লেগে যেত। সে বিচারে ১৭৫৭ জুন ২৩-এ দিনটা ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র।

ইউরোপের পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য দূব প্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশগুলির সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে যাত্রা শুরু করলেও ক্রমে ভারতে রাজ্য-বিস্তারের ওপর সকলেরই লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। সীমাহীন সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে ভাস্কো-দ্য'গামা ১৪৯৮ মে ২০-এ ভারতের উপকূল কালিকটে উপনীত হন। পথের সঙ্গে পোর্টুগীদের চোখও খুলে যায়। ক্রমে লক্ষ্য দাঁড়ালো রাজ্যদখল ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ("to conquer territory and to promote the spread of Christianity")। বাণিজ্য সংস্থাপন চেষ্টায় আরব বণিকদের সঙ্গে ১৫০৮ সালে নৌযুদ্ধ ঘটে এবং আরবরা পরাজিত হয়। সাহস বৃদ্ধির সহিত ১৫১০ সালে পোর্টুগীরা গোয়া দখল করে। শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক এই প্রথম ভারতের ভূমি অধিকার। তখন দিল্লীর মসনদে লোদী বংশ অধিষ্ঠিত। বিদেশীরা দমন, দিউ, পাঞ্জিম, সালসেট্, হুগলী প্রভৃতি দখল করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে।

১৫৯০ থেকে ১৬১০ পর্য্যন্ত পোর্টুগালের ভারত-বাণিজ্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। পরে ধীরে ধীরে সেটা লুপ্ত হয়ে যায়।

প্রায় শত বৎসর পরে অপর এক ইউরোপীয় শক্তি ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এবারে এলো **ওলন্দাজ** (হল্যাণ্ড); ক্ষুদ্র তার আয়তন ইউরোপে। প্রাচ্যে বাণিজ্যের জন্য ১৬০২ সালে কোম্পানী গঠিত হয় এবং ১৬০৪-তে তারা ভারতে 'কারখানা' স্থাপন করে। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূর প্রাচ্যের

মশলা বাণিজ্যের দিকে। পথেও পড়ছে আর ভারতের সঙ্গে পোর্টুগাল বিরাট বাণিজ্য করছে, সুতরাং এদিকেও তারা কিছু মনঃসংযোগ করেছিল। ১৬০৯ সালে মাদ্রাজে তাদের সর্ব্বপ্রথম আস্তানা স্থাপিত হয়। ১৬২৫-তে বাঙ্গলার চুঁচুড়ায় তাদের প্রথম ঘাঁটি; পরেরটি ১৬৫২ সালে মাদ্রাজে। ভারত-বাণিজ্যে ওলন্দাজরাই পোর্টুগীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল। ১৬৯৬ সালে ওলন্দাজ সরকার সামরিক ব্যয় সঙ্কোচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ওলন্দাজ শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হলেও "মরিয়া না মরে" তার অবস্থা।

পোর্টুগাল, হল্যাণ্ড হয়েছে, এইবার **ডেনমার্ক**-এর পালা। ১৬১৬-তে প্রাচ্যে বাণিজ্যমানসে কোম্পানী গঠিত হয়েছিল। ভারতে প্রথম আগমন ঐ সালেই। দক্ষিণ ভারতে ট্রাঙ্কোবারে ১৬২০-তে কুঠী-স্থাপন তার প্রধান পরিচয়। কোনোও রকমে টিঁকে থেকে ১৭৫৫-তে বাঙ্গলায় শ্রীরামপুরে দিনেমাররা আর এক কুঠী স্থাপন করে। বিশেষ শক্তি সঞ্চয় তারা কখনও করে উঠতে পারেনি। ১৮৪৫-তে ইংরেজকে সব বিক্রী করে সাজপাট তুলে ফিরে যায়।

ভারতে বাণিজ্যের সন্ধানে আগন্তুকদের পরের দল হচ্ছে ইংরেজ। তাদের কথা বড় করে বলতে হবে, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তাদের "কোম্পানী" স্বয়ং "মহারাণী" হাতে নিয়ে ভারতকে ইংলণ্ডের অধিকৃত সাম্রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। আপাততঃ অপর দু-একটির কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

ফরাসী দূরপ্রাচ্যে বাণিজ্য ব্যপদেশে গেলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের টনক নড়ে অনেক পরে। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে জাভার সঙ্গে বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের উপকূলে প্রথম ফরাসী জাহাজ ১৬৩৩-তে পৌঁছায়। হালচাল বুঝে ১৬৬৪-তে "কোম্পানী" স্থাপিত হয় এবং তাদের বাণিজ্যপোত আসে ১৬৬৭-তে। সেই থেকে ভারতের নানা স্থানে কুঠী সংস্থাপিত হয়েছে। প্রথমটি হ'ল সুরাটে (১৬৬৮); পরে পরে পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল, চন্দননগর এবং মাদ্রাজে সম্পত্তি দখল পর্য্যন্ত হয়ে গেল। তারা ভারতীয় রাজা, নবাব এবং পোর্টুগালী ও ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে ডুপ্লে আসার পর (১৭৩১) রাজ্যবিস্তারের দিকে একটা ঝোঁক বড় করে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তত-দিনে ফ্রান্স রাজ্যবিস্তারনীতি পরিবর্ত্তন করায় ভারতে তার শক্তি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

জার্ম্মানীর কথা এখানে সেরে নেওয়া যাক। অষ্টেণ্ড কোম্পানী নামে তার আবির্ভাব। ছোটখাটো দুটো জায়গা (তন্মধ্যে একটা বাঙ্গলায়) অধিকার বা ক্রয় করা ছাড়া তারা বাণিজ্যের দিকে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। ১৭২২ থেকে ১৭২৭ পর্য্যন্ত এখানে তাদের অবস্থিতি। এর মধ্যে আর-সব "কোম্পানী" একজোট হয়ে তাদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

ইংরেজ

ঘটনা-পরম্পরা থেকে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব্বে ভারত বাণিজ্য সংস্থা (East India Company) গঠনে ইংরেজ হচ্ছে বিলম্বিত অভিযাত্রী। রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের আমলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে শুভ শেষ দিনটিতে গঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল রেশম, কার্পাস এবং হীরা প্রভৃতি মূল্যবান আকরিক প্রস্তরের বাণিজ্য। পরবৎসরই তাদের জাহাজ ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে আসে। এর পর বাণিজ্য ভালই চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে ভারতের মাটিতে পোর্টুগী ও ওলন্দাজদের মধ্যে প্রভাববিস্তারের সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ এসে হাজির; আর সঙ্গে রয়েছে ফরাসী কোম্পানী। এদের মধ্যে পরস্পরের বিরোধের কাহিনী বর্ণনা করে লাভ নেই। কখনও মাত্র দু'দলে, কখনও বা জোট বেঁধে দু-তিন দল অপর একক দলের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। কুঠী বা অন্য সম্পত্তি (জমিজমা) দখল ও বে-দখল হয়েছে। কখনও নিজেদের মধ্যে সন্ধি হয়েছে, আর অল্পকালের মধ্যে তাকে ভেঙ্গে ফেলে আবার লড়াই চলেছে। প্রথম দিকে জোর লড়াই হয়েছে পোর্টুগী ও ওলন্দাজদের মধ্যে; আর শেষের দিকে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে। স্থানীয় শাসকবর্গ ও বাদশাহ পক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে বিরোধ সময় সময় গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ১৬৭১-এ পোর্টুগীদের শিবাজীর আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে শত্রুতা বা মিত্রতা ভারতে উভয়ের পরস্পরের ব্যবহারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারতের শাসকবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়; তাতে অংশ গ্রহণ করে বিদেশী বণিকের দল নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে নিয়েছে; আবার নিজ স্বার্থে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করায় সকল পক্ষের কাছে প্রিয় হয়েছে। ১৬৬৮-তে শিবাজীর সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজের সঙ্ঘর্ষ হয়; ১৬৭০-এতেও হয় আর একবার। শেষটা ১৬৭৪ এপ্রিল ৬-ই সন্ধি স্থাপিত হয়। তখন ইংরেজের মর্য্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আসল কাজের ব্যাপারে ধূর্ত্ত বণিকের দল সদা-সর্ব্বদা সতর্কতার পরিচয় ভালভাবেই দিয়েছে। ১৬১৮-তে পোর্টুগী প্রতিনিধি দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। অনুরূপভাবে অন্যদলও সে পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছে; বিশেষ করে ইংরেজ। তারা অচিরেই বুঝে নিয়েছিল কোন্‌টা দিল্লী আর কোন্‌টা বোম্বাই-মাদ্রাজ-বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার 'দস্তক' পেলে তাদের সুবিধা হয়। যেটাই যখন অগ্রগমনের পথে সুযোগ এনে দিয়েছে, সেইটা অপরকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদের আদেশ মেনেই চলছে। ঝগড়াঝাঁটি করতে হয়, পরোয়ানা-দাতারা করে মরুক, কোম্পানীর কর্ত্তারা কারও আদেশ অমান্য বা কাকেও উপেক্ষা করে অসম্মান প্রকাশ করতে চান না। দাবাখেলার এই বড়ের চালে ইংরেজ বুঝিয়েছে যে অনবরত প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব করার চেয়ে এ-পথ ঢের সস্তা, সুগম, দ্রুত ফলপ্রসবে নিপুণ।

এখন সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও ভাগ্যবান ইংরেজ জাতির কথায় আসা যাক্। দেখা যাবে পলাশীর যুদ্ধের আগেই তারা ভারতবর্ষকে অক্টোপাশের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে বসে আছে। পলাশী না হলে অন্য এক ক্ষেত্রে তাদের দুর্দ্দমনীয় আগ্রাসী লোভ পরিতৃপ্তি লাভ করতো।

জাহাঙ্গীরের কাছে পোর্টুগীরা যেমন হাজির হয়েছিল, এদিক-ওদিক কিছু বেঁধেছেঁদে ১৬১৩-তে ইংরেজ প্রতিনিধি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এক ফার্ম্মান-বলে সুরাট, ঘোগা, আহম্মদাবাদ ও কাম্বেতে ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি সংগ্রহ করে। ১৬১৫ (ফেব্রুয়ারী ৭-ই) দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে সমস্ত মোগল অধিকারে বিনা বাধায় বাণিজ্যের অনুমতি পাওয়ায় অপরাপর 'বেনিয়া' অপেক্ষা তার একটা অতিরিক্ত সুযোগ মিলে যায়। (১৬১৮) মোগল সাম্রাজ্যে আগরা, আহম্মদাবাদ, বুহ্‌রাণপুর, বরোচ, সুরাট, মসুলিপট্টম ও নেগামপট্টমে ফ্যাক্টরী বা ঘাঁটি স্থাপন করে। অপর "কোম্পানী"রা তখন পিছিয়ে পড়তে থাকে।

এর মধ্যে সামান্য হলেও একটি বিশেষ ঘটনা নিতান্ত উপেক্ষা করবার মত নয়। দেশের শাসনকর্ত্তার হাত থেকে কোম্পানীর কর্ম্মচারীর (ফৌজদারী) অপরাধ-ঘটিত শাস্তি "কোম্পানী" নিজ হাতে গ্রহণ করে (১৬২২)। শেষে এমন দাঁড়ায় যে গুরুতর অপরাধে ভারতীয় আইনের সাজা-শাস্তি থেকে রক্ষা করবার জন্যে আসামীকে খাস ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেবার হুকুম আসে (১৬৬৮); অর্থাৎ মোগলশাসনকে উপেক্ষা করবার বড় ফন্দী আবিষ্কৃত হয়।

বাণিজ্যের দিক থেকেও প্রায় স্বকর্ত্তৃত্ব এসে যাচ্ছে। সারা মোগল রাজ্যে বিনা শুল্কের ব্যবসার অনুমতি লাভ হয় ১৬৪৫-তে ; বোম্বাইতে নাগরিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ট্যাক্স আদায় করবার ক্ষমতা-লাভ ঘটে ১৬৭৯-তে। আর বিশেষ বিবরণ দিতে গিয়ে পুঁথির কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। এক কথায় বলা চলে, পলাশীর আগেই মাদ্রাজ (১৬৪০), বোম্বাই (১৬৬৯) এবং কলিকাতায় (১৬৯৬) তিনটি দুর্গ নির্ম্মিত হয়েছে এবং সেগুলি ইংরেজদের দখলে রয়েছে। অতিরিক্ত ক্ষমতার পরোয়ানা আসে দ্বিতীয় চার্লস্-এর কাছ থেকে (১৬৬১), যার বলে ভারতের "কোম্পানী" বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, শান্তি-চুক্তি প্রভৃতি নিজ ইচ্ছামত করতে পারবে। এসকলকে প্রকাশ্যে প্রাধান্য না দিয়ে "কোম্পানী" বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে সূতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম কিনে নিয়েছিল (১৬৯৮)। ইজারা-পত্তন নয়, এখন ইংরেজ দস্তুরমত ভারতের জমির মালিক।

ইংরেজের সাহস এখন সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে। বাঙ্গলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের বিরুদ্ধে তারা দিল্লীর বাদশাহ ফরকশিয়ারের কাছে নালিশ করে এবং কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী অতিরিক্ত আটত্রিশটি জনপদ কিনে নিতে (১৭১৫) সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংরেজ নানা ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধ করে দুই বিবদমান দলের এক পক্ষের যুদ্ধে অংশ নিয়ে বা তা হতে বিরত থেকে, আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার বিস্তার করে ইংরেজ অপর শ্বেতাঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বীদের নামমাত্র শক্তিতে পর্য্যবসিত করে। ইংরেজ ভারতীয় শাসনযন্ত্রে এ-সময় পরোক্ষভাবে একটি প্রকাণ্ড অংশীদার বলে পরিগণিত হতে চলেছে।

"পলাশী"র আগে ও পরে

ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিম উপকূলে ত বটেই, বড় নদীর তীরভূমিতে ইংরেজের ঘাঁটি (ফ্যাক্টরি) গড়ে উঠেছে। এগুলি কেবল ব্যবসার কেন্দ্র নয়, শত্রুর আক্রমণ রোধ করা এবং এখান থেকে হঠাৎ সশস্ত্র হামলা করে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করাও সম্ভব ছিল। "ক্ষুদ্র দুর্গ" হ'ল এদের ঠিক পরিচয়। কোথাও "নবাব"-বাদশাহের জ্ঞাতসারে বা গোপনে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদেরই প্রয়োজনবোধে অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত করে এসব জায়গায় রাখা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এতটা বল-পরাক্রম নিয়ে চুপ করে বসে থাকা সকলের পক্ষেই অসম্ভব। সুতরাং এখানে-ওখানে নবাবী শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আর নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে ছোট-বড় বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করা হ'ল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সিরাজউদ্দৌলার বয়স কাঁচা, আদরে প্রতিপালিত, শাসনের কূটনীতি অধিগত করবার সময় পাননি; স্বভাবে ছিল অব্যবস্থিতচিত্ততা। ওদিকে চারিত্রিক দোষের কুৎসাও রটে গিয়েছিল। চতুর লোকে ঐসব ত্রুটিকে বিশেষভাবে তাঁর বিপক্ষে প্রয়োগ করেছে।

হিন্দু-মুসলমান "জাঁহাবাজ", কূটনীতিতে ঝানু, দেশের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ, যশ লাভে ব্যস্ত একটা দল নবাবকে ঘিরে রয়েছে। অনভিজ্ঞ সিরাজের পক্ষে সেই কুজ্ঝটিকাজাল ভেদ করে প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করার শক্তি ছিল না। যেটুকু ছিল সেটুকুও কার্যকর হয়নি, কারণ ধূর্ত্ত, শঠ, স্বার্থান্বেষী পারিষদবর্গের পরামর্শ তাঁকে ভুল পথে নিয়ে গেছে।

নবাবের সঙ্গে ইংরেজ নানারকমে ঝগড়া শুরু করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ বিতরণ করে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার আশ্বাস দিয়ে তাদের অধঃপতনের পথে নিয়ে গেল। "কোম্পানী"র কর্ম্মচারীদের সাহস বেড়েছে প্রচুর। নবাবের রাজ্যে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হবার কথা রাজা দুর্লভচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণদাসের। সে পালিয়ে ইংরেজ-কুঠীতে আশ্রয় নিলে, তাকে সমর্পণ করার জন্য নবাবের সমস্ত অনুরোধ আদেশ উপেক্ষিত হ'ল। ১৭৫৬ জুন ১৬ থেকে ২০-এ পর্য্যন্ত নবাবের সৈন্য কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ পালিয়ে

প্রাণরক্ষা করে। পরবৎসর জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ইংরেজের দখলে আসে। ইতিমধ্যে নবাবের সেনাপতি মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতায় সম্মত হলে পলাশী-ক্ষেত্রে ১৭৫৭ জুন ২৩-এ নবাবের সৈন্য পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধে দুই বীর সেনাপতি মিরমদন ও মোহনলাল নিহত হন। মুসলমান প্রভাব সেইদিন যে আঘাত খেয়েছিল, সেটা থেকে কাটিয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি।

এর পর থেকে ভোজবাজির মত সব পরিবর্ত্তন ঘটতে লাগলো। বিশ্বাস-ঘাতক ঘৃণ্য জীব মীরজাফর ইংরেজের সাহায্যে বাঙ্গলার নবাব হলেন। জীবনে শান্তি আসেনি। বিদ্রোহ হ'ল মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া, বিহারে ; তার ওপর ইংরেজের হুম্‌কি তামিল করতে প্রাণান্ত। তাদের বিশ্বগ্রাসী অর্থলিপ্সা পূরণ করতে রাজভাণ্ডার শূন্য হ'ল।

ইতিমধ্যে 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরে' ইংরেজকে নিষ্কণ্টক করা হ'ল। ১৭৬১ জানুয়ারী ৬-ই পাণিপথের যুদ্ধে আহ্‌মদ শা আবদালির হাতে মহারাষ্ট্র তেজ চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়ে গেল। ইংরেজ হ'ল বাঙ্গলার গভর্ণর ; দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের ভারপ্রাপ্ত। মীরজাফর গদিচ্যুত হলে মীরকাসিম নবাবী পেলেন। একাধারে তিনি বহুগুণের অধিকারী। তাঁর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, "মীর-কাসিম যে স্বদেশানুরাগী, প্রজাবৎসল, দীনপালক, ন্যায়বান্, মিতব্যয়ী, রাজনীতিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল নবাব ছিলেন, তাহা কেহ মীরকাসিমের ছিদ্রানুসন্ধানী কোন গ্রন্থকারের ইতিহাসের দ্বারাও অপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না।"

মীরকাসিম মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৭৬৪ অক্টোবর ১০-ই বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ে বাঙ্গলার ইংরেজের শেষ শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

নির্লজ্জ মীরজাফর আবার এলেন (১৭৬৪) ; মৃত্যু তাঁকে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এনে দিয়েছিল। ক্লাইভ ১৭৬৫ (মে ৩-রা) বাঙ্গলার সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসলেন। ইংরেজ বাঙ্গলার নাম-মাত্র নবাব মীরজাফর-পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে বাৎসরিক অর্থ-সাহায্যের পরিবর্ত্তে তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হ'ল এবং অন্যদিকে দিল্লীর "বাদশাহ"র নিকট সুবে বাঙ্গলার দেওয়ানী ও নিজামত অর্থাৎ আর্থিক সংস্থা ও সেনাবিভাগের পূর্ণ অধিকার লাভ করে প্রকৃত শাসনকর্ত্তারূপে আবির্ভূত হ'ল।

শাসনের মুখোস

মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের বাণী "সব লাল হো যায়গা" অর্থাৎ ইংরেজ সারা ভারতের সম্রাট দাঁড়িয়ে যাবে, বর্ণে বর্ণে মিলেছিল। পরস্বাপহারীর দুর্ব্বার ধনলিপ্সা নিয়ে শাসকবর্গ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে অদ্ভুত পারদর্শিতা প্রকাশ করেছিল। মার্কস্-এর মতে, ইংরেজ "employed all the existing machinery of despotism to squeeze from the people their utmost mite of contribution, the last dregs of their labour, and thus working it with all the practical ingenuity of politicians, and all the monopolising selfishness of traders". যথেচ্ছারের সমস্ত শক্তির সঙ্গে কূটনীতিজ্ঞের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বণিকের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মিলিত হয়ে এক উৎকট অবস্থা সৃষ্ট হয়েছিল।

কর আদায়ের দোহাই দিয়ে ধনীকে ফতুর আর মধ্যবিত্ত দরিদ্রকে ভিখারী করে ছাড়া হ'ল। ভূমিরাজস্ব আদায় হতে লাগলো জমির আয়ের উপর নয়, সময় সময় মারাত্মক জুলুমের সাহায্যে যতটা আদায় সম্ভব তার চেয়েও বেশী। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, বাঙ্গলার নবাবের আমলে (১৭৬৪) যেখানে রাজস্ব ছিল ৮,১৭,৫৫৩ পাউণ্ড, সেটা ত্রিশ বছরে (১৭৯৪) ইংরেজ কর্ত্তৃক আদায় হয় ২৬,৮০,০০০ পাউণ্ড। (প্রতি পাউণ্ড = ১০ টাকা)। এই থেকে নিষ্পেষণের একটা আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র।

ভারতের চিরাচরিত শিল্পনাশ দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। ইংরেজ আসর জমিয়ে বসবার আগে ভারতের কার্পাস ও রেশম বস্ত্র রপ্তানীর দ্বারা ভারতের অর্থাগম হ'ত। সে-সব বহিরাগত ব্যবসায়ীদের লোভনীয় বস্তু ছিল। নানা উপায়ে, প্রধানতঃ নব-অর্জ্জিত শক্তির অপব্যবহারে শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠলো। ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের উপর উচ্চতম শুল্ক সাহায্যে আমদানী বন্ধ হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিনা শুল্কে ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারে তৈরী বস্ত্র ভারতে আসতে লাগলো। তাঁত-চরকা মৃতপ্রায়; বিদেশী সূতো ক্রমে দেশী তাঁতের কাছে উপস্থিত। সাধারণ দেশী সূতো অপেক্ষাকৃত মোটা, তার দাম বেশী; আর বিলাতের কলে প্রস্তুত মিহি বস্ত্র তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতে কল স্থাপিত হলে বিদেশী শাসকদের পক্ষে উৎপাদন-শুল্ক চাপিয়ে আমদানী-করা বিলিতী কাপড়ের চেয়ে দাম চড়িয়ে দিতে কোনও চক্ষুলজ্জা হয়নি।

দেশীয় শিল্পজাত সর্ব্বরকম পণ্য বিলাতীর সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম, কারণ সেখানে সকল বস্তুই বাষ্পচালিত যন্ত্রসাহায্যে তৈরী। এখানে মজুরির হার কম

থাকায়, নানারকম কারখানা নিয়ন্ত্রণের আইন পাশ করে, উৎপাদন-ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের অর্থ স্রোতের মত ইংলণ্ডে প্রবেশ করাতে সেখানে সাধারণ লোকেরও সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে খেয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার সুযোগে তাদের উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয়েছে প্রচুর। কারখানায় ইঞ্জিন চালাবার জন্যে বাষ্পীয় (steam) শক্তি প্রয়োগ একেবারে বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিল। জেম্‌স্‌ ওয়াট (James Watt) ১৭৬৯-তে ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং বছর ষোলো পরে (১৭৮৫) এই ইঞ্জিন কাপড়ের কলে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। দ্রুত উৎপাদনের পক্ষে এর প্রচুর সুবিধা। সেই সঙ্গে সূতাকাটা-সম্পর্কিত বাষ্পচালিত যন্ত্রাদি একে একে বাজারে দেখা দিয়েছে। এসকলের বাঙ্গলায় নাম নেই, কারণ এরা কেউ বাঙ্গলায় জন্মলাভ করেনি। এলো স্পিনিং জেনি (jenny) ১৭৬৪, স্পিনিং ফ্রেম (frame) ১৭৬৯-তে। দশ বৎসর বাদে (১৭৭৯) স্পিনিং মিউল (mule), ১৭৮৫-তে যন্ত্রের তাঁত (power-loom) ও বাষ্পচালিত সম্পূর্ণ কাপড়ের কলের আবির্ভাব, ক্লোরিণ সাহায্যে সূতা ও কাপড় বর্ণশূন্য (সাদা) করার জ্ঞানার্জ্জনের পর যেন যন্ত্র-বিজ্ঞানী একটু দম নিয়েছেন। ১৭৯২-তে তুলা পেঁজার (cotton gin) ও তুলা আঁচড়ে পাঁজ তৈরী করে সূতো প্রস্তুতের যন্ত্র (well-combing machine) আবিষ্কৃত হ'ল। সে-তুলনায় ভারতে কিছু করা সম্ভব হয়নি। আমদানী-করা মিল যাঁরা বসিয়েছিলেন, তাঁদের পথে নানারূপ বাধা সৃষ্টির ব্যবস্থাই হয়েছিল। রাজশক্তি তখন পাকাপোক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে ১৭৬৯-তে সুয়েজ খাল খোলা হলে ইংরেজের সৌভাগ্য ষোলো-কলা পূর্ণ হয়ে গেল। একে একে বাঙ্গলার, তথা ভারতের অধিবাসীর জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে বিদেশী পণ্য এসে স্থান গ্রহণ করায়, দেশীয় শিল্পী অন্নাহারে মরতে এবং কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত অথবা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে নিরন্ন বেকার হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তখন কৃষিই হ'ল তাদের একমাত্র গতি। শেষ পর্য্যন্ত বিলাতের কলে ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত কাঁচামাল উৎপাদনে লিপ্ত হবার অধিকার ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটলো।

রাজ্য পরিচালনা, অর্থাৎ শান্তি স্থাপন, শিক্ষা বিস্তার, রেল সাহায্যে যাতায়াতের সুযোগ, ধর্ম্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতির মুখোস দেশবাসীর একটা বড় অংশকে ভুল বোঝাতে সক্ষম হ'ল, অর্থাৎ ইংরেজের প্রকৃত রূপ বহিরাবরণে জনসাধারণের কাছে ঢাকা পড়ে রইল। দুর্দ্দান্ত রক্তপিপাসু জীবের মত সহস্র ছিদ্র দিয়ে ইংরেজ ভারত-শোষণে মনোনিবেশ করেছিল। সকল ব্যাপার এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই; কয়েকটা ধারার ইঙ্গিত দিলে বুঝতে পারা যাবে এত বড় 'সমৃদ্ধ' রাজ্যে কি-ভাবে দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা, দুর্ভিক্ষ, অস্বাস্থ্য, কর্ম্মবিমুখতা, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি দোষ এসে ধীরে-সুস্থে বাসা বাঁধতে সক্ষম হয়েছিল।

"কোম্পানী" যতরকম অনাচার করেছে তাতে লোক জর্জ্জরিত, নিঃস্ব, বিভ্রান্ত। দারিদ্রের মুখের অন্ন, সমৃদ্ধের ধন-সম্পদ, জমিদার, সম্ভ্রান্ত রাজন্যবর্গের সম্পত্তি নাশ ও মর্য্যাদাহানি ঘটেছে। সরল জীবন যাপনের অধিকার রহিত বা ব্যাহত হয়েছে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত ; ফলে হয়েছে "সিপাহী সংগ্রাম"। পরবৎসর "কোম্পানী"র রাজ্য হ'ল সম্রাজ্ঞীর খাস তালুক। ইংলণ্ডের নাগরিক পার্লামেণ্টের নামে বিনামূল্যে "কোম্পানী"র "অগাধ সম্পত্তি" দখল করে পরস্বাপহরণের মহাপাতক সঞ্চয় করতে পারেন না। তাঁরা ভারতবাসী, বিশেষ করে দোষযুক্ত বাঙ্গালীর মত অসৎ নন, তাঁরা এসকল পাপের ঊর্দ্ধে। সুতরাং "কোম্পানী" কিনতে দাম দেওয়া হ'ল ঠিকই, টাকাটা দিলে ভারতবাসী ; সমগ্র ইংরেজ জাতির সততার চূড়ান্ত নমুনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রয়ে গেল। এই টাকা হ'ল ভারতের প্রথম জাতীয় ঋণ (National Debt)। ১৮৫৭ সালে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৫১ মিলিয়ন পাউণ্ড (৫১ কোটি টাকা)। ভারতের নিজস্ব কোনো সমস্যা ছিল না পঞ্চাশ বছর যাবার মধ্যে (১৯০১), এই ঋণের পরিমাণ চতুর্গুণ হযে দাঁড়িয়েছিল।

"ভারতীয় ঋণে"র ওপর সুদ খেয়েছে ইংল্যাণ্ড। এখানে রেল পাতবার টাকা এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে। নির্দ্দিষ্ট হারে বার্ষিক সুদে (guaranteed railway) ; ফলে, ইংরেজের পাতা রেল ও তার পরিচালনায় এক টাকার জায়গায় বিশ টাকা খরচ হয়েছে—"গৌরী সেন" সে-টাকা জুগিয়েছে। ইংরেজ ভারতে ও তার বাইরে সাম্রাজ্য-বিস্তারে যুদ্ধ করে খরচা চাপিয়েছে ভারতেবই স্কন্ধে। আফ্‌গান, তিব্বত, আবিসিনীয়া প্রভৃতি যুদ্ধে ভারতের কোনো স্বার্থ ছিল না। এদেশী ফৌজের ত কথাই নেই, সাদা ফৌজের খরচ হতেও ভারত রেহাই পায়নি। বিলাতে বসে যাঁরা ভারত "শাসন" করেছেন, তাঁরা ভারতের অর্থে পুষ্ট, কিন্তু ভারতের "নোকর" ন'ন। সেইভাবে যত শ্বেতাঙ্গ ভারত-শাসন-শোষণে লিপ্ত ছিল, তাদের দেহ পুষ্ট হয়েছে, পুত্র, কলত্র, আত্মীয়-স্বজন এখানে ও "স্বদেশে" প্রতিপালিত হয়েছে ভারতের রুধিরে। সমস্ত বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল শ্বেতাঙ্গ। তাদের পারিশ্রমিক ত এদেশে মিলেছেই, ঘরে বসে যে পেন্সন ভোগ করেছে, তার এক কপর্দ্দকও ভারতের কাজে লাগেনি ; উপরন্তু সময় ও সুবিধামত তারা ভারতের কুৎসা-রটনা এবং স্বার্থবিরোধী কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়েছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের ষাট বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে লণ্ডনে বিরাট উৎসব সম্পন্ন হয়। সেখানে ভারতবর্ষকে "দস্তুরমত" একটা গুরু অংশ বহন করতে হয়েছিল। ১৯০৩ সালে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে দিল্লীর দরবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত খরচ হয়েছে। আর তার তিন বৎসর আগে থেকে ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে অর্থাভাবে লোক ভোজ্য কিনতে না পেরে উপবাসে মরেছে অযুতে নিযুতে। (R. C. Dutt : *Economic History of India in the Victorian Age*)

ইংরেজের ও তার মাসী-পুত্রদের চা, ইক্ষু, তূলা প্রভৃতি ফসলের আবাদ ও খনির কাজ চলবে বলে ভারতীয় মজুর ("কুলি") নিয়োগের কাহিনী কেবল বেদনাদায়ক নয়, কলঙ্কময়ও বটে। ভারতে ইংরেজ সরকার মহোৎসাহে এ-কাজে লিপ্ত ছিল। পার্লামেণ্টের গোচরে এই কুলিদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে কোনও সুফল হয়নি। কোটি কোটি টাকা ইংরেজ "উপার্জ্জন" করেছে অভাবনীয় অত্যাচারের মধ্যে। আড়কাঠি কর্ত্তৃক ছেলেপুলে, বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ, নিরক্ষর গ্রামবাসী চাষী প্রভৃতিকে ভুলিয়ে নিয়ে কণ্ট্রাক্ট বা (জাল) চুক্তি সহি করিয়ে "স্বাধীন" মজুর হিসাবে চা-বাগানে বা ইংরেজের উপনিবেশ ফিজি, ট্রিনিডাড, মরিসাস্, সুরিনাম, ব্রিটিশ ও ডাচ গিয়ানা প্রভৃতি আফ্রিকার দূর-দূরাঞ্চলে চালান করা, তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, সাজা শাস্তি অবাধে চলেছে। চা-বাগানে এবং শ্বেতাঙ্গদের অফিসে "পাঙ্খা-কুলি"র বিবৃদ্ধ প্লীহা ফিরিঙ্গির সবুট কোমল পদাঘাতে ফেটে যাওয়া এপিডেমিক হয়ে উঠলো। সঙ্গে চলেছে জন্তু-ভ্রমে মানুষ শিকার, অবাধে কুলি-রমণী ধর্ষণ।

শেতচর্ম্মধারী রাজার জাতের ঔদ্ধত্য ক্রমে বেড়েই চলেছে। উচ্চস্তরে "মানী" লোকরা সাধারণ ফিরিঙ্গি ছোকরাদের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন নানাক্ষেত্রে। ক্কচিৎ প্রতিবাদ হলে, রাজভক্ত মহামান্য লোকদের ক্ষেত্রে, হয়ত একটা 'রিগ্রেট' (regret) প্রকাশ করা হয়েছে। এই ঔদ্ধত্যপ্রকাশ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ("টঁ্যাস") ফিরিঙ্গিদের কাছে একটা 'বাহাদুরী' বলে মনে হ'ত। এরা অধিকাংশই ভারতীয় আয়াদের সন্তান। তাই সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ যেমন অসহ্য হয়, এই শ্রেণীর ফিরিঙ্গিদের বিক্রম ভারতীয়দের ওপর বেশী করে পড়েছে। এরা ছিল গভর্ণমেণ্টের "poor white" এবং রেল, পুলিশ, ডাক, বন্দর প্রভৃতি বিভাগের অর্থসচ্ছল পদে অধিষ্ঠিত। বিস্তৃত ক্ষেত্রে এদের আচরণই বিদেশী শাসনের প্রতাপ সব সময়েই বেশী করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ছোট হলেও বলা যায়, শ্বেতাঙ্গ হাকিমদের আচরণ ভারতবাসীকে নিকৃষ্ট জাতি বলে প্রতিপন্ন করেছে। কালা-ধলার বিচারে ধলা-আসামী বে-কসুর খালাস পেয়েছে। বিবৃদ্ধ প্লীহা অকারণে ফেটে যাওয়ায় মৃতের আত্মীয়রা মবলগে বিশ-পঁচিশ টাকা খেসারত পেয়েছে।

এসকল হচ্ছে ইংরেজ শাসনের মহিমা। আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। একটা কথা মনে রাখলেই হবে, এইরকম পটভূমিকায় ভারতের "স্বাধীনতা-স্পৃহা" অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

নিশাবসান

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবনতির ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছে ইংরেজের কূটনীতির ফলে। তাকে রোধ করার শক্তি বাঙ্গালী হারিয়ে বসেছে ; তা'ছাড়া দুর্গতির প্রকৃত আলেখ্য দেখবার মত চিন্তাশীল চক্ষুষ্মান লোকেরও অভাব ছিল। ধর্ম্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, আত্মকলহ প্রবৃত্তি, স্বার্থপরতা, বহুবিবাহ, শিশুবিবাহ, সতীদাহ, উৎকট জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, আচারসর্ব্বস্বতা প্রভৃতি অনাচারের ঘূর্ণিপাকে সমাজ নিমজ্জমান। অসাড় অনড় জাতি গতি হারিয়ে পচতে আরম্ভ করেছে। তার বেঁচে থাকার সমস্ত লক্ষণ তখন প্রায় বিলীয়মান। সুতরাং জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অধঃপতন বাঙ্গালীর পক্ষে মূক বিস্ময়ে দর্শন এবং প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মতন ভেসে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

প্রতিকার-সম্ভাবনা-শূন্য নিত্য 'হানাহানি, রাহাজানি', লুঠপাট, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, গুম-খুন, জবরদখল, যদৃচ্ছা অপরের স্বাধীনতা লোপ প্রভৃতি রাজনৈতিক তাণ্ডব ইংরেজ আমলে কিছুটা প্রশমিত হওয়ায়, সাধারণ বাঙ্গালী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে। নিজের দুর্ভাগ্য, যথা—মহামারী, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বাত্যা, অজন্মা, দাবদাহ প্রভৃতির মত উপদ্রবকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফলস্বরূপ মেনে নেওয়াই তখন জীবনদর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

"আঁধারের বুকে ঘনান্ধকার" জমে উঠছে, দুর্দ্দশার "না হয় ঠাহর আকার কোনো", চক্রব্যূহ থেকে নির্গমনের পথ নেই। "এমন দিনে হায়" বাঙ্গালীর ভাগ্যদেবতা একটু সদয় হলেন বলা যায়। মনে হ'ল নীরন্ধ্র পুঞ্জীভূত মেঘের কিনারায় বালার্কপ্রভার ক্ষীণ রেখা আবির্ভূত হচ্ছে। ক্রমে সে রশ্মি অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এল ; আবির্ভূত হলেন জ্যোতির্ম্ময় এক মহাপুরুষ, বাঙ্গালীর হৃদয়ের "রাজা", যুগদেবতা, নবভারতের জনয়িতা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)।

রামমোহনের জীবনই যেন ভারতের নব জাগরণের প্রথম পর্ব্ব, সুদৃঢ় পদক্ষেপ। তাঁর প্রত্যেক কাজের পিছনেই যেন ভারতের পুনর্গঠনের মহান প্রয়াস নিহিত ছিল।

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতির মজ্জাগত ত্রুটি দূর করতে না পারলে নতুন কিছু গড়া সম্ভব হবে না বলে তাঁর মনে হ'ল। হিন্দুধর্ম্মের নির্ব্বাসন দেবার বা তাকে খর্ব্ব করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না ; তার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সংস্কার সাধন দ্বারা তার কূপমণ্ডূকতা, জড়তা, মালিন্য সরিয়ে দিতে পারলেই আপন ঐতিহ্যে সে ধর্ম্ম মহীয়ান্ বলীয়ান্ হয়ে উঠবে এই হ'ল তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস।

লেগে গেলেন বেদের অভ্রান্ততা প্রমাণের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করতে। বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষ জীবনযাত্রার প্রণালী ও বহুসমর্থিত মত ধরে থাকবে বা বর্জ্জন করবে। যে-সকল কুপ্রথা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করছে, মনুষ্যধর্ম্মে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে, সে-সকলকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। সতীদাহ প্রথাকে তিনি চিরতরে নির্ব্বাসন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন (১৮২৮ ডিসেম্বর ৪-ঠা), আর করেছিলেন অনাচার, কদাচার, অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত।

তিনি এক নতুন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ; তাঁর "আত্মীয় সভা" (১৮১৫) আর "ব্রহ্মসভা" (১৮২৮) নতুন পথ দেখিয়েছে। সকল দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরা বলেন—সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতির একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয় নব-প্রবর্ত্তিত এক ধর্ম্মকে অবলম্বন করে। এই ভাবধারা এনে দিলেন তাঁর নূতন ধর্ম্মমতের ভিতর দিয়ে। এক ভগবান, এক ধর্ম্ম, এক মানবজাতি। তিনি সমাজকে গুরুতর আঘাত মেরে তার সম্বিৎকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম সে-যুগে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ভারতের মহৎ উপকার সাধন করেছে। তিনি যেমন হিন্দুদের অন্ধ গোঁড়ামি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি খৃষ্টধর্ম্মী পাদ্রীদের ধর্ম্মপ্রচারে বাধা দান করেছেন। "পরধর্ম্ম" ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। স্বজন-পরিজন, সমাজ থেকে বিচ্যুত লোক, পরাস্বার্থে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় ; দেশের মাটী হাওয়া জল তাকে আর সরস রাখতে পারে না। নিজের প্রাণ রক্ষা করতেই তার প্রাণান্ত।

কয়েকজন বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক ছাড়া কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে, সমাজের নির্য্যাতনে, নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন পরিচয় লাভের আশায় সাধারণ দরিদ্র লোকই খৃশ্চান হতে আরম্ভ করে। খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, ধর্ম্মান্তরিত শতকরা নব্বই-পঁচানব্বই জনই বুঝতো না। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে-সকল অভাবই ব্রাহ্মধর্ম্ম মেটাতে সক্ষম ছিল।

পাদ্রীদের সঙ্গে রামমোহনের বিতর্ক ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে স্থানলাভ করেছে। বহু চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে পেয়ে খৃশ্চান হওয়া থেকে বিরত হয়েছে। না হলে আরও সহস্র সহস্র হিন্দু অ-কারণে, যৎসামান্য লাভের লোভে, সমাজ পরিজন ছেড়ে চলে যেত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সেণ্ট জেভিয়ার (St. Xavier) একাই গোয়া অঞ্চলে দশসহস্রাধিক হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাজগতে ভারতবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ, বিশেষতঃ রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করতে গেলে বাঙ্গলার ধর্ম্মানুশাসনের ধারার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। আজ একবার মনে প্রশ্ন ওঠে, হয়ত তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের জন্যই ধর্ম্মের টান দিয়েছিলেন।

তাঁর কথায় : "Some changes in the religion of the Indians were

necessary for their political advantages and social comfort." তিনি বলেছিলেন, প্রচলিত ধর্ম্মমত, আচার-বিচার, সামাজিক রীতি-নীতি ভারতবাসীর মঙ্গলের প্রতিকূল ("it is not well-calculated to promote their political interests")। নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিবদমান হিন্দুসমাজ, সহস্র প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ থাকায়, একত্ববোধের অভাবে, সকল ব্যাপারেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে মরছে। পদে পদে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি তাকে নিগৃহীত করছে। সৎসাহস নিয়ে নতুন পথে চলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। স্বজাতি প্রেম, স্বাজাত্যবোধ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়েছে।

বিদেশী শাসকদের তিনি খুব বিশ্বাসের চোখে দেখেননি। যেটুকু সংযোগ, যেটুকু সম্ভ্রম, প্রীতি, তার মূলে ছিল ভারতের কল্যাণ। ইংরেজের সংকল্পে দৃঢ়তা, সাহস, কর্ম্মকুশলতা, ক্লেশসহনশীলতা, জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা, সর্ব্বদা নিজ দেশের হিত-চিন্তা এবং নিজেদের স্বার্থে সুনাম-দুর্নাম সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া গুণ বা দোষগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ইংরেজের শাসন সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন এবং অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ভারতে তার স্থায়িত্ব কামনা করেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, ভারতের নিজ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হবার এ একটি সোপান মাত্র।

সকল ক্ষেত্রেই তাঁর দুটো দিক বিচার করবার অভ্যাস ছিল। তিনি শাসকবর্গকে দূরদর্শী ঋষির মত alternative বা বিকল্প ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের নৈকট্য হেতু আয়র্লণ্ডকে দমনে রাখা বা তার স্বাধীনতা-লাভ-স্পৃহা খর্ব্ব করা যত সহজ হয়েছিল, সুদূরে অবস্থিত ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা তত সহজ নয়। তার লোকবল, প্রাকৃতিক ও শিল্পোৎপাদিত সম্পদের সঙ্গে আয়র্লণ্ডবাসীদের জ্ঞান ও উদ্যমের এক-চতুর্থাংশও যদি যুক্ত থাকতো, তা হলে ভারত অন্য মূর্ত্তি ধারণ করতো। তা যাই হ'ক, বর্ত্তমান অবস্থায় যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হিতকারী বন্ধু অথবা উৎপাতজনক ক্ষতিসাধনতৎপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু বলে গ্রহণ করতে হবে। ["She (India) would prove from her remote situation, her riches and vast populations either useful and profitable and a willing province, an ally of the British empire, or troublesome and annoying as a determined enemy."]

ইংরেজ কি করবে সেটা সম্পূর্ণ তার অভিরুচি; দুটো রাস্তাই খোলা রয়েছে। যতদিন ভারত বুঝবে ইংরেজের সহযোগিতায় তার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, ততদিন শিষ্য, বন্ধু, সহকর্ম্মী রূপ সম্বন্ধ স্থাপনে দ্বিধা করবে না। এর ব্যতিক্রমে সে বিপরীত বা বিরূপ আচরণ করতে বাধ্য হবে।

পরাধীনতার গ্লানি রামমোহনকে ব্যাকুল করেছিল। চিন্তাশীল ব্যক্তি বিদেশীর শাসন-যন্ত্রণা কখনও ভুলে থাকতে পারে না ("It is impossible for a thinking man not to feel the evils of political subjection and depen-

dence upon foreign people.")—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি সকল সময় এই গ্লানি সম্বন্ধে জাতকে অবহিত করে গেছেন। দেশ যাতে যোগ্যতা লাভ করে অপর নানা স্বাধীন দেশের মত আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়, সেই কথাই তিনি বলেছেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এই চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করবার প্রেরণা দিয়েছেন। কোনও কোনও দেশের স্বাধীনতা লাভ করার সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়েছেন, আবার স্বাধীন দেশ পরকবলিত হলে সমভাবে বেদনা প্রকাশ করে গেছেন। কখনও কখনও আনন্দের আতিশয্যে তিনি প্রকাশ্য ভোজের ব্যবস্থাও করেছেন।

স্বাধীনতার শত্রু এবং যথেচ্ছাচারের সমর্থকরা কখনও সফলকাম হয়নি বা কস্মিন্‌কালেও হবে না—এই হ'ল রামমোহনের রাজনীতি দর্শনের মূলমন্ত্র। জাগ্রত দেশ আপন প্রচেষ্টায় একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই; অত্যাচারী যত বড়ই শক্তিমান হ'ক, তাকে পরাভব স্বীকার করতেই হবে। এ-ধারণা ভারতে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। বিপিনচন্দ্র পাল সত্যই বলেছেন (*Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj*, p. 8)—"রাজার" মনে অতি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল ("Swaraj even in the limited sense was present in the mind of Raja Rammohun Roy.")। অতীতকালে যে ভাষা ও শিক্ষা ভারতের গৌরব ছিল, জগতের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল, কালের গতিতে, ঘাত-প্রতিঘাতে সেটা তাঁর সমসাময়িক কালের অনুপযোগী বলে মনে হয়েছে। জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে তার জ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন; কেবল অতীত ভাঙ্গিয়ে নতুনের সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হবে না। আলোকবঞ্চিত রুদ্ধ জলাশয়ের মত সেটা বিষাক্ত, ক্ষতিকর, অব্যবহার্য্য হতে বাধ্য। তাকে সচল সাবলীল, নতুন নতুন জ্ঞানের ধারক বাহক করতে না পারলে সে জাতি সকলের পিছনেই থেকে যাবে, অপরের সঙ্গে অগ্রগতির তালে তার ছন্দপতন ঘটবে। জগতে নব নব আবিষ্কার চলছে, বিজ্ঞান অজ্ঞাত জগতের মধ্যে প্রবেশ করে গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিচ্ছে। মানুষ নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে আনন্দে মেতে উঠছে, আর "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"।

ভারতে ইংরেজ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার প্রবর্ত্তন অপরিহার্য্য; উপার্জ্জনের পথে ইংরেজি শিক্ষা হ'ল প্রথম সোপান। এই সরল সত্য রামমোহনের মত চিন্তাশীল লোকের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। এ ছাড়া তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজি ভাষা সারা ভারতে একটা যোগসূত্র-স্থাপনে সহায়তা করবে এবং তাই থেকে জাতীয়তার ভাব গড়ে উঠবে। এই কথা স্মরণ করে তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন কৈশোরের পারে যৌবনে। পেস্কারী গ্রহণ করবার পূর্ব্বেই তিনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অতঃপর ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝলেন এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে তিনি স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহী হয়ে পড়লেন। ইংরেজি ভাষা প্রসারের সমর্থক দলের (occidentalists) তিনি নেতা

বলে পরিচিত হলেন। বাঙ্গলায় ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন মহামতি হেয়ার (David Hare, 1775-1842)। নতুন শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রথম সভা হয় ১৮১৬ মে ১৪-ই এবং পরের সপ্তাহে এক কমিটি গঠিত হয়। প্রায় ছ'মাস বাদে ১৮১৭ জানুয়ারী ২০-এ, হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। তখনও গভর্ণমেণ্ট ইংরেজি প্রসার নীতি গ্রহণ করেনি; সেটা আসে ১৮৩৫-এ। রুদ্ধ কপাট খুলে গেলে ইংরেজির বন্যা দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে তথ্য পরে দেওয়া হয়েছে।

নিজ মত প্রচার ও বিপক্ষীয় দলের মত খণ্ডন করবার জন্য রামমোহন বহু পুস্তক-পুস্তিকা ছাপিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে তিনি কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাধর পুরুষ; তাঁর জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্র ছিল কত বিরাট আজ দু'শত বৎসর পরে তা ভাবলেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

তাঁর প্রথম পত্রিকা (১৮২১) ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিশনারী সংবাদ (Brahmunical Magazine), সঙ্গে ছিল সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)। পর-বৎসর ফার্সী ভাষায় মিরাৎ-উল্-আকবর প্রকাশ করেন ১৮২২ এপ্রিল ৮-ই।

জাতির আত্মসম্মানের নজির রেখে গেছেন রামমোহন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের সরকারী নীতির প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মিরাৎ-উল্-আকবর' বন্ধ করে দিয়েছিলেন (১৮২৩ এপ্রিল ৪-ঠা)। ভারতের শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন চেষ্টায় তাঁর অসাধারণ কৃচ্ছ্র-সাধনের কথা মনে করতে হয়। পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল (শাসন-সংস্কার বিধি) আলোচনাকালে তিনি ইংরেজ জাতিকে ভারতের অবস্থা অবহিত করার জন্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তাঁর একান্ত চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছিল।

রামমোহন ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর শত বৎসর ধরে সেই পথে ভারতবাসী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে, এমন দিন আসতে পারে যখন তাঁর নগণ্য প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যৎ ভারতবাসী যোগ্য দৃষ্টিতে দেখবে, হয়ত বা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে ("That a day may come when my very humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with thanks.")।

প্রভাত-রশ্মি

রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম শক্তিলাভ করেছে কয়েকজন খ্যাতিমান, মহাপ্রাণ, ব্রাহ্মবন্ধু ও অনুচরদের সহায়তায়। এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩-১৮৬৮), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী (১৮৪৪-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখ মনীষিবৃন্দ—দেশমাতৃকার সুসন্তানগণ।

ধর্ম্মসাধনায় কেশবচন্দ্রের মতবাদ মানুষকে আরও উদার হতে শিখিয়েছে। সেই মতবাদ এনেছে সমতাবোধ। জাতিভেদ রহিত-করণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, সুরাপান বর্জ্জন, ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, ন্যূনতম মূল্যের "সুলভ সমাচার" প্রকাশন তাঁর বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের পরিচায়ক।

জনসেবাকে তিনি খুব উচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। বাঙ্গলার বাইরে হলেও, এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাক্ স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩)-র কথা। তাঁর আর্য্যসমাজ জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়ে দিয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রাদির মূলতত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করে হিন্দুর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি গণ্ডীর বাইরে নিয়ে গিয়েছে। হিন্দুধর্ম্ম কিছুটা রূপান্তরিত হয়েও বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করেছে।

সমাজ-সংস্কারের ধারা উত্তরোত্তর বহুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অতি দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন হয়েছে। পরে পরে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। বিবেকানন্দ জাতি, জন, দেশ, দেবতা এক করে দেখিয়ে বাঙ্গালীকে 'মানুষ' হবার পথনির্দ্দেশ করেছেন।

রামমোহনকে একদিকে গোঁড়া হিন্দুদের ধর্ম্মসভা (১৮৩০) ও অপরদিকে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে। বাঙ্গলার নব-জাগৃতিতে পাদ্রীদের একটা বিশেষ অবদান আছে। তিন সহকর্ম্মী—কেরী (William Carey, ১৭৬১-১৮৩৪), মার্শম্যান (Joshua Marshman, ১৭৬৮-১৮৩৭) ও ওয়ার্ড (William Ward, মৃত্যু: ১৮২৩) খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসে কার্য্যক্ষেত্রে নামলেও (বাঙ্গলা) সাহিত্য ও রচনা প্রসারে, মুদ্রাযন্ত্র ও টাইপ প্রবর্ত্তনে, বিদ্যালয় স্থাপনে, স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায়, সংবাদপত্র পরিচালনায় অগ্রদূত বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৮১৮ এপ্রিলে কেরী 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (Friend of India) এবং মার্শম্যান (John Clarke Marshman) বাঙ্গলা মাসিকপত্র 'দিগদর্শন' এবং মে ২৩-শে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন। এ অসমসাহস সেদিনের পক্ষে দুর্লভ।

তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এই কঠিন পথ গ্রহণ করেছিলেন তাতে এদেশীয় লোকের সমাদর লাভ করার পরিবর্তে অনাদর অবজ্ঞা পেয়েছেন অনেক বেশী। গভর্ণমেণ্টও যে সকল সময় সদয় ছিল, তাও নয়। খেয়ালমত যথেষ্ট সহায়তা ও বিরূপতা করেছে। স্বার্থপ্রণোদিত হলেও তাঁদের প্রচেষ্টায় এশিয়া মহাদেশের সাহিত্য প্রসার লাভ করেছে ("the project would greatly encourage the spread of Asian literature")। কথাটা খুবই সত্য।

পাদ্রীদের "অপকর্ম্ম" প্রচেষ্টা ছিল না, সে কথা কেউ বলবে না। প্রলোভন দেখিয়ে, কখনও ছলে, এমন-কি বলপ্রয়োগে, অসতর্ক লোককে ধর্ম্মান্তরিত করার

দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে স্থায়ী মঙ্গলও করেছে যথেষ্ট। কেশবচন্দ্র সেন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তাঁরা ভারতবর্ষে বহু জনহিতকর ও আত্মসুখলেশহীন শুভ অনুষ্ঠান ("many noble deeds of philanthropy and self-denying benevolence") এবং জ্ঞানবিস্তার, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে ("the various intellectual, social and moral improvements which they have effected, need no flattering comment") কৃতকার্য্য হয়েছেন, তার জন্য কোনও অপস্তুতি প্রয়োজন হয় না; জাতির কৃতজ্ঞতার ফলকে সে কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।

বাঙ্গলার বুকে খুব বড় করে আঘাত লেগেছিল যখন বাঙ্গলার কয়েকটি কৃতী সন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এসকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন— কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০৭), গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (তরু দত্তর পিতা) প্রমুখ মনীষিগণ। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, এঁরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন নিজ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে। নূতন ধর্ম্ম এঁদের অ-মানুষ বা অ-বাঙ্গালী 'সাহেব' করতে পারেনি। প্রত্যেকজনই নানা ক্ষেত্রে নিজস্ব ধাঁচে বাঙ্গলার সেবা করেছেন; বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সমসাময়িক বা উত্তরকালে যশস্বী দেশপ্রেমিক যত জন জন্মেছিলেন, তাঁদের কেবল সমকক্ষতা নয়, হয়ত চরিত্রবত্তা, দৃঢ়চিত্ততা, স্বাধীন মতে অবস্থিতি এবং জ্ঞানের বিশালতায় উচ্চস্থান অধিকার করে গেছেন। হেমচন্দ্র তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, "স্বধর্ম্ম তেয়াগী তবু স্বজাতের দল।"

বাঙ্গলার জাগৃতি

"ইয়ং বেঙ্গল"

ডিরোজিও ঃ রামমোহনের পরেই যাঁরা এসেছিলেন, প্রকৃত বিপ্লবীর ভূমিকা তাঁরাই গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করলে ভুল হবে না। এঁদের উৎস-সন্ধানে গেলে, ডিরোজিও (Henry Louis Vivian Derozio, ১৮০৯-১৮৩১), হেয়ার (David Hare, ১৭৭৫-১৮৪২) ও রিচার্ডসন (David Lester Richardson, ১৮০১-১৮৬৫)—এই জন-তিনেক শিক্ষকের কথা প্রথমেই স্মরণ করতে হয়। এর মধ্যে ডিরোজিও সর্ব্বরকমেই বাঙ্গালী। জন্ম ও মৃত্যু দুইই কলকাতায়। ইটালী পদ্মপুকুর (বা মৌলালী) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশের বন্ধনদশায় তিনি অন্তরে যে বেদনা অনুভব করতেন, সেটা মর্ম্মস্পর্শী কবিতার ছন্দে প্রকাশ করে গেছেন।

মাত্র সার্দ্ধ তিনটি বছর হিন্দু স্কুলের সঙ্গে তাঁর শিক্ষকতার সম্পর্ক (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে) ১৮২৮ থেকে ১৮৩১ এপ্রিল পর্য্যন্ত। ঐ সালেরই ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন (Academic Association, ১৮২৮) ছিল ছেলেদের বহুকালের পুরাতন সংস্কার ভেঙ্গে নতুন করে গড়বার কামারশালা। সেখানে নিয়মিত আলোচনা সভা বসতো এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। তিনি সভাপতিত্ব করতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্র লোক সভায় উপস্থিত থাকতেন ; এমন-কি, হেয়ার সাহেব নিজে বহুসময় ঐ আলোচনা-সভায় যোগদান করতেন।

ডিরোজিওর ছাত্ররা ভগবান, ধর্ম্ম, সমাজ, পূজাপদ্ধতি, চিরাচরিত হিন্দু-সংস্কার, রীতিনীতি সকল বিষয়েই অবিশ্বাসীর মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। ফলে, দেবতা ব্রাহ্মণ তাঁদের বিদ্রূপের পাত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে হিন্দুর নিষিদ্ধ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং মদ্যপান, ইংরেজি পোষাক পরিধান, আদবকায়দা পালন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নির্ব্বিচারে কোনও মতই গ্রহণীয় নয় ; বাঁধন-ছেঁড়া মন বিচারের কষ্টিপাথরে ফেলে সব বিশ্লেষণ করে দেখতে দেখতে একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। "The wildness of their views ; the reckless innovations ; the infidel character of their religious sentiments ; and the spirit of unbounded liberty or rather of lawless licentiousness .... characterised their speculations."

তাঁদের উগ্রমূর্ত্তি ও 'উদ্ভট' আচরণে হিন্দুসমাজ একেবারে ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ; এমন-কি সেটা রামমোহনকেও বিচলিত করে তুলেছিল। নানা ভাবে

এ স্রোতের প্রবাহ রোধ করবার চেষ্টায় সনাতনপন্থী ত বটেই, যাঁরা পরিবর্ত্তনকামী, তাঁরাও দলবদ্ধ হয়ে প্রতিকার করতে লেগে গেলেন। ডিরোজিও কর্ম্মত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিলেন সে-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"I watch the gentle opening
of your minds,
And the sweet loosening
of the spell that binds,
Your intellectual energies
and powers ...."

ডিরোজিওর নিজের ছাত্রদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা তদানীন্তন কালেই স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং আজও লোকে তাঁদের ভুলতে পারেনি। যাঁরা ডিরোজিওর ছাত্রদের তালিকায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ পরিচয় রেখে গেছেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০), গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতি।

এঁদের সঙ্গে প্রাক্-ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অপর কয়েকটি ছাত্র, যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (১৮০৪-১৮৫৫), কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩) প্রভৃতির সংযোগ ঘটার ফলে বাঙ্গলা তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। সবাই "ইয়ং বেঙ্গল" বা তারাচাঁদের দল, "চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন", বলে পরিচয় লাভ করেন এবং দলীয় সকল দোষ বা গুণের অংশভাগী হয়ে পড়েন। ইংরেজি, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞানলাভ করে তাঁরা "একক্রিয়" মিত্রগোষ্ঠী হয়ে উঠেছিলেন। গুরুর শিক্ষা ছিল এ দুর্দ্দান্তপনার মূল ভিত্তি। সত্য কথা বলার চেষ্টা ছিল এঁদের সবচেয়ে বড় সুলক্ষণ। দেশের প্রতি আন্তরিক প্রেম, দেশের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন, দেশবাসীর দুর্দ্দশা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যে দেশীয় ভাবের প্রচারে এঁরা ছিলেন অনলস কর্ম্মী। এঁদের আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং ইংরেজ যে তাঁদের চেয়ে কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, এ কথা সর্ব্বদা প্রমাণ করারও চেষ্টা ছিল। বিদেশী দ্বারা লুণ্ঠন, শ্বেতাঙ্গদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং শাসনের শিথিলতায় দেশের যত গুরু স্বার্থহানি হচ্ছে, সেটা তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁরা ইংরেজের স্বরূপ চিনে এবং গোপন অভিসন্ধি বুঝে দেশবাসীর কাছে তাদের মুখোস খুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তখনকার ব্যাপক নিরক্ষতার দিনে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না ; কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষিতের মন স্পর্শ করে তাঁদের

সতর্ক ও বিচারশীল করে তুলেছিল। তাঁদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ তাঁদের মনের ভাবকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছে। যেখানে ইংরেজ-শাসননীতি আক্রমণ করা প্রয়োজন সেখানে অতি কঠোর ভাষা প্রয়োগে তাঁদের কোনো কৃপণতা ছিল না।

তাঁরা সে যুগে (১৮২৮-১৮৪০) বলেছিলেন যে, ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংরেজের লাভ হয়েছে অনেক বেশী ; অনুপাতে ভারতের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। সকল দিক বিবেচনা করে তাঁরা এই সার বুঝেছিলেন যে, ইংরেজ বিদায় হ'লে স্বচেষ্টা ও আত্মপ্রত্যয় সাহায্যে আমেরিকা যা অঘটন ঘটিয়েছে, ভারতবর্ষ অনুরূপভাবে নিজেকে গড়ে তুলবে।

উত্তরকালে ভারতের সুসন্তানগণ দেশের প্রতি যে প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দল স্বদেশবৎসলতায় তাঁদের কারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবেসেছিলেন। তাঁদের জীবন যেন দেশের কল্যাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। নতুন করে দেশকে জ্ঞানে গুণে প্রাণশক্তিতে উচ্ছল দেখার জন্য তাঁদের প্রাণ সতত উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো। উৎসাহের আতিশয্যে তাঁরা চিরাচরিত প্রথার নিন্দা শুরু করেন, কিন্তু তাঁদের দেশপ্রীতি সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। যেখানে ভারতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা হয়েছে, সেখানে তাঁরা প্রতিবাদমুখর ; আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রচণ্ড দাবী আর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের মনের কথা প্রকাশ করেছেন। বিদেশীরা তাঁদের দেশবাসীকে হেয় জ্ঞান করতো, এর জন্য তাঁরা সুযোগ পেলেই কঠোর ভাষায় পাল্টা আক্রমণ চালাতেন। মহামতি রিচার্ডসন যখন জ্ঞানার্জ্জন-ভিত্তিক সভায় (১৮৪৩ ফেব্রুয়ারী ৮-ই) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজ-নিন্দাসূচক বক্তৃতার মধ্যে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তখন সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী অসামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে রিচার্ডসনকে নিবৃত্ত করেছিলেন। মনের কথা মুখ ফুটে বলার সময় তাঁরা কারও অন্যায় বাধা উপেক্ষা করার মত মানুষ ছিলেন না।

দূর অতীতে বাঙ্গলার রাজনৈতিক জাগরণ সম্বন্ধে সকল মত ও পথ প্রায় এই গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলে নিঃসন্দেহে মনে করা যেতে পারে ; বৃহত্তর ক্ষেত্রে সে-যুগে বহু কৃতী বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কার ও তার নৈতিক মান উন্নত করতে চেষ্টা করেছিলেন, সে-কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে রাজনীতির বিতণ্ডা এই দলকে প্রায় একাই বহন করতে হয়েছে। শিক্ষা-প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্য-চর্চ্চা, বিজ্ঞান-সাধনা, বিদেশী জ্ঞান আহরণ ও দেশমধ্যে তার প্রচার এবং বিশেষ করে সংবাদপত্র পরিচালনায় তাঁরা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। এঁদেরই উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ডিরোজিও দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ মুকুরে তাঁদের যশের প্রতিফলন ("I see fame in the mirror of futurity.")। অপর গুরু ডেভিড হেয়ার ছাত্রদলকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন যে, সমস্ত দেশ

তাঁদের শিক্ষক ও সংস্কারক রূপে দেখবার জন্য একেবারে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে ("Your countrymen look upon you as their reformers and instructors.")। কুভক্ষ্যভোজী, মদ্যপায়ী, অনাচারী, স্বীয় ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন "নব্য দল"কে তাঁদের শিক্ষাগুরুরা ভাল করেই চিনেছিলেন। আর তাঁদের উপলক্ষ্য করে দুই বিরুদ্ধমতাবলম্বী দল (ধর্ম্মসভা ও ব্রহ্মসভা) রাধাকান্ত ও দেবেন্দ্রনাথ (এবং রামমোহনের অতি প্রিয় অনুচর, নব্য বঙ্গের তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী) একসঙ্গে হিন্দুস্বার্থ রক্ষার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, ১৮৪৬ মার্চ্চ ৫-ই হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা ভাঙ্গাগড়ার যুগে এসকলেরই প্রয়োজন ছিল। এর ফল যে বহু কল্যাণসাধন করেছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বুকে করে বসে আছে।

তারাচাঁদ ঃ ইয়ং বেঙ্গলের নেতা ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। তাঁর ভক্তরা প্রমাণ করেছিলেন বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কোনও ক্ষেত্রেই তাঁরা হীন নহেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রবল দাবী উত্থাপন করেছিলেন। জুরির বিচারে নিত্য কালা-ধলার বৈষম্য নিতান্ত আপত্তিকর বলেছেন দৃঢ়ভাবে। নির্ব্বাচন দ্বারা বিধানসভার সভ্য মনোনয়ন, সরকারী অপব্যয় রোধ, শোষণ ও অপশাসন নিয়ে প্রবল বিতণ্ডা উপস্থাপিত হয়েছিল। সর্ব্বস্তরে শিক্ষার প্রসার, ভারতের ন্যায্য দাবী পরিপূরণ, অনাচার অবিচার রোধ এবং জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি ছিল তারাচাঁদ ও তাঁর সঙ্গীদের প্রধান লক্ষ্য।

কাশীপ্রসাদ ঃ কাশীপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন ডিরোজিওর দেশপ্রেম ও কাব্যগুণের সার্থক শিষ্য। তাঁর ওপর লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই যথেষ্ট কৃপা ছিল। উচ্চস্তরের দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ভারতের পরাধীনতায় তাঁর বেদনা ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল ইংরেজি কবিতা অবলম্বন করে। তাঁর অন্তরের ব্যথা, ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করবে, তখন "··· Woe me! I shall never live to behold that day of triumph ···" সে গৌরবময় দিন দেখবার জন্য তিনি ইহজগতে থাকবেন না। সমসাময়িক বহু পত্রিকা তাঁর কবিতা ও রচনা প্রকাশ করে ধন্য হয়েছে।

ভোলানাথ ঃ বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের জন্য একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করে গেছেন ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০)। বিদেশী শাসন দ্বারা সংরক্ষিত কলে প্রস্তুত সস্তার পণ্যের আক্রমণ থেকে বিধ্বস্ত মরণোন্মুখ দেশী শিল্পী ও শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টায় তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। যে-সকল পণ্য দেশে উৎপন্ন হয়, তার পরিবর্ত্তে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করা অপরাধ বলে গণ্য করবার নির্দ্দেশ তিনি দিয়েছেন। জীবিকার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হলে জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়বে ; যে শক্তি দ্বারা

বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করতে হবে, দেশ সে শক্তি হারিয়ে ফেলবে, এই ছিল তাঁর প্রচারিত মত।

রামগোপাল ঃ বঙ্গমাতার অন্যতম সুসন্তান রামগোপাল ঘোষ। বিদ্যা, বিত্ত, শ্রমশীলতা, পরার্থপরতা ও বাগ্মিতা গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। বেথুন প্রবর্তিত ১৮৪৯-এর "কালা-আইন" (Black Acts) ভারতীয়ের আদালতে শ্বেতাঙ্গের বিচার ব্যবস্থা চালু করবার খসড়া আকারে (Bill) উপস্থাপিত হয় এবং শ্বেতাঙ্গরা সম্মিলিতভাবে তার যে বিরোধিতা করে, রামগোপাল নানা স্থানে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। এই বিলের ব্যাপারে ইংরেজের প্রতি বাঙ্গালীর বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হয়।

দক্ষিণারঞ্জন ঃ ভারতীয় শাসন ও বিচার বিভাগীয় অনাচার এবং পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে বেশী আলোচনা করতেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি দেশীয় লোকের তুলনায় সরকারের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ। ভারতে ইংরেজ কর্ত্তৃক অপশাসন ও শোষণের ওপর তাঁর তীব্র আক্রমণ শুনতে শুনতে রিচার্ডসনের মত শান্ত ধীর, প্রসিদ্ধ শিক্ষক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

পিয়ারীচাঁদ ঃ নিপীড়িত বঞ্চিত সহায়সম্বলহীন প্রজার স্বার্থরক্ষায় যত্নবান ছিলেন পিয়ারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। প্রজার শক্তি বৃদ্ধি হয়ে যাতে সে প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস ও শক্তি পায়, সে চেষ্টাই তাঁর কার্য্যতালিকায় সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছিল। তাঁর যুক্তি ছিল, ধনবান প্রবল লোক আত্মশক্তিতে যুঝতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাকা দরকার।

কৃষ্ণমোহন ঃ জগতের মঙ্গলময় কার্য্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ ; নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও প্রবল বাধা না পেয়ে কোনো বড় কাজই সম্পন্ন হয়নি। এ-কথা প্রচার করতেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রেটিস্, লুথার, রীড্‌লি, ল্যাটিমার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে। ভারতের মঙ্গলে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নীতির কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। যাঁরা নেতৃত্ব করেছেন, তাঁরা সরকার কর্ত্তৃক অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছেন। যোগ্য সম্মান ও অর্থ-সচ্ছলতা তাঁদের কপালে লেখা ছিল না। কৃষ্ণমোহন আরও বলতেন, বিদেশী শাসকবর্গকে যেটুকু সাহায্য করতে হয়, সেটা নিতান্ত বেঁচে থাকার খাতিরে। সেই মনোভাবকে সম্রাট বা শাসনযন্ত্রের প্রতি আনুগত্য বলে মনে করলে ভুল করা হবে।

রসিককৃষ্ণ ঃ যে-সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভারতের অবনতির কারণ এবং সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করছে, তারাচাঁদের মত রসিককৃষ্ণ মল্লিক স্বতঃপরতঃ তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করে গেছেন। এ সম্পর্কে "জ্ঞানান্বেষণ"-এ রসিককৃষ্ণের

প্রতিবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু "দশ-শালা" বন্দোবস্ত (Permanent Settlement)-তে প্রজাদের স্বার্থ অসংরক্ষিত থাকায়, তাদের বিপদের গুরুত্ব বুঝে তিনি তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে গেছেন। স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছে—কারণ দেশের আইন-প্রণয়নে, দেশের শাসনকার্য্যে দেশীয় লোকের কোনও স্থান নেই, সুতরাং সরকারের প্রতি কারও মমত্ববোধ থাকার কথা নয়; সেরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সকল সভ্য রাষ্ট্রে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থানুযায়ী সরকার গঠিত হয় এবং দেশ-শাসন-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হয়; কিন্তু ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে তার একটা অতি বড় ব্যতিক্রম। সুতরাং রাজা-প্রজা সংঘর্ষ চিরকালই লেগে থাকবে; শান্তি দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালাবে।

রাধানাথ ঃ 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মধ্যে রাধানাথ সিকদার নামটা একটু বেশী-দিন টিকে আছে। ভূগোল বই স্বল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য বলেই মনে হয়; আর ভারতের মানচিত্রে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এভারেষ্টের দিকে নজর না পড়ে উপায় নেই। যিনি এই পর্ব্বতের উচ্চতার সঠিক হিসাব করে দেন, তিনি হচ্ছেন রাধানাথ সিকদার।

শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। নিরক্ষর নরনারী নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষা ব্যাপকভাবে লাভ করলে দেশের উন্নতির গতি দ্রুত হবে। মাতৃভাষার সহায়তায় শিক্ষালাভ সহজ হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বাল্য-বিবাহ-নিরোধে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। "বেগার" খাটিয়ে নেবার বিপক্ষে তিনি অতি সাহসের সঙ্গে আপত্তি জানিয়েছেন। উপরিতন কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর তীব্র মতবিরোধ হয়েছে, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য থেকে কেউ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি।

প্রসন্নকুমার ঃ 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শান'-গণ্ডীর বাইরে সমভাবাপন্ন আরও অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী দেশের দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা নানাভাবে করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩-১৮৬৮)-এর কথা প্রথমেই মনে আসে। তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্য ও সঙ্গে সঙ্গে বিত্তের অধিকারী। তিনি বলেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ সন্তানদের ঔদ্ধত্য বাঙ্গালীর মন তিক্ত করে তুলেছে এবং ইংরেজ রাজত্ব যেন বালুকা-স্তূপের ওপর গড়ে উঠছে। সন্তুষ্ট নাগরিক সম্রাটের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে তার যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটছে। দায়িত্বপূর্ণ পদে দেশীয় লোকের স্থান নেই। এখানে উচ্চশিক্ষিত যোগ্য বাঙ্গালী চিরকাল নিম্নতর পদে নিযুক্ত থাকবে, এটা দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতি; যেন দুই দল পরস্পর সহানুভূতিহীন হয়ে কলহের জন্য প্রস্তুত। যদি বিদেশীর পদানত হয়ে থাকতে হয়, তা হলে ইংরেজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবার কোনও হেতু নেই; অপর যে-কোনও দেশ, ভারতে অধিষ্ঠিত হলে, ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

কৈলাসচন্দ্র ঃ হিন্দু কলেজের আর এক ছাত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত ১৮৩৫ (জুন) ক্যালকাটা লিটারেরি গেজেট পত্রিকায় (Gautam Chattopadhyaya : *Awakening in Bengal*, p. 355) ভবিষ্যতের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন (একশ' বছর পরে) ১৯৪৫-এর এক কাল্পনিক বিদ্রোহের বিবরণ দিয়ে। বিদেশীর অকথ্য অত্যাচারে স্বভাবভীরু বাঙ্গালী জর্জ্জরিত হয়ে পার্লামেণ্টে বারে বারে আবেদন নিবেদন করে কোনও প্রতিকার পায়নি, বরং উত্তরোত্তর উৎপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে, ১৯৪৫ সালে লোকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কৈলাসচন্দ্র কল্পনায় দেখেছেন (এরূপ সার্থক কল্পনা প্রায়ই দেখা যায় না) বিদ্রোহ বিদ্যুৎ-গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। "নিরপেক্ষ" ঐতিহাসিক বিদ্রোহীদের অমানুষিক নৃশংস কার্য্যকলাপের নিন্দা নানা রঙে প্রকাশ করবে, কিন্তু যে-সকল দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সরকারী চরম নিষ্ঠুরতার কবলে পড়েছে, যাদের বাড়ীঘর-দোর লুণ্ঠিত হয়েছে, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে, যারা জঙ্গলে, পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের অন্তরের ব্যথা-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা যিনি নিরপেক্ষ মনে যতক্ষণ বুঝতে চেষ্টা না-করছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিপ্লবের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে তিনি সমর্থ হবেন না।

দারুণ তাণ্ডবের মধ্যে বিপ্লব দমিত হ'ল। একজন বিদ্রোহীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ফাঁসিকাষ্ঠে গলা দেবার আগে তাঁর মুখ দিয়ে দূরদর্শী লেখক যে বাণী উৎসারিত করেছেন, সে ভাষা ভাবগম্ভীর "মাষ্টার-দা" সূর্য্য সেন প্রমুখ উত্তরকালের (শতবৎসর পর) মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবীর মুখেরই বাণী বললে অত্যুক্তি হয় না। এ দুয়ের ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কৈলাসচন্দ্রের পক্ষে এটা কম সাহস ও কৃতিত্বের কথা নয়। ফাঁসিতে জীবন-বিসর্জ্জন মহারাষ্ট্রে শুরু হয়েছিল ১৮৯৭-তে, বাঙ্গলায় হয় ১৯০৮ সালে।

রাজনারায়ণ-শিবনাথ

হিন্দু কলেজে রিচার্ডসনের ছাত্রদল এসে এই একই ধারায় যোগ দিয়েছেন। যদিও উৎকট আচরণে তাঁদের কিছুটা মন্দা পড়েছিল,—রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর কয়েকজন সহধ্যায়ী, যথা—মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫), জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সমাজের নানা স্তরে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। এঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গলার জাতীয় জাগরণে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। বিশেষ করে গুপ্ত (রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যক্রম) সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং তৎসাহায্যে স্বাধীনতা-লাভের কথা কেবল বলা নয়, রাজনারায়ণ কার্য্যে পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

বাঙ্গলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বেশ দ্রুত হয়ে উঠেছিল। তার প্রধান কারণ, নানা শক্তি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলেও সকলের লক্ষ্য ছিল এক। Arthur Mayhew তাঁর *Education of India* নামক পুস্তকে এ-বিষয়টি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

বাঙ্গালী চিন্তাশীল মনীষীরা ইংরেজি শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উচ্চভাবধারার মিলন ও তার সুফলের কথা ভেবেছিলেন ("··· had visions of a union of Hindu and European learning" and "of engrafting of European science and literature on the carefully tended tree of Indian culture." P. 11)।

পাদ্রী মহোদয়রা মনে করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে নতুন জ্ঞানলাভ হবে। নিজের ধর্ম্মমতে আস্থাহীন হয়ে অন্তর দিয়ে যীশু ভজবে, আর তার ফলে একটা নতুন খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য লাভ হবে ("The missionaries were at work ... with a firm conviction that western learning would most effectively win India for Christ." P. 12)।

ভারতের নব ভাগ্যবিধাতারা ভাবছিলেন কেমন করে সস্তায় রাজ্য-পরিচালনায় কিস্তিমাৎ করতে পারা যায়। ইংরেজি বিদ্যায় একেবারে অজ্ঞ লোক দিয়ে ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত সরকারী কাজকর্ম্ম চলতে পারে না। উচ্চপদের জন্যে শ্বেতাঙ্গ আসতে পারে, কিন্তু কম মাইনের কাজ চালাবার উপযুক্ত লোক চাই। ("What was contemplated was the appointment of natives in increasing numbers"... and this step was "necessary on grounds of economy and with a view to keeping within reasonable limits the cost of administration." P. 13)

মোটের ওপর, ইংরেজি শিক্ষার বীজ নানারকম সার ও সেচ পেয়ে অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুর থেকে মহীরুহে পরিণত হবার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল।

এখানে সিপাহী সংগ্রাম ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে যে-সকল শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলার নানা স্থানে গড়ে ওঠে, তার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। তা থেকেই সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হতে পারবে।

এই যুগে জাতীয়তাভাব প্রসার-চেষ্টা শিক্ষিত, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজি-ভাষাভিজ্ঞ লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি

প্রতিবৎসরই নতুন ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছে এবং জাতীয় আন্দোলনও পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সে যুগে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য তার অনেকগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে নূতন স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অনুমোদন পেয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। এ ঘটনার আগে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, হয়ত স্কুল থেকে কলেজে পরিণত হয়ে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের কথা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ঐ কালেও বহু বেসরকারী পাঠশালা প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

স্মরণ রাখতে হবে (১৮৩৫, ফেব্রুয়ারী ২-রা) সে-কালের শিক্ষার মাধ্যমকে গ্রহণ করায় ইংরেজি শিক্ষা সুগম করেছিল।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

একেবারে গোড়ার দিকে, ১৭৮১-তে, হেষ্টিংস কর্তৃক ক্যালকাটা মাদ্রাসা (Calcutta Madrassa) প্রতিষ্ঠিত হয়, "enabling the Muhamedans of Bengal to acquire such knowledge of Arabic literature and sciences as would qualify them for public service"—সরকারী কাজের জন্য লোক পাবার আশায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারিত হ'ল।

বাঙ্গলার বাইরে হলেও ইংরেজি শিক্ষার আদিযুগে বেনারস সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৭৯২-তে। উদ্দেশ্য, "cultivation of language, literature and the religion of the Hindus"—হিন্দুদের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চা। ১৮৫০-তে একটি স্বতন্ত্র ইংরেজী স্কুলের জন্ম হয়; ১৮৫৩-তে ঐ স্কুল পূর্ব্বেকার "কলেজ"-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

এশিয়াটিক সোসায়েটি

স্কুল বা কলেজ না হলেও, বাঙ্গলার শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও ধারাবাহিকতা রাখবার জন্য এর উল্লেখ করতে হচ্ছে।

বাঙ্গলা দেশে তথা সারা ভারতবর্ষে, এশিয়াটিক সোসায়েটির দান অতুলনীয় আর এটির নিজস্ব গুণ ও প্রয়োজনীয়তার জন্য আজও সগৌরবে টিকে আছে। জোন্স (William Jones, ১৭৪৬-১৭৯৪) এবং তাঁর সহকর্ম্মিবৃন্দ উইলকিন্স, (Charles Wilkins), চেম্বার্স (William Chambers), শোর (John Shore), গ্ল্যাডউইন (Francis Gladwin), কারনাক (John Carnac), ডানকান (Jonathan Duncan) প্রমুখ মনীষিবৃন্দ ভারতের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার জনসাধারণের গোচর করে গেলেন, চক্ষু খুলে দিয়ে নূতন প্রাণের স্পন্দন দান করলেন।

জোন্স ১৭৮৪ (জানুয়ারী ১৫-ই) এশিয়াটিক সোসায়েটির পত্তন করেন। মুখপত্র *Asiatic Researches* (এশিয়াটিক রিসার্চেস) প্রথম প্রকাশিত হয়

১৭৮৯-এর জানুয়ারীতে। দেশ ও বিদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম্ম, দর্শন, কলা, সাহিত্য, প্রাচীন লিপির কোষ্ঠীবিচার, মুদ্রাতত্ত্ব, প্রকৃতি পরিচয়, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির দান, এবং সমিতির গবেষণার ধারায় যা ধরা পড়েছে সে-সকল জ্ঞান সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হ'ল প্রধান লক্ষ্য।

যাঁরা এসকল দুষ্প্রাপ্য, অতি আয়াসলভ্য প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন, তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, জ্ঞানানুসন্ধিৎসা, নিঃস্বার্থ কর্ম্মানুরক্তি এবং ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতির কথা ভাবলে বিস্ময় জন্মে। আজ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের 'মরা সুসাইট' অর্থাৎ মিউজিযাম, ভূতত্ত্ব-বিভাগ, আবহ-নির্ণয়-বিভাগ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান কয়টি এশিয়াটিক সোসায়েটির প্রেরণায় সৃষ্ট হয়েছে।

'সোসায়েটি' একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান। ১৮২৯ পর্য্যন্ত এখানে কোনও ভারতবাসী সমিতির সভ্য মনোনীত না হলেও বিদ্বান বিচক্ষণ ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজ পণ্ডিতদিগের সংযোগ ঘটিযে ভারতের মহদুপকার সাধন করেছে। এই সম্পর্কে জোন্স এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও দুই দেশের অপরাপর বহু কৃতবিদ্য মিলিত হওযায় পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধার বন্ধনে পরস্পরে বাঁধা পড়ায় নূতন সংস্কৃতি গড়ে-ওঠার সুবিধা হযেছিল। দুই দেশের যা মহৎ তা উভয় পক্ষই গ্রহণ করার এক অপূর্ব্ব স্পৃহণীয় সমন্বয় ঘটলো। এখানে ইংরেজ জাতির অপগুণ চাপা পড়ে যেটা ভারতের কল্যাণকর এবং তার পক্ষে অনুকরণীয়, সেটাই বড় করে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্রুত ইংরেজি-শিক্ষা-বিস্তার ও ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরক্তি পুষ্টিলাভ করার পক্ষে এশিয়াটিক সোসায়েটিকে অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা না হলেও এশিয়াটিক সোসায়েটির অতুলনীয় দানের কথা স্মরণে রাখার জন্য এর পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে লেখা হ'ল।

স্কুল-কলেজ

এবার স্কুল-কলেজের বাকী কথাগুলি শেষ করা যাক। নানারকম স্কুল—গুরুমশায়ের পাঠশালা থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত, বাঙ্গলাদেশে একই সঙ্গে চলছিল। সরকারী বড় বড় স্কুলে ইংরেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন অনেক; বাঙ্গালী শিক্ষক ত থাকবারই কথা। এঁদের একসঙ্গে শিক্ষা-কেন্দ্রে মিলিত হয়ে থাকায় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল প্রচুর। আর সেটা ছাত্রদের মধ্য দিয়ে সমাজের সর্ব্বস্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

বহু স্কুল-কলেজের মধ্যে যেগুলি কিছু বিশেষত্ব লাভ করেছিল, তার কয়েকটির উদ্ভবের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

ক্যালকাটা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত স্কুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরই ফোর্ট উইলিয়ম (Fort William) কলেজ-এর কথা আসে। ১৮০০ সালে নভেম্বর মাসে ওয়েলেসলির (Lord Wellesley) উৎসাহে কলেজটি স্থাপিত হয় "for the training of young civilians in Calcutta"—কলকাতায় স্বল্পবয়সী বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের (যেমন আই-সি-এস্) শিক্ষার কেন্দ্র। সেটি অপর এক বড় উদ্দেশ্য সাধন করে অর্থাৎ "paved the way for English education by bringing officers and Indian scholars together so that they can learn each other's language." (*Hundred Years of the University of Calcutta*, Vol. I, p. 5). তাঁরা পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পাবেন। এখানে মহামতি কেরী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু মনীষীর সংযোগ একসঙ্গে ঘটেছিল।

কলেজ কিছুদিন চলবার পরে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাচ্যের বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য এরই অপর একটি বিভাগ খোলা হয়।

বর্দ্ধমানরাজের দানে পুষ্ট হয়ে ১৮১৭-তে ইংরেজি-বাঙ্গলা (Anglo-Vernacular) বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বহু বৎসর পরে ১৮৮৬-তে একে দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্টস্ কলেজে উন্নীত করা হয়েছিল।

১৮১৭ (জানুয়ারী ২০-এ) **হিন্দু কলেজ** (১৮২৫ পর্য্যন্ত কেবল 'বিদ্যালয়') স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজ ও বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায়। যদিও রামমোহনের আদর্শমত কলেজ রূপ গ্রহণ করে, গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তি হতে পারে বলে প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বাঙ্গলার প্রথম জাগরণের যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ক্রিয়াকাণ্ড সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড ছাপ রেখে গেছে। পরে ১৮৫৩-তে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার নিলে বিদ্যালয়টি **প্রেসিডেন্সী কলেজ** নামে পরিচয় লাভ করে।

স্কুল-কলেজ না হলেও, বাঙ্গলার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শিক্ষা সুগম করেছে ১৮১৭ (জুলাই ৪-ঠা) প্রতিষ্ঠিত **স্কুল বুক সোসায়েটি** ও ১৮১৮ (সেপ্টেম্বর ১-লা) উদ্ভূত **কলিকাতা স্কুল সোসায়েটি**। প্রথমটি বাঙ্গলার বিভিন্ন স্তরের স্কুলের পাঠ্যপুস্তক লিখতো ও সরবরাহ ক'রতো, আর দ্বিতীয়টি পুরাতন স্কুলের সংস্কার ও নতুন স্কুল স্থাপন করবার ভার নিয়েছিল। পরে ১৮২৩ (জুলাই ১৭-ই) বাঙ্গলার শিক্ষার ওপর তদারকী করবার জন্য ("as the sole organ of the Government in matters that concerned education"—General Committee of Public Instruction) সাধারণ শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এ তিনটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্য্যকারিতায় সমস্ত স্কুলের প্রভূত উপকার সাধন করেছে।

হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কর্ত্তৃক ১৮১৮-তে **শ্রীরামপুর কলেজ** জন্মলাভ করে। অন্যান্য নানা জনহিতকর কাজের মধ্যে এই কলেজ তাঁদের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

খুব গোড়ার দিকে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর প্রায় সবটাই ক্রীশ্চান মহিলাদের উদ্যমের ফল। ১৮১৯-তে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান (Female Juvenile Society) গঠিত হয়েছিল। এর সভ্য-তালিকায় একটিও ভারতীয় মহিলা ছিলেন না। দরিদ্র পরিবারের বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল ইঁহাদের লক্ষ্য। পাদ্রী সম্প্রদায় (Baptist Mission) ছিল এঁদের পৃষ্ঠপোষক। রাধাকান্ত দেবও ইহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন। কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

আবার ১৮২৪-তে এক নারী সমিতি (Ladies' Society) দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা দিবার জন্য গঠিত হয়। কিন্তু গুজব রটে যায় যে, এঁদের উদ্দেশ্য ঐসব ছাত্রীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা। শেষ পর্য্যন্ত বড়লাট আতঙ্কিত হয়ে অর্থ-সাহায্য বন্ধ করেন এবং এ প্রতিষ্ঠান উঠে যায়।

কলিকাতায় প্রথম 'লাট' বা শ্রেষ্ঠ পাদ্রী (Bishop) মিডল্‌টন কর্ত্তৃক ১৮২০-তে কলকাতায় **বিশপ্‌স কলেজ** (Bishop's College) স্থাপিত হয়। ১৮২৯ পর্য্যন্ত এখানে অ-খৃষ্টীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না।

এদেশীয় আর্ম্মেনিয়ানরা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৮২১ (এপ্রিল ২-রা) আর্ম্মেনিয়ান কলেজ সৃষ্ট হয়। পরে আর্ম্মেনিয়ান ফিলানথ্রপিক এ্যাকাডেমির (Armenian Philanthropic Academy) সঙ্গে আবাসিক (boarding) স্কুলে পরিণত হয়।

হিন্দু স্কুল গঠিত হবার সময় রামমোহন সরে দাঁড়ালেও ১৮২২-তে তিনি এ্যাংলো হিন্দু স্কুল নামে এক স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮২৩-তে স্কুল সোসায়েটি এক ইংরেজি স্কুল (English School) স্থাপিত করে। হেয়ার সাহেবের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকায় এইটি **হেয়ার স্কুল** নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রসিদ্ধ 'আড়পুলি পাঠশালা' পরে ইহার সহিত যুক্ত হয়।

ছাত্রাবাস-সমন্বিত স্কুল পেরেণ্টাল এ্যাকাডেমিক ইনষ্টিটিউশন (Parental Academic Institution) ১৮২৩ (মার্চ্চ ১-লা) স্থাপিত হয়। ১৮৫৫-তে নাম পরিবর্ত্তন হয়ে **ডভটন** (Doveton) **কলেজ** বলে পরিচয় লাভ করে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক **সংস্কৃত কলেজ** স্থাপিত হয় ১৮২৪-তে। উদ্দেশ্য "cultivation of Sanskritic learning in all its branches". এখানে ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত ইংরেজি শিক্ষাদান চলতো। তার পর থেকে বন্ধ হয়ে আবার ১৮৪৪ থেকে চালু হয়।

রাজসাহীর বাউলিয়া হাইস্কুল ১৮২৮-তে গ্রামবাসীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ১৮৩৬-তে গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে এটি জেলা স্কুল এবং ১৮৭৩-তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়।

বে-সরকারী প্রচেষ্টায় বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। তন্মধ্যে **ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী** (Oriental Seminary)-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ (মার্চ্চ ১-লা) গৌরমোহন আঢ্য কর্ত্তৃক নিজ ব্যয়ে এটি স্থাপিত হয়। সে-যুগে বিদ্যালয়টি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল এবং এর বহু ছাত্র উত্তরকালে যশস্বী হয়েছিলেন। কলকাতার সে-যুগে যত সব নাম-করা স্কুল ছিল তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৌরমোহনের 'সেমিনারী'র নাম সসম্মানে উচ্চারিত হ'ত।

১৮৩০-তে ডাফ (Alexander Duff) কর্ত্তৃক **জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন** (General Assembly's Institution) নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৪৩-তে এর নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে ফ্রী চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন (Free Church Institution) হয়। শেষ পর্য্যন্ত **ডফ কলেজ** নামেই চলে।

ওদিকে ১৮৩০-তে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ (জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন) স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৩৯-তে কলেজটি নিজ ভবনে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে (আজাদ হিন্দ বাগ) স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৭-এ দুই কলেজ মিলে প্রথমে ক্রীশ্চান কলেজ এবং ১৯০৮-তে **স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ** নাম গ্রহণ করে।

মেদিনীপুরে ১৮৩৪-তে বেসরকারী এক স্কুল স্থাপিত হয়। দুই বছরের মধ্যে তাকে "জিলা" স্কুল ও ১৮৭৩-তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হয়।

বিপক্ষ দলের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বড়লাটের (Gevernor-General) আদেশে ১৮৩৫ (ফেব্রুয়ারী ২০-এ) **মেডিকেল কলেজ** খোলা হয়। প্রারম্ভে ছোট আদালতের অবস্থান-ভূমিতে (Petty Court Jail) হিন্দু কলেজের পিছন-দিকে কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথম সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল খোলা হয়েছিল ১৮৩৮ এপ্রিলে। বর্ত্তমান হাসপাতাল রোগী ভর্ত্তি আরম্ভ করে ১৮৫২ (ডিসেম্বর ১-লা) থেকে।

এরও একটু আগের খবর দেওয়া যেতে পারে। ১৮২২ (জুন) চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষা-ব্যবস্থার সরকারী হুকুম হয় (School of Native Doctors) "for the instruction of Natives in medicine with a view to civil and military service". ডঃ টিটলার (Tytler) এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হলে (১৮২৮) "টিট্‌লারের স্কুল" বলে বহুদিন এটি পরিচিত ছিল। ১৮২৮ সালে ছাত্ররা ঘৃণা-সঙ্কোচ-বর্জ্জিত প্রফুল্ল মনে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন।

এ স্কুল চলার কালে ১৮৩৫ (জানুয়ারী ২৮-এ) বিস্তৃতভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়।

ঢাকা কলেজ ১৮৩৫-তে জন-শিক্ষা কমিটির নির্দ্দেশে স্থাপিত হয় ; সরকারী অর্থানুকূল্য ছিল ইহার প্রধান সহায়।

চট্টগ্রাম জিলা স্কুলের আবির্ভাব ১৮৩৬-তে ; পরে তাকে কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

ফরাসীদেশীয় মার্টিন (Claude Martin) ১৮৩৬-তে **লা মার্টিনিয়ার** (La Martiniere) **কলেজ** কলিকাতার খৃশ্চান নাগরিকদের শিক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।

হাজি মোহম্মদ মহ্সীনের দানে পুষ্ট **হুগলী কলেজ** ১৮৩৬-তে স্থাপিত হয়। হাজি সাহেবের উইলে ছিল ভগবানের সেবায় ("in the Service of God") অর্থ ব্যয়িত হবে।

লণ্ডন মিশনারী সোসায়েটি (London Missionary Soeiety) ১৮৩৮-তে ভবানীপুরে তাঁদের **ইন্‌ষ্টিটিউশন** (L. M. S. Institution) পত্তন করে। ১৮৫৮-তে প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল।

কারিগরী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়েছিল এ-সময়। ক্যালকাটা মেকানিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট (Calcutta Mechanical Institute) নামে এক শিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৮৩৯-তে স্থাপিত হয়েছিল। এর বিবরণ আর কিছু পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বল্পকালের মধ্যে উঠে যায়।

১৮৪২-তে লরেটো সিষ্টার্সদের (Loreto Sisters) নির্দ্দেশে **লরেটো হাউস** স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ থেকে এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন লাভ করেছে এবং নারীদিগের উচ্চশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে পরিগণিত হয়ে আছে।

শিক্ষাকেন্দ্রে বৈদেশিক প্রভাব খুব বেশী কাজ করছে এবং সরকারী বা সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় দেশীয় ভাবধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে ১৮৪৩ (মার্চ্চ ১-লা) দানবীর মতিলাল শীলের বদান্যতায় অবৈতনিক **সীলস্ ফ্রী কলেজ** স্থাপিত হয়েছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজ রিচার্ডসনকে অধ্যক্ষ করে ১৮৪৬-তে কার্য্যারম্ভ করে। দু'বছর পরে শিক্ষা সমিতি (Council of Education) এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় ১৮৪৬-তে উত্তরপাড়া স্কুল স্থাপিত হয়ে ১৮৮৯-তে কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সেণ্ট যোসেফস্ হাই স্কুল (St. Joseph's High School বা St. Joseph's College) ১৮৪৮-তে ও সেণ্ট জেভিয়ার স্কুল (St. Xavier's School) ক্যারিউ (Mgr. Carew) কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। উচ্চস্তরের শিক্ষাদানের জন্য তিনি আয়র্লণ্ড থেকে শিক্ষক আনিয়েছিলেন। বর্ত্তমানের **সেণ্ট জেভিয়ারস্** (St. Xavier's) **কলেজ** যীশু সোসায়েটি (Society of Jesus) কর্ত্তৃক ১৮৬০

সালে অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের পরে স্থাপিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান তালিকায় তার নাম অবান্তর বলে মনে হবার কথা।

বাঙ্গলার নারীশিক্ষা প্রসারের অন্যতম ঋত্বিক্ মহামতি বেথুন বালিকাদের জন্য ১৮৪৯-তে **বেথুন কলেজ** স্থাপন করেন এবং আমৃত্যু তার ব্যয়ভার বহন করে গেছেন। ১৮৭৮-তে কলেজ আরম্ভ হয়।

বহরমপুরে ইংরেজি অবলম্বন করে ১৮২৬-তে এক কলেজ কার্য্যারম্ভ করে। কিছুকাল পরে তার অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায়। ১৮৫৩-তে **কৃষ্ণনাথ কলেজ** নামে নতুন কলেজটি জন্মলাভ করে। পুরাতনের সঙ্গে এর কোনও সংস্রব নেই।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এক কোণে ১৮৫৬-তে **সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ** (Civil Engineering College) ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। ১৮৬৫-তে একে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০-তে শিবপুরে নতুন বাড়ী তৈরী হলে এটি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্বতন্ত্র আবাস পায়।

যে স্কুল-কলেজগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত, তাদেরই নাম এখানে প্রকাশ করা হ'ল। এ ছাড়া যে বহু বে-সরকারী এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের অর্থসাহায্যপুষ্ট ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৮০৭ থেকে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গলার প্রায় সব বড় বড় জেলায় গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যপুষ্ট বহুসংখ্যক স্কুল চালু ছিল। তন্মধ্যে ত্রিবেণী, উমেরপুর (হুগলী), বাঁকুড়া, যশোহর, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে এই শ্রেণীর স্কুলের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পত্র-পত্রিকা

"ইয়ং বেঙ্গল"-এর দল নিজেদের ভাবধারা প্রচার করবার জন্য সাময়িক পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত পত্রিকা শিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাঙ্গলা ভাষার জ্ঞান তখন খুব ব্যাপক হয়নি, আর ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিতদের নতুন জ্ঞানার্জ্জনের যে স্পৃহা গজিয়ে উঠেছিল, বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ লোকের আকুল আগ্রহ তার তুলনায় কিছুই ছিল না বলা চলে।

ইংরেজি ও বাঙ্গলা কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার পরিচয় রেখে না দিলে তখনকার রাজনৈতিক চিত্রের খুব স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে আলোড়ন-ধর্ম্মী পত্রিকার প্রসঙ্গে প্রথমেই ডিরোজিওর কথা উত্থাপন করতে হয়। তাঁর আবির্ভাবের আগে উল্লেখযোগ্য পত্রিকার মধ্যে ১৮১৮ সালে প্রচারিত শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের 'সমাচার দর্পণ', 'দিগ্‌দর্শন', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'কে দেখতে পাওয়া যায়। অপরাপর সমসাময়িক পত্রিকার মধ্যে সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গলা গেজেটি' (১৮১৮), রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিশনারী সংবাদ' (১৮২১), ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য ও তারাচাঁদ দত্তর 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার-চন্দ্রিকা' (১৮২২), একক ভবানী ভট্টাচার্য্য পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' (১৮২২) বিশেষ পরিচয় লাভ করে।

বিদেশী পাদ্রীরা ছাড়া অপর দুটি ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকার নাম বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার তালিকায় উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে।

'ক্যালকাটা গেজেট' (Calcutta Gazette) ও 'মর্নিং পোষ্ট' (Morning Post)-এর স্থান গ্রহণ করে বাকিংহ্যাম (James Silk Buckingham)-এর পরিচালনায় ১৮১৮ অক্টোবর ২-রা 'ক্যালকাটা জর্নাল' (Calcutta Journal) সপ্তাহে দু'সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৮১৯ (মে ১-লা) থেকে পত্রিকা দৈনিকে পরিণত হয়। এতে ভারতের স্বার্থের সঙ্গে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত সকল সংবাদের চুম্বক প্রকাশিত হ'ত। তা ছাড়া অন্যান্য ইংরেজি পত্রিকায় মুদ্রিত ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধাদি ক্যালকাটা জর্নালে পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় সে-সকল প্রবন্ধের বহুল প্রচার হতে থাকে। বাকিংহাম রামমোহনের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন এবং রাজা তাঁর অনেক রাজনৈতিক মতবাদ এই বন্ধুকে লিখে জানাতেন। ভারত-প্রীতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাকিংহাম এ-দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হন। ইংলণ্ডে বসে তিনি

'ওরিয়েণ্টাল হেরাল্ড' (Oriental Herald) নামে পত্রিকা প্রচার করে ভারতবর্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নশীল ছিলেন।

সেকালে 'বেঙ্গল হরকরা' (Bengal Hirkara) বিশেষ নাম করেছিল, গোড়ার দিকে নীলকরদের সহায়তা ক'রে। ১৭৯৮ থেকে ম্যাক্লিন (Charles Maclean)-এর সম্পাদনায় এটি পরিচালিত হয়। ১৭৯৫ জানুয়ারী ২০-শে থেকে Bengal Hircurrah (Oriental Star Office) নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, ম্যাকলিনের পত্রিকার সঙ্গে সম্ভবতঃ তার কোনও যোগাযোগ ছিল না। ১৮১৯ থেকে 'বেঙ্গল হরকরা' দৈনিকে পরিণত হয়। ভারতের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় ম্যাকলিন নানা নির্য্যাতন ভোগ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারত থেকে নির্ব্বাসিত হন।

আবার, নীলকরদের হাঙ্গামার সময় (১৮৫৯-১৮৬১) ফরবেস (Alexander Forbes)-এর সম্পাদনায় রায়তের বিপক্ষে কলম চালিয়েছে। এর সঙ্গে ছিল ইংলিশম্যান।

১৮৩০ (ফেব্রুয়ারী ১৫-ই) ডিরোজিওর ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিকের পরিচালনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'পার্থেনন' (Parthenon) প্রকাশিত হয়। মাত্র এক সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার জন্য নানা বাধা সৃষ্টি হওয়ায় দ্বিতীয় সংখ্যা আর প্রকাশিত হ'তে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (নিউ এজ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃঃ ৮৭) পুস্তকে লিখেছেন যে, "ডিরোজিওর শিষ্যগণ Athenaeum নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখলেন—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"—'যদি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কিছুকে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম'। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ পত্রিকার দুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন।"

সম্ভবতঃ 'এথিনিয়ম' 'পার্থেনন' একই, নামে কিছু ভুল হতে পারে।

১৮৩১ সালে ডিরোজিও 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া' (East India) নামে আর এক পত্রিকা প্রকাশ করেন; তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩১ মে মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'ইনকোয়্যারার' (Inquirer) পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়। স্বাধীন মতবাদে পত্রিকাটি সকলকে চমৎকৃত করেছিল। প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা সেকালের প্রগতিশীলদের নিকটও নূতনতর লেগেছিল।

পার্থেনন-এর তিরোভাবের পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৮৩১ থেকে ১৮৪৪ পর্য্যন্ত চলেছিল। সঙ্গে জড়িত ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ বসু ; আর দক্ষিণারঞ্জন ত ছিলেনই। ১৮৩৩ সালের সনদের প্রতিবাদে রসিককৃষ্ণ পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

নিবিড়ভাবে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের শিক্ষা আসতে থাকে ১৮৩১-তে (জানুয়ারী ২৮) প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ প্রভাকর' থেকে। সম্পাদক স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, প্রকৃতি, পূজাপার্ব্বণ, ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক আচার, আদব-কায়দা, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, অতি সাধারণ ভোজ্যদ্রব্য সবই আলোচিত হ'ত। হাস্য-কৌতুক, বিদ্রূপ একেবারে কশাঘাতের মত তীক্ষ্ণ ছিল। গুপ্তকবির হাতে পড়ে দেশপ্রেম অপরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল। দেশের পরস্পরের প্রতি "ভ্রাতৃভাব" মনে রাখতে হবে, দেশের কুকুরটাও বিদেশীর "ঠাকুর" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৮৩৯ জুন ১৪-ই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দায়িত্ব নিয়ে পত্রিকাটিকে দৈনিকে পরিণত করেছিলেন।

১৮৩২-এ রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে একখানি স্বল্পকাল-স্থায়ী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ইণ্ডিয়া গেজেট (India Gazette) ১৭৮০ নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। স্থাপয়িতা ছিলেন মেসিন্‌ক (E. Messink) ও রীড (Peter Reed)। এই পত্রিকাই বরাবর চলেছিল কিনা বলা কঠিন। ১৮০২ থেকে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। বিতণ্ডামূলক প্রবন্ধ মুদ্রিত করে পত্রিকাখানি নব্য দলের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। বিশেষ করে ইংরেজের স্বরূপ-উদ্ঘাটন-কল্পে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ ফেব্রুয়ারী ৮-ই কলকাতায় যে বক্তৃতা দেন সেটি মার্চ্চ মাসের দুই সংখ্যায় মুদ্রিত করে পত্রিকাখানি বিশেষ সাহসের পরিচয় দেয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে ঠিক নব্য বাঙ্গলার দলভুক্ত করা যায় না ; কিন্তু তিনি যে বিশেষ প্রগতিবাদী ছিলেন, তাতে কোনও ভুল নেই। তাঁর সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার' (Indian Reformer) পত্রিকা ১৮৩১ সালে আবির্ভূত হয়। নব্য বাঙ্গলার মতবাদ এই পত্রিকায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁদেরই অন্যতম মুখপত্র বলে বিবেচিত হয়েছে।

১৮৪২ এপ্রিল মাসে দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও বাঙ্গলা) মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (Bengal Spectator) প্রকাশিত হয়। সেই কয়টি পরিচিত নাম—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে রামগোপাল ঘোষ পত্রিকা পরিচালনা করেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে পাক্ষিক ও ১৮৪৩ থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উচ্চস্তরের সাহিত্যিক পত্রিকা 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' (Hindu Intelligencer)

পত্রিকাখানি স্বনামধন্য কাশীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাবলী পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। তা ছাড়া তাৎকালিক ঘটনাসমূহের পরিচয় এবং দেশের কল্যাণকর প্রবন্ধাদি সুধীমহলে পত্রিকার সমাদর বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

নব্য বাঙ্গলার উন্মাদনায় কিছু ভাঁটা পড়লেও যখন আবহাওয়া নতুন ভাবে বিশেষরকম প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, সেই সময় ১৮৪৯-তে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' (Bengal Recorder) পত্রিকাখানি গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীনাথ ও ক্ষেত্রচন্দ্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ জানুয়ারী ৬-ই থেকে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে নাম বদল হয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (Hindoo Patriot) হয়।

হাঁস বা ময়ূরের পালকের কলম (quill) ছিল প্রাচীন ভারতে লেখনী। মহাভারত লিখতে হয়ত স্বয়ং শ্রীগণেশ এই লেখনী ব্যবহার করে থাকবেন। খাগড়া বা সর-এর কলম তত কর্ম্মকুশল ও জনপ্রিয় ছিল না। ধাতব নিবের চলন হয়েছে যন্ত্রযুগে, মানব-সভ্যতার অভিযানের কয়েক সহস্র বৎসর পরে। এই 'কুইল' (Quill) নাম গ্রহণ করে ১৮৪২ (অথবা ১৮৪৩) সালে স্বয়ং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় পত্রিকাটি আবির্ভূত হয়। দলের মধ্যে তারাচাঁদের যে উচ্চ স্থান ছিল, তাতে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশে এত বিলম্ব হওয়ায় একটু বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু স্বমত-প্রচারে তাঁর কোনও অসুবিধা ছিল না। গোষ্ঠীর যে-কোনও পত্রিকা তাঁর প্রবন্ধ, বক্তৃতা প্রভৃতি ছাপাতে গৌরব বোধ করতো।

পত্রিকার প্রবাহ চলেছে এবং নানা ক্ষেত্রে দেশপ্রেম প্রচার করা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের পক্ষে এতগুলি পত্রিকার আবির্ভাব এখন বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

এসকল ছাড়া আরও কয়েকখানি পত্রিকার উদ্ভব এসময়ে ঘটেছিল যাতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবহমান ছিল। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, বিশেষতঃ সাধারণ ধর্ম্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সদাচার, কদভ্যাস পরিবর্জ্জন প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ বহন করে পত্রিকাশ্রেণী চলেছে ; নীলচাষীদের দুর্দ্দশা প্রকাশ করা ছিল অন্যতম কাজ। এ কালের উল্লেখযোগ্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩ আগষ্ট ১৬-ই আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাতা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত —একেবারে মণিকাঞ্চন-সংযোগ! 'সমাচার সুধাবর্ষণ' (১৮৫৪)-এর কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। ১৮৫৫-তে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব হয় ; সম্পাদক হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ইয়ং বেঙ্গল দল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে প্রবল সুরতরঙ্গ তুলেছিল, তার প্রতিধ্বনি প্রায় সকল পত্রিকায় ঝঙ্কৃত হয়। তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রচারের

ধর্ম্ম বেশ বুঝতে পেরেছেন, সাধারণের জ্ঞানের পরিধি-বিস্তারের সুফল হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। সে-কারণে কেবল ১৮৩১ সালে—"চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন"-এর প্রতিপত্তির যুগে অপরাপর যে-সকল পত্রিকা জন্মলাভ করে, তার কয়েকটির উল্লেখ করলে বোঝা যাবে তরঙ্গের রেশ কতদূর ছড়িয়েছিল। সকলগুলিই যে রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করতো, তা নয়; কিন্তু তাৎকালিক চিন্তাশীল বিদ্বান্ লোকের মন কত দিকে প্রধাবিত হয়েছিল, তাব অন্ততঃ কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। এ সময় প্রতিবৎসরই নূতন নূতন পত্রিকা বেরিয়েছে; বাহুল্য ভয়ে তার উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

এখানে কয়েকটি পত্রিকাব নাম দিতে চেষ্টা করছি (কেবল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের):

সম্বাদ ময়ূখ, সাপ্তাহিক পত্রিকা, সম্পাদক: ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়;

সম্বাদ-সৌদামিনী, সাপ্তাহিক, সম্পাদক: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত;

জ্ঞানোদয়, মাসিক, সম্পাদক: রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র;

সম্বাদ-রত্নাকর, সাপ্তাহিক, সম্পাদক: মধুসূদন দাস;

অনুবাদিকা, মাসিক, সম্পাদক: ভোলানাথ সেন;

সম্বাদ-সুধাকর, মাসিক, সম্পাদক: প্রেমচাঁদ রায;

সমাচাব সভারাজেন্দ্র, বাঙ্গলা ও ফার্সী মাসিক, সম্পাদক: সেখ আলিমুল্লা;

নিত্য প্রকাশ, দৈনিক, সম্পাদক: দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়;

সম্বাদসার সংগ্রহ, সাপ্তাহিক।

এ ছাড়া আরও পাঁচখানি ইংরেজি পত্রিকা ঐ ১৮৩১ সালেই প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল না।

সিপাহী-যুদ্ধের পরে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে স্থান গ্রহণের কথা, তথাপি বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে এর বড় অবদান আছে বলে এই সঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল: 'সোমপ্রকাশ' আবির্ভাবের কাল ১৮৫৮ (নভেম্বর ১৫-ই)। সরকারী কার্য্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হ'ত এবং শোনা যায় সরকারী দপ্তরে সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবার আদেশ ছিল। ১৮৭৮-তে দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন (Vernacular Press Act) পাশ হ'লে দ্বারকানাথ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেন।

ঐ ১৮৫৮-তে প্রকাশিত আর এক পত্রিকার নাম লোকে প্রায় উচ্চারণ করে না। কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায়, জেম্‌স্ হিউম প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' (Indian Field) দেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ সাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। নীল-রায়তদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টায় এ-পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সমগোত্র হয়ে উঠেছিল।

মুদ্রাযন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গালার বিভিন্ন পত্রিকা জনসাধারণের মধ্যে নানারকম তথ্য পরিবেশন করেছে। পাঠকের মনে সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গলের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। সতর্ক গভর্ণমেণ্ট খুব ভাল-চোখে এদের দেখেনি এবং সুবিধামত আইন করে এদের খর্ব্ব করেছে।

ভারতের বড়লাট (১৭৯৭-১৮০৫) ওয়েলেস্‌লি (Richard Colley Wellesley) ১৭৯৯ মে ১৩-ই মুদ্রাযন্ত্রেব ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। প্রায় বিশ বৎসর চলবার পর বড়লাট হেষ্টিংস (Francis Rawdon Hastings: 1813-21) ১৮১৮ আগষ্ট ১৯-এ নিয়ন্ত্রণ আইন রহিত করেন। অস্থায়ী লাট এ্যাডাম (John Adam) ১৮২৩ মার্চ্চ ১৪-ই নিয়ন্ত্রণ আইনের পুনঃ প্রয়োগ করেন। এরই তোড়জোড়ের মুখে বাকিংহ্যামকে (James Silk Buckingham) ঐ সঙ্গেই ফেব্রুয়ারী ১২-ই ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। আত্মসম্মানসমৃদ্ধ রামমোহন এই আইন রদ করবার জন্য বহু চেষ্টা করে বিফল হন। প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মিরাৎ-উল্‌-আখবর' বন্ধ করে দেন ১৮২৩ এপ্রিল ৪-ঠা।

পরে আবার বড়লাট মেট্‌কাফ (Charles Theophidus Metcalf) ১৮৩৫ সেপ্টেম্বর ১৫-ই ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করেন।

সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলছিল। পরে বড়লাট ক্যানিং (Charles John Canning ১৮৫৬-১৮৬২) আবার ১৮৫৭ জুন ১৩-ই নিয়ন্ত্রণ আইন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাঙ্গলার সংবাদপত্র ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। বলা বাহুল্য, যথাকালে লেখনীমুখে অগ্নি ছড়িয়ে পত্রিকারাই ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেছিল।

সভা-সমিতি

ব্যাপক শিক্ষার স্পৃহা যখন চিন্তাশীল লোকের মনে স্থানলাভ করেছে, সঙ্গে তার চলেছে জাতীয় ভাব প্রচারের চেষ্টা। প্রথমদিকটায় সাধারণ জ্ঞানলাভের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয়তা ভাব কিছুটা সম্পৃক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে।

ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অংশভাগীদের মধ্যে নব চিন্তাধারা প্রবর্ত্তনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তার বাইরে যে ভাবধারা ফুটে ওঠে, সেটা গড়িয়ে গিয়ে দেশপ্রেমের মূলে রসসিঞ্চন করতে সমর্থ হয়।

কয়েকটি সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে এসবগুলিই—সিপাহী-অভ্যুত্থান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্ব্বের ঘটনা।

এ শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে **গৌড়ীয় সমাজ**; স্থাপিত হয় ১৮২৩-তে। যাঁরা ইংরেজিতে কৃতবিদ্য এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা বুঝলেন ইংরেজি শিক্ষার ফল ভাল হতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলাকে উপেক্ষা করে তাকে বড় হতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হতে পাবে না। এখানে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীরা এক-সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ফলে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসময় দত্ত প্রভৃতি হাত মিলিয়ে মাতৃভাষার উন্নতি ও তৎসাহায্যে সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল শাস্ত্রচর্চ্চা, প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার।

এ স্রোত একবার যখন বইতে আরম্ভ করে তখন আর রুদ্ধ হয়নি। গতি কখনও দ্রুত, কখনও স্তিমিত হয়েছে বটে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে **সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা** স্থাপন করেছিলেন ১৮৩২-তে। এখানেও সেই ইংরেজি ভাষার অব্যাহত প্রভাবকে কতক পরিমাণে রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল। সভার এক বিধানে বলা হয় যে, সভ্যরা বাঙ্গলা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করবেন না; এ বিষয়ে একটা অঙ্গীকার মেনে নিতে হ'ত।

এর পরে আবির্ভূত হয় (১৮৩৬) **বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা**। সাধারণ নিয়মে সমিতির নাম থেকে মনে করলে দোষ হ'ত না যে, এই সভার কাজ হবে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাপক প্রসার। উদ্যোক্তা ও স্থাপয়িতা হচ্ছেন কালীনাথ রায় চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি। এ সভার বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মত। এঁরা শুরুতেই স্থির করেন যে,

সভার অধিবেশনে ধর্ম্মচর্চ্চা করবেন না। অপরপক্ষে, ভারতের স্বার্থের হানিকর যে-সকল সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করবেন। গভর্ণমেণ্ট যখন লাখেরাজ (নিষ্কর) জমি-জমার ওপর কর ধার্য্য করে, তার বিরুদ্ধে "সভা" প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করেছিল। সভা "was a joint political move ... taken with the avowed object of opposing the Regulation for resumption of rent free lands". (P. N. Singh Roy : *Chronicle of the British Indian Association*, p-2). প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা দেশে এইটিই প্রথম রাজনৈতিক সভা।

যখন শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও ধনীদের মধ্যে জাতীয়তা-ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে ও স্বার্থরক্ষার চেষ্টা এসে রূপ নেয়, তখন হিন্দু কলেজের হল্-এ ১৮৩৭ (নভেম্বর ১২-ই) **জমিদার সম্মিলন** (Zemindary Association) গড়ে ওঠে। এখানে জাতিধর্ম্ম-নির্বিবশেষে সকল শ্রেণীর লোকদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হ'ত—"rejecting all exclusiveness" and "to be based on the most universal and liberal principles". তবে একটা সর্ত্ত ছিল—সভ্যদের এ-দেশের জমির সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ কিছু জমির মালিক (জমিদার) হওয়া চাই।

এ নাম শীঘ্র বদলে যায়। ১৮৩৮ (মার্চ্চ ২১-এ) "জমিদার" কথা বদলে "Landholders" (ভূস্বামী) কথা গ্রহণ করা হয়, এবং তখন থেকে পরিচয় দাঁড়ায় **"Landholders' Society".** লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়, প্রতিষ্ঠান মুখ্যতঃ জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান থাকলেও, এর প্রধান কর্ত্তব্য হবে "to afford the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights" and "to teach them manfully to assert their claims and give expression to their opinions"—সংবিধানসম্মতভাবে ন্যায্য দাবী আদায় করবার জন্য সংগ্রামের রীতি-পদ্ধতি এবং সাহসের সঙ্গে তাদের ন্যায্য পাওনার কথা উত্থাপিত করতে ও মতামত প্রকাশের কায়দা-কানুন শিক্ষা দেবে।

জ্ঞানলাভের স্পৃহা লোকের মধ্যে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই ক্ষুধা মেটাবার জন্যে, ১৮৩৮ মার্চ্চ ১২-ই **সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনভিত্তিক সভা** (Society for the Acquisition of General Knowledge) স্থাপিত হয়েছিল। এখানে সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও অর্থনীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চাও হ'ত। এক এক সভায় বক্তার জ্ঞান ও মর্জ্জির ওপর ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। তারাচাঁদ হলেন সভাপতি ও পিয়ারীচাঁদ মিত্র সাধারণ সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৯ (অক্টোবর ৬-ই) জন্মলাভ করে। মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অনেক পরে, ১৮৪৩ (আগষ্ট ১৬-ই), যাত্রা শুরু করেছিল। এ সভায় সাধারণতঃ রাজনীতি আলোচনার অবকাশ ছিল না। শিক্ষা, সমাজ,

ইতিহাস, নারীকল্যাণ, অনুবাদ, প্রাচীন গৌরব, সরল বিজ্ঞান, মিশনারীদের আক্রমণের প্রতিবাদ প্রভৃতি ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকার জনয়িতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পালনকর্ত্তা অক্ষয়কুমার দত্ত।

ভারতের কল্যাণে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সভা **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসায়েটি** (British Indian Society) লণ্ডনে এ্যাডাম (William Adam) কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় ১৮৩৯-এ। ঐ যুগে এ্যাডাম ছিলেন ভারতের প্রকৃত হিতৈষী। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৪১-তে ইংলণ্ডে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাডভোকেট' (British India Advocate) পত্রিকা পরিচালিত হয়। কাজের সুবিধার জন্য 'ল্যাণ্ড-হোল্ডাস' সোসায়েটি'র (ভূস্বামী পরিষদ-এর) পক্ষ থেকে ১৮৩৯ (নভেম্বর ৩০-এ) গৃহীত এক প্রস্তাবের বলে দুই সমিতি মিলিত হয়ে যায় (যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৫২, পৃঃ ৫১)।

দ্বারকানাথ ঠাকুর টম্‌সন্ (George Thomson)-কে বিলাত থেকে সঙ্গে করে কলিকাতায় আনবার পর ১৮৪৩ (এপ্রিল ২০) **বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসায়েটি** (Bengal British India Society) স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর প্রকৃত আর্থিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন, দেশের প্রাকৃতিক ও অপরাপর সম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তৎসাহায্যে সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সে-সকলের প্রয়োগ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, সাধারণের কল্যাণ, তাদের ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল-সাধনই এ-প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ("to employ such other means of peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects")।

বিভিন্ন ধারা এক হয়ে মিলিত হবার পথ খুঁজছিল। ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করা তখনও ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই ভেবে, এবং উদ্দেশ্য যখন একই, তখন আর দুটো স্বতন্ত্র সংস্থা না-রেখে, ১৮৫১ অক্টোবর ২৯-এ 'ভূস্বামী সঙ্ঘ' (Landholders' Society) ও 'বঙ্গীয় ইঙ্গ-ভারত সঙ্ঘ' (Bengal British India Society) মিলিত হয়ে **ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন** (British Indian Association)-এ পরিণত হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে, প্রতিষ্ঠানের প্রভাব-বিস্তার ও ভারতীয় জনগণের কল্যাণ-সাধন-প্রচেষ্টায় "এ্যাসোসিয়েশন" নূতন আদর্শ স্থাপনের অগ্রদূত। বিলুপ্ত দুটি সংস্থাতেই অভারতীয় সভ্য ছিল। কিন্তু বীটন (বেথুন) প্রবর্ত্তিত "কালা-আইন"-এর প্রতিবাদে ইংরেজের যে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল (১৮৪৯), তখন তাকে পরিবর্জ্জন করায় আর কারও আপত্তি ছিল না। এ প্রতিষ্ঠান "formed without a single European as its member....".

এই প্রসঙ্গে আরও একটি স্বল্পায়দিনস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

যখন ইউরোপীয়রা "কালা-আইন"-এর প্রতিবাদে গভর্ণমেণ্টকেও নাজেহাল করে ছাড়ল এবং ১৮৫৩-তে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নতুন শাসন-সংস্কার আসন্ন হয়ে এসেছে, তখন সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থরক্ষার কথা বড় হয়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যে পাইকপাড়া রাজবাটীতে ১৮৫১, সেপ্টেম্বর ১৯-এ, প্রতিপত্তিশালী লোকের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং **জাতীয় সভা** (National Association) গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অপরাপর ভদ্রমহোদয়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি। মুখ্য লক্ষ্য হ'লঃ "to promote the welfare of the country by asserting our legal rights by legitimate means", ... "to apply for any amendment or reform either to the local government or to the authorities in England". স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক। প্রায় মাস দেড়েক কালের মধ্যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হওয়ায় 'জাতীয় সভা' (National Association) তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে নতুন নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করেছে। শিশিরকুমার ঘোষের **ইণ্ডিয়ান লীগ** (Indian League) ১৮৭৫-এর সেপ্টেম্বর ২৫-এ জন্মলাভ করে। তখনকার দিনের পক্ষে এ-প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত প্রগতিশীল বলে মনে হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এটি অধিককাল স্থায়ী হয়নি।

এর অত্যল্পকালের মধ্যেই এক শক্তিশালী সংগঠন **ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন** (Indian Association) [ভারত সভা] গড়ে ওঠে, ইণ্ডিয়ান লীগের বাছাই সভ্যদের সহযোগিতায়। জন্ম ১৮৭৬, জুলাই ২৬-এ। বলিষ্ঠ জনমত গঠন, ভারতীয় সকল জাতি ও বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর মিলনের দ্বারা একই ভাবে ভাবিত ও দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে ঐক্যস্থাপন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন এবং জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার—এই ছিল "এ্যাসোসিয়েশনের" লক্ষ্য।

এমন সময়ে এসে পড়লো 'ইলবার্ট বিল' অর্থাৎ ১৮৪৯-তে বেথুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বড়লাটের কাউন্সিলের আইন-সভ্য ইলবার্ট (Courtney Ilbert) আর একবার বিচার-ক্ষেত্রে "ধলা" অপরাধীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কিছুটা খর্ব্ব করার চেষ্টা করেন ১৮৮২ ফেব্রুয়ারী ২-রা। সকল শ্রেণীর সকল স্তরের শ্বেতাঙ্গ দল প্রবল বিরোধিতা করে এবং তারা সফলকাম হয়। ১৮৮৩ জানুয়ারী ২৮-এ যে আকারে আইন পাশ হয়, সেটা ইলবার্টের মূল বিলের কঙ্কাল মাত্র। এখানে ইংরেজের সঙ্ঘশক্তি বাঙ্গালীর জীবনে নবচেতনা এনে দিয়েছিল। তাদের গঠিত প্রতিরোধ-সমিতি (Defence Committee) এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি থেকে বাঙ্গালী বুঝলে যে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

কার্য্যক্রমের সূচনায় শিক্ষিত চিন্তাশীল বাঙ্গালী ১৮৮৩ জুলাই ১৭-ই দশ সহস্র লোকের এক বিরাট সভায় জাতীয় ভাণ্ডার সৃষ্টির প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই বৎসরের শেষের দিকে, ডিসেম্বর ২৮, ২৯ ও ৩০ কলিকাতায় **জাতীয় সম্মেলন** (National Conference) অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সভার সভাপতি আনন্দমোহন বসু বলেছিলেন যে, জাতীয় পার্লামেণ্ট গঠিত হবার এটি প্রথম পদক্ষেপ ("it was the first stage towards a National Parliament")। মোটের ওপর, এই অধিবেশন জাতীয় মহাসভা (National Congress) স্থাপিত হবার পূর্ব্বাভাষ বলে গৃহীত হয়ে থাকে।

১৮৮৩-র পর ন্যাশানাল কনফারেন্স-এর দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৪-তে (ডিসেম্বর ২৫, ২৬, ২৭) পুনরায় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের বিশেষত্ব যে, পূর্ব্বে যে-সকল প্রতিষ্ঠান, যথা—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং কেন্দ্রীয় মুশ্লিম সভা (Central Mahomedan Association)—যারা পূর্ব্ব সম্মেলনে কোনও অংশ গ্রহণ করেনি, তারা হ'ল আহ্বায়ক। ভারতের নানা অঞ্চল হতে প্রতিনিধি এসে যোগদান করেছিলেন।

এদিকে যখন জাতীয়তার ভাব গ্রহণ করে একটা সম্মিলিত সভা (১৮৮৫) চলছে, তখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে চঞ্চলতা বিস্তারলাভ করতে দেখা যায়। যে সময় কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন চলছে (২৫, ২৬ ও ২৭-এ ডিসেম্বর) তখন বোম্বাই শহরে (২৮, ২৯ ও ৩০-এ ডিসেম্বর) ভারতের শান্তশিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল।

সতেরোটি শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ দাসের প্রাসাদে মিলিত হয়েছিলেন ১৮৮৪ ডিসেম্বরে। পরবৎসরই মার্চ্চ মাসে স্থির হয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধি আহ্বান করে একটি বড়-গোছের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই মতে, ১৮৮৫ (ডিসেম্বর ২৮-এ) গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হল্-এ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee)-এর সভাপতিত্বে **জাতীয় মহাসভা** (Indian National Congress)-র অধিবেশন চলে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করা পর্য্যন্ত এই কংগ্রেসই সকল আন্দোলনের উৎস সৃষ্টি করেছে, শক্তি যোজনা করেছে।

ভাঙ্গা-গড়া

ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কংগ্রেস পর্য্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের কাহিনী আগেই শেষ করতে হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে সিপাহী-সংগ্রাম, নীল-বিদ্রোহ আর স্বদেশী মেলা। এসকলের যথাযোগ্য পরিচয় এখানে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হ'ল।

সিপাহী-বিদ্রোহ (১৮৫৭)

সিপাহী-বিদ্রোহ একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। নানা ক্ষেত্রের নানা স্তরের এবং রূপের অনাচার সঞ্চিত হয়ে অসন্তোষ বিরাট আকার ধারণ করে ফেটে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অংশে মাঝে মাঝে সিপাহীদের ছোট-বড় অভ্যুত্থান নানা সামরিক ছাউনিতে ঘটেছে, সে-সকলের গুরুত্ব এতখানি ছিল না। কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী, ফারাজি ইত্যাদি মিলে অবস্থা খুব শান্ত হতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ধীরে ধীরে কায়েম হয়ে বসেছে এবং পরবর্ত্তী শত বৎসরের মধ্যে এমন দৃঢ় শিকড় গেড়েছিল যে, তাকে আর সম্পূর্ণ বিতাড়ন সম্ভব হচ্ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ জুন ২৩-এ, আর সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বারাকপুরে রাইফেলের গুলি ছুটিয়েছিলেন ১৮৫৭ মার্চ্চ ২৯-এ। ফলে পাণ্ডেজীর ফাঁসি হয়ে যায় এপ্রিল ৮-ই। এই স্ফুলিঙ্গ উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় আগুন ছড়িয়ে দেয়। সেনা-ছাউনির মধ্যে যে ধূমায়িত অসন্তোষ ছিল, সেটা দাবাগ্নিতে পরিণত হ'ল। বহরমপুর, মীরাট, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বুন্দেলখণ্ড, পেশোয়ার, ফরাক্কাবাদ, আরা, রঁাচি, লোহারডাগা, সম্বলপুর, পালামৌ প্রভৃতি স্থানে গুরুতর বিক্ষোভ হতে থাকে এবং ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে বহু যুযুৎসু ও নিরীহ লোক হতাহত হয়। স্থানে স্থানে দারুণ নৃশংস ও বীভৎস কাণ্ড ঘটেছে। এমন সময় গিয়েছে যখন মনে হয়েছিল হয়ত বিদ্রোহীরা জয়লাভ করবে। তবে এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ভারতের শাসনযন্ত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়েছে। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা ১৮৫৮ নভেম্বর ১-লা ভারতের কোন কোনও দাবী. আংশিকভাবে মিটিয়েছে। "কোম্পানী"র হাত থেকে ভারতশাসন সাক্ষাৎ ইংলণ্ডের হাতে চলে গেল। একজন ভারত-সচিব (Secretary of State) নিযুক্ত হলেন এবং তাঁকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে (Cabinet) গ্রহণ করা হ'ল। লাট-বাহাদুর (Governor-

General)-এর সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি (Viceroy) বলে পদ (খেতাব) সংযোজিত হ'ল।

সিপাহী-সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের একটা বড় অংশের বিশেষ যোগ ছিল না। এ সময়ে বাঙ্গলার সাধারণ জীবনযাত্রা বড়রকম কিছু ব্যাহত হয়নি। সাহিত্য অবলম্বন করে জাতীয় ভাবধারা প্রচার বিরাট তাণ্ডবের আগে যেমন চলছিল, সেটা অব্যাহত রইল। উপরন্তু ভারতীয়ের পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয় ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবার সাহস সাহিত্যে কিছু শক্তি যোজনা করল।

নীল-বিদ্রোহ

নীল-চাষের শুরু থেকেই কিছু কিছু গোলমাল চলেছে। এবার বাধলো ১৮৫৯-তে, আর চলে তিন বৎসরের উপর প্রায় ১৮৬২ পর্য্যন্ত। ব্যাপারের গুরুত্ব হিসাবে এ-সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গালীর জীবনে নীল-চাষ একটি কুখ্যাত অধ্যায়। দাদন দিয়ে, সময় সময় বিনা দাদনে চাষ করতে বাধ্য করা, শ্বেতাঙ্গ-সহায়তায় বিচারের প্রহসন, ছল-ছুতা অবলম্বনে নানারূপ নির্য্যাতন, দলবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন, লাঠিয়ালের সাহায্যে লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, রাহাজানি, জাল-জালিয়াতি, পেয়াদা-বরকন্দাজের জবরদস্তি, চামড়ার চাবুক ('ছট্‌কি') অথবা চামড়া-বাঁধানো মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার, নারীর শ্লীলতাহানি, চাষের বলদ অপহরণ, অনাহারে (হয়ত বিনা জলে) বন্দী করে রাখা, হত্যা প্রভৃতি, অর্থাৎ এক কথায়, উর্ব্বর মস্তিষ্কে যতরকম অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়নের ফন্দী আবিষ্কার সম্ভব, সবই অসহায় নিরস্ত্র রায়তদের উপর একক বা সমষ্টিভাবে প্রযুক্ত হ'ত। একবার চুক্তিবদ্ধ করে নিতে পারলে আমরণ আর মুক্তি ছিল না; দাদনের মেয়াদ কখনও শেষ হ'ত না। অগ্রিম-দেওয়া ঋণ পরিশোধ হবার লক্ষণ ছিল না। ধানচাষের ভাল জমি নজরে পড়লে (আর, এ সংবাদ কুঠীতে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব ছিল না) নীলকরদের লোক এসে জোর করে চিহ্নিত করে দিয়ে যেত—সেখানে এ-বছর নীল চাষ হবে, ধান নয়।

অত্যাচারের কাহিনী যখন আর উপেক্ষা করা চলে না, তখন নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের কানে কিছু জল প্রবেশ করেছিল। রায়তদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করবার জন্যে ১৮৫৯ ফেব্রুয়ারী ২০-এ সরকারী নির্দ্দেশ বেরিয়েছিল যে, কারও অমতে অনিচ্ছায় দাদন গছিয়ে দেওয়া, আর মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষেতে নীল চাষ করা চলবে না।

এ-সংবাদ প্রচারিত হবার পরও নীলকররা তাদের পূর্ব্ব-প্রচারিত পন্থা ছাড়েনি। স্থানে স্থানে সরকারী আদেশ উপেক্ষিত হয়েছে, কারণ বিচারের আসনে

শ্বেতাঙ্গ হাকিমরা অধিষ্ঠিত। আইনের ফাঁক খুঁজে বার করা কঠিন নয়; পক্ষীয় উকিল মোক্তার ত আছেনই, আরও আছে হাকিমী ব্যাখ্যা। এসকল থাকা সত্ত্বেও এতাবৎ নির্য্যাতিত রায়তদের মধ্যে প্রতিবাদের যে রোল উঠেছে, ক্রমে ক্রমে সেটা শক্তিসঞ্চয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদেশী হাকিমের হাতে রায়ত নীলকরদের মামলার ভার,—কালা মুন্সেফ বা জজ দেওয়ানী আদালতে শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে পারতেন না; যদি কোনও হাকিম রায়তদের পক্ষে একটু "দুর্ব্বলতা" প্রকাশ করতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নীলকররা সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ পেশ করলেই এ-শ্রেণীর হাকিমকে বদ্‌লি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে, কোনও হাকিম নীলকরদের বিরাগভাজন হতে সাহস করতেন না। মেকলে (Thomas Babington Macaulay) ১৮৩৬-এর একাদশ আইন (Act XI of 1836)-বলে দেওয়ানী মামলায় সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের সুযোগ বন্ধ করে দেন। এতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের প্রথম দফা অসুবিধা দেখা দেয়।

আরও কিছু আনুষঙ্গিক ঘটনা নীল-চাষীদের মনে সাহস জুগিয়েছিল। ফরাজি (মুশ্লিম) আন্দোলন (১৮৩০-১৮৪০) মাঝে মাঝে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এদের দ্বারা হিন্দু জমিদার আর বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি সমভাবেই লুণ্ঠিত হয়েছে। ১৮৫৯ নাগাদ আন্দোলন কতকটা দমিত হয়ে আসে। ফরাজিদের মধ্যে অনেকেই লাঠি, সড়কি এবং অন্যান্য অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার মনোবল। এদের অনেকেই রায়তদের দলভুক্ত হওয়ায় নীল-বিদ্রোহ বিশেষ শক্তি লাভ করে।

১৮৫৫-৫৭-র সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৫৮-র সিপাহী-বিদ্রোহ এবং স্থানে স্থানে ভারতীয়দের বীরত্ব-কাহিনী রায়তদের মনে শক্তিদান করেছে।

হ্যালিডে (Frederick Halliday) ১৮৫৩-তে বাঙ্গলার ছোটলাট নিযুক্ত হন। তাঁর কাছে নদীয়ার রায়তদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত বহু সহস্র লোক স্বাক্ষরযুক্ত করে এক আবেদন পেশ করেন। কিন্তু 'কাল্পনিক' আখ্যা দিয়ে হ্যালিডে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে ছেড়ে দেন। যতটা দরখাস্তে লেখা ছিল, প্রকৃত অবস্থা তার চেয়ে তখনই অনেক খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে আপদ দূর করার চেষ্টা এটাই যে প্রথম, সে-কথা বললে খুব ভুল হয় না। চাষীদের সৌভাগ্যবশতঃ গ্রাণ্ট (Peter Grant) এই সময় বাঙ্গলার ভাগ্যনিয়ন্তারূপে আবির্ভূত হলেন। তখন থেকেই "জমানা বদল"-এর লক্ষণ পাওয়া গেল। হাঙ্গামার প্রধান কেন্দ্র বারাসতে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন ইডেন (Ashley Eden)। তিনি পূর্ব্বের সরকারী আজ্ঞা আরও পরিস্ফুট করে প্রকাশ করেন। জমি রায়তের, তারা যে-ফসল ইচ্ছা উৎপাদন করবে, জোর করে কেউ তাতে অন্য চাষ করতে বাধ্য করতে পারবে না। ("Since the ryots can sow in their

own land whatever crop they like, no one can without their consent and by violence sow any other crops.") তার পর ম্যাঙ্গল্‌স্‌ (J. H. Mangles) এসে প্রকাশ্যভাবেই রায়তদের মতের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যোগাযোগের ফলে রায়তরা কতকটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে।

বড় রকমের গোলমাল আরম্ভ হ'ল ১৮৫৯-এর শরৎকালে। শীঘ্রই সে-আন্দোলন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়লো। কোনও কোনও জমিদার রায়তদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নড়াইলের বড়-তরফের রামরতন রায় এবং তাঁর নদীয়া জমিদারীর নায়েব মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাণাঘাটের শ্রীগোপাল পালচৌধুরী ও তাঁর ভাই শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গী ছিলেন নবীন বিশ্বাস। আরও অনেকে ছিলেন; সব নাম দেওয়া সম্ভব নয়।

নদীয়া আওরাঙ্গাবাদ কুঠীর সাহেব মালিকদের সঙ্গে রায়তদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধে। নীলকরদের পক্ষ থেকে কয়েকজন রায়তকে বলপূর্ব্বক আটক রাখা হয়। ১৮৬০ ফেব্রুয়ারী ২৩-এ আওরাঙ্গাবাদে মরদ বিশ্বাস, সুহাস বিশ্বাস এবং কালাচাঁদ সাহার নেতৃত্বে (B. B. Kling : *The Blue Mutiny,* P. 92) কয়েক শত লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নীলকরদের কবল থেকে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্ত করে নিয়ে আসে। এইটিই সাধারণ লোকের পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে বড় ধরনের প্রকাশ্য 'সংগ্রাম'।

এখন থেকে শপথ নিয়ে নীল-চাষ বন্ধ করা, ঢাকের শব্দে ভিন্‌ ভিন্‌ গাঁ থেকে লাঠিয়াল জমায়েত করা, সাধারণ তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা প্রভৃতি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। পুলিশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে; আর রায়তরা নিজেদের ইচ্ছামত প্রতিরোধ আরম্ভ করে।

মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহ। সেখানেও মার্চ্চ ২০-এ রায়ত কর্ত্তৃক নীলকুঠী আক্রান্ত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। নদীয়া চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। প্রথমে তাঁরা লোক পাঠিয়ে দূর দূর গ্রামের প্রজাদের নীল-চাষ করতে নিষেধ করে পাঠান। গোবিন্দপুর গ্রামের একজন প্রজাও নীল-চাষ করতে সম্মত না হওয়ায় শেতাঙ্গ নীলকরের পক্ষে শতাধিক লাঠিয়াল, তন্মধ্যে কেউ বা হস্তিপৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে, ১৮৫৯ সেপ্টেম্বর ১৩-ই চাষীদের সায়েস্তা করতে হাজির হলেন। দিগম্বরের লাঠিয়ালদের দুর্দ্দান্ত প্রহারে আক্রমণকারী দল রণে ভঙ্গ দেয়। দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ লোকবল ছাড়া প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। বিদ্রোহ চালনা করতে গিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দিগম্বর দেহরক্ষা করতে বাধ্য হন।

জমিদার-রায়তদের সম্মিলিত সার্থক প্রতিরোধের কাহিনী যথেষ্ট পাওয়া

যায়। ক্রমে রায়তরা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে ওঠে এবং এক এক জন সাধারণ রায়তও হঠাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের "যুদ্ধাস্ত্রের" কথা এখন আজগুবি বলেই মনে হবে। রায়তপক্ষের লাঠিয়ালরা হঠাৎ একসঙ্গে জমায়েত হতে শিখে গেল। একটা সংগ্রামকে নমুনাস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যে-অস্ত্র চালনায় যিনি দক্ষ তিনি উপস্থিত। "Each specialising in the weapon it found most suitable—bow and arrow slings ("like David of old"), bricks, bale fruit, brass plates thrown horizontally (which does great executions), earthen pots thrown by women, lathis and finally the fiercest of all, a dozen men armed with spears". (*The Blue Mutiny*, p. 102)—তীরধনু, গুলতি, ইট, (কাঁচা) বেল, ধাতব থালা (সমতলভাবে ছুঁড়ে দিলে নিজ উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ সমর্থ), স্ত্রীলোকদের পরিত্যক্ত মাটির তৈজসপত্র, ডজন-খানেক ভয়ঙ্কর সড়কিধারী লোক লড়াই করে নীলকরদের বাহিনীকে পরাভূত করে।

দেশীয় সহানুভূতিসম্পন্ন লোক ছাড়া বিদেশী খৃষ্টীয় পাদ্রীরা প্রকাশ্য ভাবেই রায়তদের সমর্থন করেছেন। তাঁদের প্রেরিত ঘটনার বিবরণী পিয়ারীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' (Indian Field), আর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (Hindoo Patriot) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। তাঁদের মতামতের প্রতি শ্বেতাঙ্গ শাসকদলের কিছু আস্থা ছিল বলে জানা আছে।

নীলের উপদ্রব নিবারণকল্পে স্থানীয় আইনজীবীরা, বিশেষ করে কোনও কোনও মোক্তার নীলকরদের এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটদের কোপানলে পড়েছেন। কারও কারও হাজতবাসও ঘটেছে। অপরদিকে তাঁদের প্রেরিত ঘটনার বিবরণী কলিকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে প্রতিপত্তিশালী লোকদের সহানুভূতির উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচার নিরাকরণ প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০ মার্চ্চ পর্য্যন্ত নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ করা যায়নি। মার্চ্চ ২৪-এ বড়লাটের আইনসভার এক নির্দ্দেশমতে সমস্ত ব্যাপারের তদন্তের জন্য এক কমিশন গঠন করার কথা ওঠে এবং ১৮৬০ এপ্রিল ৯-ই তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিশন কার্য্যারম্ভ করে ১৮-ই মে। ১৮৬০ নভেম্বরে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নীলকদের অনাচার সম্বন্ধে যে-সকল কাহিনী মুখে মুখে চলে আসছিল এবং যার অনেকখানি "কাল্পনিক" ও অবিশ্বাস্য বলে পরিত্যক্ত হচ্ছিল, তার সমস্তই সমর্থিত হয়। গ্রাণ্টের সুপারিশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারত-সচিব কর্তৃক গৃহীত হয়। কুখ্যাত নীল-চাষ এই আঘাতেই মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। পরে জার্ম্মানীতে যৌগিক নীল আবিষ্কৃত হলে ভারতীয় নীল-চাষ প্রায় অবান্তর হয়ে যায়।

'নীলদর্পণ'

নীল-বিদ্রোহ প্রসঙ্গ ত্যাগ করবার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের প্রকাশ (১৮৬০)। যখন নীল আন্দোলন চরম অবস্থায় উঠেছে, ঠিক সেই সময় প্রকৃত ঘটনার নিখুঁত চিত্রাঙ্কন দ্বারা এখানি লোকের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। লিখিত ছড়া লোকের মুখে মুখে চলেছিল। তার পর যখন ১৮৭১ ডিসেম্বর ১১-ই নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়, তখন চোখের সামনে অত্যাচারের রূপ দেখে লোক উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে এবং নীলকর সাহেবদের ওপর মন তিক্ত বিষাক্ত হয়। ইংরেজজাতি, নীলকর, ম্যাজিস্ট্রেট ও সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের ওপর বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করতে নীলদর্পণ-এর দান অসীম।

নীলের বা নীলদর্পণের জের আর এক অধ্যায়ে টানা হয়েছিল। বইখানির ইংরেজি অনুবাদ করে দেন (১৮৬১) মধুসূদন এবং পাদ্রী লঙ (James Long, 1814-1887) হলেন প্রকাশক। মানহানিকর ও মিথ্যা প্রচারের অভিযোগে লঙের নামে ১৮৬১ জুলাই ১৯-এ নালিশ রুজু করা হয় নীলকরদের পক্ষ থেকে। বিচারে আগষ্ট ২৬-এ লঙের এক মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ সে-টাকা তৎক্ষণাৎ কোর্টে জমা দেন। কিন্তু এই-সূত্রে বইখানির খুব প্রচার হয়ে যায়, অনুপাতে শিক্ষিত মহলে ইংরেজ জাতের ওপর বিরূপ মনোভাব তীব্রতর হয়ে উঠে। এ বইয়ের শিক্ষাও স্বদেশী যুগে ভাল করে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং প্রথমতঃ এর অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। বইখানি "নিষিদ্ধ" পুস্তকের তালিকায় স্থান না পেলেও সবরকমে এর প্রচার বন্ধ হয়েছিল। সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ীর তল্লাসীতে বইখানি পেলেই পুলিশ নিয়ে যেত, যেমন হয়েছিল গীতা, আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থের দুরবস্থা।

নীলদর্পণের আরও এক অধ্যায় বাকী রয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই ওয়েল্‌স্‌ (Mordaunt Wells) ১৮৫৯ আগষ্ট ২৪-এ এক রায়ে সমস্ত বাঙ্গালী জাতকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াৎ, শঠ প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেন। তখন উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ হয়নি। লঙের মামলায় ওয়েল্‌স্‌ যেদিন রায় দেন, অর্থাৎ তাঁর উক্তির দু'বৎসর বাদে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজার রাজবাটীর নাটমন্দিরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির পক্ষে একটা সমস্ত জাতকে অশালীন উক্তি দ্বারা হেয় করতে চেষ্টা করা যে অত্যন্ত গর্হিত, সে বিষয় অতি কঠোর ও তীব্র ভাষায় উল্লেখ করা হয়। লঙ মামলার রায় অন্যরূপ হলে এ-সভার আয়োজন হ'ত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে-সময়কার বাঙ্গালীর পক্ষে এক অসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রায় বিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ-লিপি ভারত-সচিব (Charles

Wood)-কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, জজসাহেব বিশেষভাবে ভৎ'সিত হন (P. N. Singh Roy : *Chronicles of the British Indian Association*, p. 32)

শেষ অধ্যায়টিকে করুণ বলাও চলতে পারে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এক নীলকর সাহেবের নৈতিক চরিত্র নিয়ে এক তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হরিশ মুখার্জির নামে ১৮৬০-এ মানহানির মোকদ্দমা রুজু হ'ল। মামলা চলছে,—ইতিমধ্যে ১৮৬১ জুন ১৪-ই হরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাতেও নীলকরদের আক্রোশ শান্ত হয়নি। তাঁরা চাইছিলেন পত্রিকাখানি একেবারে বন্ধ হোক। মামলার রায়ে হরিশচন্দ্রের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। অতি দুরবস্থার মধ্যে তাঁর পত্নী কষ্টেসৃষ্টে সে-টাকা পরিশোধ করে মুক্তি পান।

চৈত্রমেলা

কেবল মৌখিক প্রতিবাদ নয়। চিন্তাশীল লোক ক্রমে গঠনমূলক কাজের দিকেও মন দিতে থাকেন। ইংরেজকে উদ্দেশ করে কুকথা বললেই জাত বড় হবে না; তাদের সদ্‌গুণ চিন্তা করে নিজেদের মধ্যে তাকে আয়ত্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়া নিয়ে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার আবির্ভাব। সমসাময়িক কালে এবং হয়ত অনেক পরেও, চৈত্রমেলার যে অবদান, তার তুলনা খুঁজে বার করা কঠিন।

ইংরেজের প্রভাব প্রবল বন্যার মত অতীত গৌরব, সাহিত্য, কৃষ্টি সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আর তার মধ্যে যে কয়জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে ঋষি রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। ১৮৬১-র আগে নানা দিক থেকে জাতীয় সম্বিৎ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা যে হয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই, কিন্তু একটি লক্ষ্য নিয়ে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সঙ্কল্প যিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর দূরদর্শিতার কথা ভেবে আজ বিস্মিত হতে হয়।

ইংরেজ শাসনের মোহ অনেককেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পরনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষিতা জাতির মজ্জায় বাসা গড়ে তুলছিল। অপরদিকে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিজেদের বহু করণীয় আছে, সে চিন্তাও মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করেছিল।

ঐ বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। মেদিনীপুরে থাকাকালীন ১৮৬১-তে তিনি জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা সঞ্চারিণী সভার পত্তন করেন। স্বাস্থ্য, ভাষা, সাহিত্য, বাক্য ও পত্রালাপ, সঙ্গীত, আলোচনা, বক্তৃতা, বেশভূষা, আদব-কায়দা প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ভারতীয় আচরণের গৌরব বৃদ্ধি করাই এ-প্রতিষ্ঠানের

মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী নানা প্রভাব জাতিকে আত্মভোলা করে ছাড়ছে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

এই সভা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ১৮৬৬-তে জাতীয় কর্ম্মবিধি বা কর্ম্মসূচী (National Programme) প্রণয়ন করেন। যে-সকল কার্য্যকারণ জাতির গৌরবের বিষয় ছিল এবং যে-সকল নতুন কার্য্যকলাপ দেশপ্রীতির সঙ্গে জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে, তিনি সে-সকল বিষয়েরই উল্লেখ করেন। তাঁর 'জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভা'র পক্ষে আচরিত কর্ম্মতালিকার সঙ্গে নানাবিধ ব্যায়াম, কুস্তি, ঘোড়া-চড়া, নৌকাচালনা, জিমনাষ্টিক প্রভৃতি যুড়ে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের পরামর্শ দেন।

১৮৬৬-তেই তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনকল্পী সমিতি (Society for the Promotion of National Feeling amongst the educated Natives of Bengal) গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের সর্ব্বরকমে, এমনকি কথিত ভাষার মধ্যেও "বাঙ্গালিত্ব" বজায় রাখবার নীতি গৃহীত হয়।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪) হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলার প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৬৭ এপ্রিল ১২-ই (চৈত্রসংক্রান্তি) মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। শুরু থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯) প্রভৃতি উৎসাহশীল হয়ে পড়েন। প্রথম অধিবেশনের সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।

মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনটি নানা কারণে স্মরণীয় হযে আছে। সভার সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, খোস-গল্প করবার জন্য এটা সাধারণ মিলন নয়, এই সভা "স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য"। পরের শাসনে থেকে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত লজ্জাজনক হীন অবস্থা ; আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য জাতিকে কৃতসঙ্কল্প হতে হবে।

এই অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথের দেশানুরাগরঞ্জিত, ভারতের মহামহীয়ান অতীতের স্তবগীতি, তাঁর "মিলে সব ভারত-সন্তান" সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী, ব্যায়াম প্রতিযোগিতা, জিমনাষ্টিক, দেশীয় ক্রীড়া, লাঠিচালনা, ঘোড়া-চড়া, নৌকা-প্রতিযোগিতা, পাইকের খেলা, বাঁশবাজী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো। কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত গায়ক, শিকারী, দক্ষ শিল্পী প্রভৃতিকে পুরস্কারদানে সম্মানিত করা হ'ত।

এই (দ্বিতীয়) অধিবেশনে মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-৯৬) বলেছিলেন যে তাঁরা সেখানে "ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছেন"। সে বীজ থেকে যে

"মনোহর বৃক্ষ" উৎপন্ন হবে, তাতে "জাতি-গৌরব-রূপ পত্রাবলী"র জন্ম সংঘটিত হবে এবং "সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত" হবে। তা থেকে যে ফল প্রসূত হবে, "অপর দেশের লোকেরা তাকে 'স্বাধীনতা নামে' পরিচয় দেয়"। (যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ জাতীয়তার নবমন্ত্র, ১৩৫২, পৃঃ ১৩৪)

প্রায় পনেরো বৎসর চলবার পর "মেলা" বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা জাতীয় ভাবের গঠনমূলক দিকটা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তার ফলও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এ-সময় নবগোপাল 'ন্যাশনাল পেপার' নামে এক পত্রিকাও বার করেছিলেন। ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা আলোচনা করতে গেলে রাজনারায়ণ, নবগোপাল, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রভৃতি মনীষীদের কথা স্বতঃই স্মরণে আসে।

সাহিত্যের অবদান

জাতীয় ভাবের রাজ্যে বিরাট বিপ্লবের সঙ্গে সাহিত্যের নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যে-সকল দিক্‌পালের উদ্ভব হয়েছিল, তাঁদের নাম থেকেই বোঝা যায়, কত গভীর মননশীল শক্তিমান লেখক একই সময়ে এসেছিলেন এবং কি-ভাবে বাঙ্গালীর প্রাণে নব চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারায় বাঙ্গলা সাহিত্য নব প্রেরণা পেয়ে নব কলেবর ধারণ করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) নিজে কবিতা এবং প্রবন্ধর ভিতর দিয়ে কেবল দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসতে শেখালেন না, একদল "শিষ্য" তৈরী করে গেলেন যাঁরা গুরুর সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। এঁদের প্রথম হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) যে সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

এ যুগের অন্যান্য সাহিত্যের কিছু উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)-র 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)-র 'শিবাজী চরিত্র' (১৮৬০), মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) প্রথম স্তরে স্থানলাভ করেছে।

একটু কালের ব্যবধানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)-এর "মিলে সব ভারত-সন্তান" রচিত হয়, চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) 'ভারতসঙ্গীত' (১৮৭০) লিখে দেশকে যে ডাক দিলেন, ১৯০৭ সালের পূর্ব্বে সাহিত্যে সংগ্রামের জন্য সে-প্রস্তুতির উদাত্ত আহ্বান আর আসেনি। মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) অননুকরণীয় সঙ্গীত "দিনের দিন সবে দীন" আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) 'পুরুবিক্রম' লেখেন

১৮৭৪-তে। অপর কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম এই তালিকায় স্থানলাভ করবার যোগ্য। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫) আর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)-এর 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)-এর ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবন-বৃত্তান্ত (১৮৮০ ও ১৮৯০), গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) রচিত 'ভারত বিলাপ' (১৮৮১), আর সকলের শিরোমণি বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৬-১৮৯৪) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রেখেছে।

এসকলের পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের গ্রন্থাদি আগের তুলনায় কিছু নিম্নস্থান অধিকার করে।

জনসাধারণের মধ্যে সমকালে এসকল সাহিত্য বিশেষ উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ তখনও জমি ঠিক তৈরী ছিল না। "স্বদেশী যুগ" যখন এসে গেল, তখন ঐসব পুরাতন সাহিত্য (গীতা-সমেত) নূতন অর্থ, নূতন প্রেরণা জুগিয়েছে, আর বাঙ্গলা সশস্ত্র-বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়ে চলেছে।

নব অভিযান

সংবাদপত্র

সিপাহী-সংগ্রামকে ধরে, তার পূর্ব্ব ও পরের যুগের মধ্যে কোনো ব্যবধান টানা যায় না, কারণ পরের যুগ পূর্ব্বেরই জের টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের গতি ও শক্তি দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে; অন্যান্য যে-সকল ঘটনাপরম্পরা তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে, তারও কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।

এসকলের যোগসূত্র রেখেছে পত্র-পত্রিকা। প্রথম বা আদি যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ-সময়কার নূতন পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এদের সুর থেকে বোঝা যাবে আন্দোলন কোন্ পথ ধরবার জন্যে এগিয়ে চলেছে।

১৮৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ'-এর আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। স্বাধীন মতবাদ প্রচারে সে-যুগে এ-পত্রিকার সমকক্ষ কেহ ছিল না। ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট পাশ হওয়ায় আত্মসম্মানসম্পন্ন সম্পাদক অন্ততঃ সাময়িকভাবে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

১৮৬১-তে কয়েকখানি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তন্মধ্যে প্রধান ছিল **ইণ্ডিয়ান মিরর** (Indian Mirror); প্রধান উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রারম্ভিক সম্পাদকদ্বয়ঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ। পরে কেশবচন্দ্র কিছুদিন পত্রিকার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৬২-তে গিরীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক **বেঙ্গলী** প্রকাশিত হয়। পরে সুরেন্দ্রনাথ একে ১৮৭৯-তে দৈনিকে পরিণত করেন এবং সেই সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ ও সুরাট কংগ্রেস বিরোধ পর্য্যন্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ জনমতের প্রধান বাহক ছিল। ১৯০৬ সালে বরিশাল কন্‌ফারেন্স নিয়ে এ-পত্রিকায় যে-সকল উগ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার তুলনা মাত্র অপর দু'একটি পত্রিকায় পাওয়া গেছে।

অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৬৮-তে যশোর (যশোহর) থেকে শিশিরকুমার ঘোষ সপ্তাহে দু'সংখ্যায় বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৬৯-তে দ্বিভাষিক—বাঙ্গলা ও ইংরেজিতে পরিণত হয় এবং ১৮৭১-তে কলিকাতায় চলে আসে। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে রাতারাতি সম্পূর্ণ ইংরেজি এবং ১৮৯১ থেকে দৈনিকে পরিণত হয়। প্রগতিবাদী পত্রিকা হিসাবে 'অমৃত বাজার' বরাবর সুনাম রক্ষা করে চলেছে। মতিলালের সম্পাদনাকালে এবং 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোকে 'অমৃত বাজার'-কে সময়ে সময়ে

'বেঙ্গলী' অপেক্ষা বেশী সমাদর করতো। পরে 'বেঙ্গলী'র সুর একটু নরম হয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ও মতিলালের মধ্যে মতবিরোধ নিয়ে 'অমৃত বাজার' কেবল 'বেঙ্গলী' পত্রিকা নয়, সুরেন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে এবং সুধী পাঠক তা পড়ে মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাসিকপত্র **বঙ্গদর্শন** প্রকাশ করেন ১৮৭২-তে। মুখ্যতঃ এটি সাহিত্যপত্রিকা হলেও জাতীয় জাগরণ ও ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রচেষ্টায় 'বঙ্গদর্শন' অতি উচ্চ স্থান গ্রহণ করেছিল। পত্রিকার অর্থনৈতিক মতবাদ এ-দিনের পক্ষেও নতুন বলেই মনে হবে।

মাসিক **ভারতী** দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৭৭-এ আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় জাগরণের নানা কথা, জাতির সমস্যাবলী পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে এবং পরে 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' মন্ত্র যুবকগণের মনে বিদেশীয় ঔদ্ধত্যের 'দাওয়াই' বাৎলে, মনের দিক থেকে অবসাদের স্থলে সাহস উৎপাদন করেছে।

১৮৭৮-তে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত **আর্য্যদর্শন** স্বল্পকালস্থায়ী হলেও যুবকদের নিকট নতুন পথের সন্ধান বহন করে এনেছিল। বিশেষ করে ইউরোপের পরাধীন দেশগুলির নেতাদের জীবনদর্শন, কর্ম্মপদ্ধতি, ত্যাগ ও শৌর্য্যের কাহিনী প্রচার করে বাঙ্গালী পাঠককে চমকিত করে দেয়। তখন মনে হয়েছিল, চেষ্টা করে ভারতবাসীও নির্দ্দিষ্ট পথে চললে ঐ পরম পদ লাভ করতে পারে; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের কাছে অসাধ্য অলভ্য কোনও বস্তুই নেই। তাঁর প্রচারিত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মতবাদ দেশের চিরাচরিত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। পরে ১৮৮৩-তে কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক মিলে সাপ্তাহিক **সঞ্জীবনী** প্রকাশ করে সাধারণের মনে নূতন শক্তি যোজনা করেন।

অন্যান্য পত্রিকা ছিল অনেকগুলি। তার অধিকাংশই সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, সমালোচনা, বিবিধ রচনা প্রভৃতি নিয়ে লিপ্ত ছিল। তন্মধ্যে বাছাই কয়েকটির নাম এ-সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। শম্ভুনাথ মুখার্জ্জি পরিচালিত—**মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন** (Mukherji's Magazine), আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত **পরিদর্শক** ১৮৬১-তে জন্মলাভ করে। প্রথমটিতে যথেষ্ট রাজনীতির প্রসঙ্গও থাকত।

উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত **বামাবোধিনী পত্রিকা** (১৮৬৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নবগোপাল মিত্রর সহযোগিতায়)-এর **ন্যাশনাল পেপার** (১৮৬৫), ঢাকা থেকে প্রকাশিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **অবলা বান্ধব** (১৮৬৯), কেশবচন্দ্রের সাপ্তাহিক **সুলভ সমাচার** (১৮৭০) ও ঢাকার বঙ্গচন্দ্র রায়ের পাক্ষিক পত্রিকা **বঙ্গবন্ধু** এবং অতি উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্রিকা **সাধারণী** ১৮৭৩-তে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয়।

এর পর সম্পূর্ণ নতুন লক্ষ্য নিয়ে শ্রমিক-মজুরদের স্বার্থে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগর থেকে **ভারত শ্রমজীবী** নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ (১৮৭৪) করেন। এ দিয়ে যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ভবিষ্যৎ দিনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক **সমালোচক** ও পাক্ষিক **তত্ত্ব-কৌমুদী,** প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের **পরিচারিকা**, কালীনাথ দত্তর **ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন,** ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চানন্দ' ও বীরভূম থেকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'দিবাকর' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮-তে।

বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্ট থেকে সাপ্তাহিক **পরিদর্শক** নিয়ে সংবাদপত্র-সেবায় অবতীর্ণ হন ১৮৮০-তে। পরবৎসর জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সাপ্তাহিক **বঙ্গবাসী** প্রকাশ করেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বসু তার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন।

ইংরেজি **Reis and Raiyat** (রইস ও রায়ত) রাজনীতি, ভূমি-ব্যবস্থা (review on politics, literature, society) প্রভৃতি ব্যাপারের আলোচনা নিয়ে ১৮৮২-তে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক এন. এন. ঘোষ ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সম্প্রীতির সমর্থক ছিলেন, সুতরাং তাঁর পত্রিকা **ইণ্ডিয়ান নেশান** (১৮৮৩) উঠ্‌তি রাজনীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি ; বরাবরই 'মডারেট' মত প্রচার করেছে। তা হলেও এতে ভারতীয় সমস্যার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়েছে। এই বৎসরই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক 'সময়' এবং দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'নব্য ভারত' প্রকাশলাভ করে।

কংগ্রেসের আবির্ভাব আসন্ন। তখন দুই মহারথী বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যথাক্রমে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' দেশকে দান করলেন। এরা 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধারণী'র স্থান গ্রহণ করতে পারেনি বটে, কিন্তু এতে সম্পাদক-যুগলের ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিস্ফুট ছিল।

অপরাপর বহু পত্রিকা, যাদের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না, সেগুলি বর্ত্তমান আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু উগ্র-রাজনীতি-সমর্থক পত্রিকা কয়েকটির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ১৮৯৭-তে ইংরেজি **ডন** (Dawn) পত্রিকা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে বলিষ্ঠ জাতীয়তার রেশ এবং ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথের রেখা এঁকে চলেছিল। 'ডন' পত্রিকার সাহায্যে সতীশচন্দ্রের নির্ভীক মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে বাঙ্গলার মনীষীদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইংরেজ-প্রভাবিত বিদেশী ধাঁচের শিক্ষার অনুপপত্তি দূর করা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। জ্ঞানে গুণে চরিত্রবত্তায় খাঁটি মানুষ তৈরী করা হ'ল সতীশচন্দ্রের লক্ষ্য। উষার উন্মেষ জাতির জীবনে গৌরবের মধ্যাহ্নদীপ্তি নিয়ে আসবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সুরেন্দ্রনাথ ও সহকর্ম্মিগণের

প্রভাব এখনও অতি উচ্চস্তর অধিকার করে আছে। 'বেঙ্গলী', 'অমৃত বাজার' প্রভৃতি পত্রিকার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি, সে-সময় 'ডন' স্বমহিমায় অবস্থিত হতে পেরেছিল, এটাই তার বিশেষ পরিচয়।

দক্ষিণ ভারতের তিনটি পত্রিকার বিষয় এখানে উল্লেখ না করলে আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গহানি হয়। **ইন্দুপ্রকাশ** নরম দলের পত্রিকা, কেবল অরবিন্দের প্রবন্ধ প্রকাশ করায় এর কথা বারে বারে উল্লেখ করতে হচ্ছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রে তিলকের মারাঠী সাপ্তাহিক **কেশরী** ও ইংরেজি সাপ্তাহিক **মারাঠা** ১৮৮১-তে এবং পুণা থেকে মারাঠী সাপ্তাহিক **কাল** ১৮৯৮-তে প্রকাশিত হয়ে দক্ষিণ ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচার সম্ভব করেছিল। এইসকল পত্রিকা এ-বিষয়ে বাঙ্গলার অগ্রদূত বলা যায়। শিবাজী মহারাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, জাতীয় (বিশেষ করে হিন্দু) ঐক্য স্থাপন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি লক্ষ্য স্থির করে দিতে তিলক ও পারাঞ্জপে যে আসন গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকালে অরবিন্দ-প্রমুখ মাত্র কয়েকজন সেখানে পৌঁছেছিলেন।

'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', (ইংরেজী) 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাত্রয়ী ভারতের বিপ্লবগগনে নবারুণ রেখা প্রকাশ করে গভীর অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্দ্দেশ করেছিল।

নব নেতৃত্ব

নীল-বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনা আর স্বদেশী (চৈত্র-) মেলা যেটুকু নাড়া দেবার তা দিয়েছিল এবং তার কাজও হতে লাগলো। এর পর নতুন পর্য্যায় এসে গেল এবং সমসাময়িক অপর ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে প্রায় একজনকে অবলম্বন করে বিরোধ বেশ পাকিয়ে উঠলো। বাঙ্গালার রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় এক বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা।

সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ও বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৯-১৯১৬) আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্য একসঙ্গে ১৮৬৮ মার্চ্চ ৩-রা বিলাত রওনা হন এবং একই সঙ্গে ১৮৫৯-তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোল বাধলো সুরেন্দ্রনাথের পরীক্ষার বয়স নিয়ে। ফল বেরুবার পর কর্ত্তারা দেখলেন তাঁর বয়স পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সীমা থেকে সামান্য কিছু বেশী। বেশ কাঠ-খড় পুড়িয়ে মামলা করে সুরেন্দ্রনাথ জয়লাভ করেন এবং চাকরিতে নিযুক্ত হন। এ ঘটনার সংবাদ ভারতে পৌঁছুলে শিক্ষিতমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। একবাক্যে সকলেই বলেছিলেন যে ইহা একজন উঠ্‌তি বাঙ্গালীকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করার দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত অপকৌশল মাত্র।

তার পরের অধ্যায় ভারতের রাজনীতিতে বিপর্য্যয় ঘটাবার মাহেন্দ্রক্ষণ। সুরেন্দ্রনাথের চাকরি নিয়ে গোলমাল বাধলো। নিত্য-নৈমিত্তিক সই করার জন্য পেস্কার যে মামুলি কাগজপত্র দাখিল করে এবং হাকিম (Assistant Magistrate) হিসেবে কেবল দস্তখত করতে হয়, তারই একটা সূত্র ধরে চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ১৮৭৪-তে বিলাত থেকে পাকা খবর ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়।

দেশের পক্ষে সে এক মহা সুদিন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁকে পূর্ণভাবে পেয়ে দেশ যেন একেবারে মেতে উঠলো; একটা 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। চাকরি হারিয়ে তিনি একটু বিব্রত বোধ করলেন। কারণ তাঁর বিলাত-প্রবাসকালে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছে, আর এদিকে হয়েছে পিতৃবিয়োগ। সমস্ত পরিবার প্রতিপালনের ভার তাঁর ওপর পড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পেয়ে তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজের এক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী, বাচন-ভঙ্গী, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার কাহিনী বিবৃত করা ছাত্রমহলে তাঁকে অত্যন্ত সমাদৃত ও সম্মানিত করে তুললো। তা ছাড়া কলেজের বাইরের বক্তৃতা তাঁকে জনসাধারণের নিকট অতুলনীয় বাগ্মী এবং দেশপ্রেমিক বলে যশ এনে দিয়েছিল। সেকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাড়া অপর কেউ এ-গৌরব লাভ করেননি। রামগোপাল ঘোষ এ-খ্যাতি নিয়ে বহুদিন গত হয়েছেন (১৮৬৮); লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯) তখনও আসরে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হননি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ইংরেজ শাসনের দোষ-ত্রুটি এবং কূট অভিসন্ধি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরায় সুরেন্দ্রনাথ প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন দেশনায়ক বলে সমাদর অর্জ্জন করলেন— দেশবিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনাপতিদের পরিচয় দিয়ে যুবমন উদ্বেল করে তুলেছিলেন।

সমগ্র ভারতে ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে শিবাজীর স্বপ্ন সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ফুটে উঠেছিল। তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ এ-চিন্তা কার্য্যে পরিণত করার জন্যে এ-পথ অবলম্বন করেননি।

ভারতীয়দের আই-সি-এস পরীক্ষা থেকে বাদ দেবার জন্যে ভারত-সচিব (১৮৭৪) সল্‌সবেরী (Lord Salisbury), ১৮৭৬ ফেব্রুয়ারী ২৪-এ পরীক্ষার্থীর উচ্চতম বয়স একুশ থেকে নামিয়ে উনিশ করলেন, অর্থাৎ ভারতীয় বিদ্যা অর্জ্জন করে কঠিন আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য উনিশ বছর বয়সের মধ্যে বিলাত পৌঁছে পরীক্ষার হল্‌-এ স্থান গ্রহণ করতে হবে। এর প্রতিবাদে সর্ব্বভারতীয় মত গড়ে তোলার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ মে-জুন মাসে সারা উত্তর ভারতের বড় বড় সহরে বক্তৃতা দিলেন এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করলেন। তার পরবৎসর (১৮৭৮) সমগ্র দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা করে একটা বলিষ্ঠ

যোগসূত্র স্থাপন করলেন। এই ঘটনাই প্রথম, যখন সারা ভারতবর্ষে একবাক্যে দাবী উঠেছে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

ভারতের স্বার্থে আলোচিত বিষয়বস্তু তাঁর হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল ভাষায় উচ্চারিত হয়ে শ্রোতাকে যেন বন্যার স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত। অচিরকালের মধ্যে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে পরিগণিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে সমঝদার লোকে গ্রীক-বক্তা ডিমসথিনিস্ (খৃঃ পূঃ ৩৮৩)-এর সঙ্গে তুলনা করতেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ঘুরে বেড়াবার ফলে এই একটি নাম ভারতের শিক্ষিত, এমনকি সহরের আবহাওয়া থেকে দূরে অবস্থিত অশিক্ষিতদের মধ্যেও সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হ'ত।

বাকী যেটুকু ছিল, হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ মে ৫-ই থেকে জুলাই ৪-ঠা পর্য্যন্ত কারাবাস ষোলোকলা পূর্ণ করে দিল। কাছারিতে শালগ্রামশিলা নিয়ে হাজির করার হুকুমের বিরুদ্ধে 'বেঙ্গলী'র প্রবন্ধ এই মামলার কারণ। এ সংবাদে দেশীয় শিক্ষিত জনগণও বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। চারিদিকে সভা-সমিতিতে রায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নবিশেষ শান্তশিষ্ট ছাত্রমহলও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কয়েদীর মুক্তির দিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে, "অন্যে পরে কা কথা", (স্যার) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদলের নেতৃত্ব করেছিলেন, আর শত শত ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী। এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার তুলনা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ও অনুগামী কয়েকজন খ্যাতিমান বাঙ্গালী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানাক্ষেত্রে বিরাট কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। তাঁদের কথা কিছু না-বললে উগ্র জাতীয়ভাবের অভ্যুদয়ের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সুরেন্দ্রনাথের কিছু আগে এবং সঙ্গী হিসাবে যাঁরা সামনে এসে স্থান গ্রহণ করলেন, তাঁরা সঞ্চিত প্রতিবাদকে রূপদানের পটুয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলা চলে। সংবাদপত্র-পরিচালনা, সংবাদ-সরবরাহ, প্রতিবাদ-সভার আয়োজন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ, প্রজা-রায়ত অসহায় লোকের দুর্দ্দশা দূর করার পন্থা আবিষ্কার হ'ল লক্ষ্য। প্রতিবাদ-জ্ঞাপনের যে ধারা এতদিন চলছিল, সেটা এঁরা বেশী শক্তিশালী করে তুললেন।

জাতির আত্মসম্মান জ্ঞান তীক্ষ্ণ হয়েছে, নিরস্ত্র হাত লগুড় নিতে শিখছে; ইংরেজের "সিংহচর্ম্মের" আবরণ খসে পড়তে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিদেশীয়দের কুৎসা ও আক্রমণের যথোচিত প্রত্যুত্তরে স্তব্ধ করবার সকল উপায় অবলম্বিত হয়েছে। বিদেশী-পরিচালিত সংবাদ ও প্রচারপত্র নির্ব্বিবাদে বিদেশী শাসন সমর্থন ও ভারতীয়ের অযোগ্যতা দোষ-ত্রুটি প্রমাণ করছিল; এখন তারা প্রতি-আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়ে উঠছে। অহিতকারীরা আছে শৃঙ্খলার নামে যত

অনাচার অনুষ্ঠানের পরামর্শ দিতে ; সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী মন নির্য্যাতন আর ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে।

এ কাল বিদেশী শাসনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। যখন মন প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে উঠলো, তখন লক্ষ্যে পৌঁছুবার সূক্ষ্ম পথের বিচার আস্তে আস্তে অপসারিত হ'ল। এ যুগের অবসানই সশস্ত্র আক্রমণ ও প্রতিরোধের ধারার আত্মপ্রকাশ কাল।

পুঁথিপত্র, বক্তৃতা, লেখনী সাহায্যে যাঁরা নিরস্ত্র সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন সুরেন্দ্রনাথের আগে থেকেই, তার মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষের (১৮৪০-১৯১১) নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। সংবাদপত্র পরিচালনা, সংবাদপত্রে স্থানীয় ঘটনা, যথা—নীল-উপদ্রব-সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ, অত্যাচরিত দুর্ব্বলের সমিতি স্থাপন, ভারতীয় সংস্থা (Indian League) সৃষ্টি প্রভৃতি ছিল তাঁর সফল কর্ম্মসূচীর মধ্যে। ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর অনাচার তিনি লোকসমক্ষে তুলে ধরে দুষ্টের দমন করেছেন। ভক্তির পথে আত্মদর্শন ও আত্মনিবেদনে তিনি ছিলেন বৈষ্ণবপ্রধান। এসকল কারণে তিনি বাঙ্গলার রাজনীতি ও সমাজনীতিতে এক মহনীয় স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

সঙ্গে ছিলেন তাঁর "লক্ষ্মণ-ভাই" মতিলাল (১৮৪৭-১৯২২)। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি দাদাকে অতিক্রম করেছিলেন। ভারতের তদানীন্তন কালের তিন মহারথী তিলক-লাজপত-বিপিনচন্দ্র তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী। বাঙ্গলায় উগ্রমতাবলম্বী দলের মধ্যে তিনি ছিলেন কর্ণধার। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস, প্রাদেশিক কনফারেন্স, হোম-রুল লীগ (Home Rule League) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীভূত শক্তি।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) সাময়িকপত্র-পরিচালনায় নির্ভীক আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। অটল দেশপ্রেম এবং যোগ্যতা অর্জ্জন করতে না পারলে, স্বাধীনতা লাভ করলেও তাকে রক্ষা সম্ভব নয়,—এই ছিল তাঁর মত। জাতীয় ঐক্যের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং বলতেন, সে-অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আইনবিদ্ দুই মহারথী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee : ১৮৪৪-১৯০৬) ও রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নিজেদের পরিচয় রেখে গেছেন। জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র। রাসবিহারীর কর্ম্মক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। দারিদ্র্যের নাগপাশের মধ্যেই তিনি সরস্বতীকে তুষ্ট করেছিলেন ; কর্ম্মক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবী তাঁর ঝাঁপিখানি রাসবিহারীর হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তিলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন রাজনীতির বৃহস্পতি ; জাতীয় শিক্ষা, কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব, উদ্ধত লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রভৃতি ব্যাপারে রাসবিহারীর কথা স্মরণ করতেন বিজ্ঞরা। কংগ্রেসের সভাপতি (১৯০৭ ও

১৯০৮) হওয়া তাঁর কোনো বিশেষ পরিচয়ই নয়। দেশের শিল্পোন্নয়নে, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র বিস্তারে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী ; সিভিল রাইট্‌স্‌ কমিটি (Civil Rights Committee) পরিচালনায় তিনি হলেন পার্থসারথি। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে তিনি এ-যুগের দাতাকর্ণ ; কল্পনাতীত দানে তিনি সঙ্গী পেয়েছিলেন হাইকোর্টের অপর ব্যবহারজীবী তারকচন্দ্র পালিতকে (T. Palit : ১৮৩১-১৯১৪)। যখন কথাটা উঠে পড়েছে, তখন নিঃশব্দ ত্যাগের প্রতীক নরমপন্থীদের স্তম্ভস্বরূপ নীলরতন সরকারকে (১৮৬১-১৯৪৩) স্মরণ করা যুক্তিযুক্ত।

উকিল রাসবিহারীর সঙ্গে ছিলেন ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)। দেশ ও বিদেশে যাঁর বিদ্যার খ্যাতি প্রাতঃসূর্য্যমরীচিবৎ ভাস্বর, জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সে-যশ তদনুরূপ অম্লান। ধর্ম্মপ্রাণ, পূতচরিত্র, দৃঢ়চিত্ত, ধীর, স্বভাবে আচরণে বিনয়ের প্রতীক হলেন আনন্দমোহন। 'ভারত সভা' (Indian Association) স্থাপনে অন্যতম প্রধান ঋত্বিক্‌। বয়কট বা বিদেশী বর্জ্জন যজ্ঞের হোতা এবং "স্বদেশী" আন্দোলনের স্তম্ভরূপে বাঙ্গালীর অন্তরের তিনি দেবতা। কণ্ঠাগতপ্রাণ অবস্থায় তিনি চেয়ার-বাহিত হয়ে মিলন-মন্দির (Federation Hall)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়েছিলেন। এই সভাতেই সর্ব্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি দেশমাতৃকার কল্যাণ স্মরণ করতে করতে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

জন্মসাল ধরে বিচার করতে হলে, এঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথের অগ্রগামীর দল ; অনেককেই সমবয়স্ক বলাও চলে। রাজনীতিক্ষেত্রে সকলেই সহকর্ম্মী এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। তবে সুরেন্দ্রনাথের দীপ্তির পাশে পড়ে এঁদের জ্যোতি কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত আর সুরেন্দ্রনাথ জন্মেছেন একই সালে (১৮৪৭)। কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত থাকাকালে বরোদায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯০৯-তে। সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বাধীনচেতা রমেশচন্দ্র যা দেখিয়ে গেছেন, তার তুলনা বিরল। লেখনী তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে ছত্রে ছত্রে। অর্থনীতি, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, উপন্যাস, অনুবাদ, প্রবন্ধ প্রভৃতি সবই তাঁর স্পর্শ পেয়ে সজীব হয়ে উঠেছিল। লর্ড কার্জ্জনের মত ধুরন্ধরের সঙ্গে ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ নিয়ে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি। তিনিই বলেছিলেন, শাসনের রূপ পরিবর্তন আর অবাধ শোষণ বন্ধ না হলে সশস্ত্র বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারী হয়েও দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র আর রমেশচন্দ্র সরকারী ব্যবস্থার যে নগ্নরূপ প্রকাশ করে দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেন, তাতে তাঁদের দেশপ্রেম ও সৎসাহস প্রকট হয়ে উঠেছে।

যুগের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। মহাপুরুষদের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়েছে এবং ভারত-উদ্ধারের পথ সুগম করবার জন্য অনেকে একসঙ্গে এসেছেন ; এ যেন "মহাজ্ঞানী মহাজন"-দের মিছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬), প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) প্রভৃতি দেশ-মাতৃকার সুসন্তানদের পাওয়া যাবে।

তারপরই যে ভাবধারা আব কর্ম্মপদ্ধতি এসে পড়েছিল, সেইটাই অল্প-কালের মধ্যে বাঙ্গলার বুকে অগ্নিকণা ছড়িয়ে দিলে। অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) আর তাঁর উপযুক্ত চেলা সিষ্টার নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)-র আবির্ভাবে আকাশে বারুদের ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করে।

অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে থেকে লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল—সময়টা ১৮৯৩-৯৪—যখন অরবিন্দ 'ইন্দু প্রকাশ'-এ তাঁর মতামত দ্বারা জাতির গতিপথ নির্দ্দেশ করছিলেন।

বিবেকানন্দ

যখন দেশবরেণ্য নেতৃবর্গ জাতীয় চেতনার উদ্বোধন করছেন, তখন কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার আহ্বান এসে গেল এক অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত কেন্দ্র হতে। অরবিন্দ যখন 'ইন্দু প্রকাশ'-এ জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ১১-ই) সিকাগো ধর্ম্মমহাসম্মেলনে নিজ প্রতিভায়, ওজস্বিতায়, পাণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্বে, বাগ্মিতায় আমেরিকা তোলপাড় করে তুলছেন। অরবিন্দের প্রবন্ধাবলী মুষ্টিমেয় অতিশিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্যাপক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের কাল আবির্ভূত হতে তখনও অনেক বিলম্ব। স্বামীজি সে-ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন।

কিন্তু ঘটনাস্রোত অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। স্বামীজি হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করলেন আমেরিকায়, এবং পরে ইউরোপে। সঙ্গে-সঙ্গেই ভাবলেন যে-দেশে এই ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়েছে, সে-দেশ অতি গরীয়ান, অতি মহীয়ান ; কালের দোষে ধর্ম্মের নামে আচার-বিচার ও কুসংস্কারের বাঁধনে হিন্দুরা তাদের ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বনিয়াদ অতি দৃঢ় ; ভাঙ্গন ধরেছে উপরের কাঠামোতে। সুতরাং তার সংস্কার সাধন করে দিতে পারলে, অনন্তকাল হিন্দুধর্ম্ম মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে পারবে। একদিন মানুষের ধর্ম্মসমন্বয় ঘটবে, পরস্পরের বিবাদ-বিদ্বেষ দূর হবে।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে তিনি নানা দোষ-ত্রুটি দেখতে পান ; কিন্তু সে-সকল দেশের নরনারীর স্বাস্থ্য, কর্ম্মশক্তি, দৈহিক বল, আত্মবিশ্বাস, অজানার সন্ধানে বেরিয়ে আপদ-বিপদ উপেক্ষা করার ক্ষমতা, দেশের ও জাতির কল্যাণে স্বার্থত্যাগে উন্মুখতা প্রভৃতি গুণ তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর দেশবাসীর নিকট।

"অভীঃ" ঃ ভয় পরিত্যাগ করতে হবে, মনের বল থাকলে দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ; ভয়-ই ভারতবাসীর অগ্রগতির পক্ষে প্রধান অন্তরায়। দুর্ব্বল, ক্ষীণ, নিত্যরোগী, মানসিক দার্ঢ্যহীন মানুষ নিতান্ত জড়তুল্য। সমস্ত জাতিকে শক্তিশালী হতে হবে। গীতা-ভাগবত-চর্চ্চায়, কৃচ্ছ্রসাধনে দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হবে ; বিড়ম্বনাময় জীবনের বোঝা দুর্ব্বহ হবে। চাই শক্তি—কায়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—যার বলে আকাশচুম্বী পর্ব্বত ও সীমাহীন সাগরের বাধা তুচ্ছ হয়ে যাবে।

তাঁর সকল উপদেশের মূল কথা—নিজে "মানুষ" হও, অপরকে "মানুষ" কর। তবে নিজের মঙ্গল, দশের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল। ইতর, ভদ্র, অন্ত্যজ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, জাতি-বর্ণ-বয়স-নির্বিবশেষে সকলেই আমার 'ভাই'। ভারতের বনজঙ্গল, তৃণগুল্ম, নদ-নদী, গিরি-উপত্যকা, মরুভূমি-কান্তার সব মিলিয়ে ভারতভূমি। তার মাটী ভারতবাসীর স্বর্গ। কর্ম্ম করে যেতে হবে, মোক্ষ হবে উপেক্ষার বস্তু।

ব্যষ্টি সমষ্টি সমাজ প্রত্যেকের কল্যাণ বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক নরনারী পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকবে। এক দেশ অপর দেশের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না। দেশাত্মবোধে প্রত্যেকের অন্তর ভরে থাকবে। "পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা" প্রভৃতি দোষ উচ্চাধিকার-লাভের পরিপন্থী। "লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব।" প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন না করতে পারলে অনন্তকাল পরের দাস হয়ে থাকতে হবে।

স্বামীজি স্বয়ং ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। দেশীয় রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদেশী অস্ত্রনির্ম্মাতার নিকট হতে হাতিয়ার সংগ্রহ দ্বারা তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। এ কথা ভাবতেও আজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

তিনিই প্রথম মৃত্যুর আহ্বান জানিয়ে গেলেন ! সর্ব্বশক্তির আদিভূতা 'মা'কে পেতে হলে সুখ-সমৃদ্ধি—এমনকি জীবনকে তুচ্ছ করতে হবে। বললেন—

"Who dares misery love
And hugs the form of Death,
Dances in Destruction's dance
To him the Mother comes."

ইনিই "মৃত্যুরূপা মাতা" ; (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক) অনুবাদে দাঁড়াচ্ছে ঃ

"সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।"

বাঙ্গলার লুপ্ত শক্তি এই উদাত্ত আহ্বানে জেগে উঠেছিল। বিশ্ববরেণ্য সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মময় সন্ন্যাসীর বজ্রনির্ঘোষের কাছে সাধারণ বক্তৃতা, লিখিত প্রবন্ধ, আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রভৃতি ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়ে। আলস্যে জর্জ্জরিত, কর্ম্মবিমুখ জাতির মধ্যে চেতনার সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল। সত্যিই রম্যাঁ রল্যাঁ বলেছেন—"ধূমায়িত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি স্বামীজির শ্বাসের বায়ুতে প্রজ্বলিত শিখা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।" অরবিন্দ বলেছেন—"বিবেকানন্দ দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। দেশের পরাধীনতা তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দিত। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয়, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন।" আরও বলেন—"প্রত্যক্ষভাবে তিনি যে কাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে-কাজের ভার দিয়েছেন"।

মাত্র এক ব্যক্তি যে জাগরণ সম্ভব করেছিলেন, তা অপর অনেকের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকেও ম্লান করে দিয়েছে। রামমোহনের অভ্যুদয় থেকে যে গাঢ় অন্ধকার অপসৃত হতে থাকে, বিবেকানন্দ সেখানে নির্ম্মেঘ গগনে প্রভাতসূর্য্যের দীপ্তি এনে দিয়েছিলেন। বাঙ্গালী যেন নিজেকে নতুন করে গড়ে নিয়ে ভবিষ্যতের কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার প্রেরণা লাভ করেছিল। তিনি অরবিন্দের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

আলোড়ন

বঙ্গ-বিভাগ

ক্রমে দাঁড়ালো কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বৎসরে একবার মিলিত হতেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। তাতে উষ্মা ছিল না, গভর্ণমেণ্টও প্রথম প্রথম মনে করেছে এই সভার আলোচনার ভিতর দিয়ে ভারতীয়দের মনোভাব বুঝতে পারা যাবে। সুতরাং একেবারে গোড়ার দিকে কিছু উৎসাহ পাওয়া গেছে ঐ তরফ থেকে। পরে সুব একটু উচ্চ পর্য্যায়ে উঠলে গভর্ণমেণ্টের বিরূপতা দেখা দেয়। ভারতের স্বার্থের বিরোধী কার্য্যকলাপ এখন আর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না এবং কখনও কখনও সে-সকল বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র আলোচনা কংগ্রেসের অধিবেশনে ফুটে উঠলো।

এমন সময়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকটায়, দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের, বিশেষ করে বাঙ্গলার প্রতি শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। তার পরিচয় ভাল করে রেখে দেওয়া দরকার।

বাঙ্গলাদেশটিকে কেটে-ছেঁটে তার আয়তন কমাবাব চেষ্টা বহুদিন ধরে চলে আসছিল। যে কালে কথাটা উঠেছিল, তখনকার কারণ হিসাবে বলা হ'ত—একজন ছোটলাটের পক্ষে এতবড় বিরাট অঞ্চল—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম দেখাশোনা করার পক্ষে বড় অসুবিধা। কার্জ্জনী আমলে এ-যুক্তি তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হ'ল বড়লাটের দুষ্টবুদ্ধি, বাঙ্গালীকে জব্দ করতে হবে, তার প্রভাব ক্ষুন্ন করতে হবে,—হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করার মতলব যোগ হ'ল এই দুষ্টবুদ্ধির প্রসারে, আর তখন থেকে গোড়ার কথা ভুলে শেষের কারণটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কথাটা প্রথম ওঠে ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষকে উপলক্ষ করে। তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট বা ভারতসচিব নর্থকোট (Sir Stafford Northcote)-এর মনের কথা যে, রাজধানী (কলিকাতা) থেকে অত দূরে দুর্ভিক্ষের মত একটা দুর্দ্দৈব ঘটলে যথোচিত মনঃসংযোগ করা সম্ভব হয় না। যাই হোক, আলোচনা আর এর বেশী গড়ায়নি। কিন্তু সদ্য সদ্য কিছু না হলেও, মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে, ১৮৭৪ সালে আসামকে একজন চীফ কমিশনারের কর্তৃত্বে স্থাপন করা হয়েছিল। এ-সময়ে তিনটি বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চল—সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন বাঙ্গালী-অসমীয়া বিরোধ ছিল না, আর ছিল না জাগ্রত জনমত ; তাই তখন কোনও হৈ-চৈ আর হয়নি।

এর পরের ধাক্কা আসে বাঙ্গলার ছোটলাট (লেফ্টনাণ্ট গভর্ণর) ইলিয়ট (Charles Elliott)-এর আমলে; ১৮৯৬ সালে। ইলিয়ট নতুন ছোটলাট হবার

আগে বাঙ্গলায় কখনও পদার্পণ করেননি। তিনি বাঙ্গলার অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই আসামের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের খানিকটা যোগ করে দেবার প্রস্তাব তোলেন।

ইলিয়ট তবুও কিছুটা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের ওপর জনমত গ্রহণের চেষ্টা করেন। আপত্তি উঠেছিল নানা দিক থেকে। অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি হাইকোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। হাইকোর্ট সরাসরি বলে দিল যে—"অত্যন্ত ভুল পথ ধরা হয়েছে। ইংরেজ অধিকারের শুরু থেকে যে-সকল অঞ্চল অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পরের সাহায্যে গড়ে উঠেছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে সকলগুলিরই বিষম ক্ষতি হয়ে যাবে। সেই হিসাবে বলা যায়, যদি চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাতে চট্টগ্রামের সমস্ত উন্নতি ব্যাহত হবে এবং তার পরিণাম অশুভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।" এইরকম সমালোচনা পেয়ে ইলিয়ট নিরস্ত হলেন।

এইবার বঙ্গজননী পড়লেন জল্লাদের হাতে ; তাঁর হাতে আর নিষ্কৃতি নেই! বড়লাট কার্জ্জন সাহেব ১৯০২ সালে ভারতসচিব (সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট) হ্যামিল্টন (Lord George Hamilton)-কে বেরারকে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার সুপারিশের সুযোগে বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় বিভাগ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করে ছেড়ে দিলেন। মস্ত বড় শাসন-বিভাগ, একজনের পক্ষে শাসন-পরিচালনা করা সম্ভব নয় ("Bengal is unquestionably too large for a single man to administer efficiently")।

কয়েকটা মাস কেটে যাবার পর তাঁর টনক নড়ে উঠলো। ১৯০৩ ডিসেম্বর ১২-ই কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী রিজলী (Herbert Hope Risley) বাঙ্গলার চীফ সেক্রেটারীকে লিখিত ইস্তাহার (No. 3678, Calcutta, 3rd December, 1903) প্রকাশ করেন। এতে আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ নিয়ে এক রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র করে দেওয়ার যে-কথা পূর্ব্বে একবার উঠেছিল, তাকে নাকচ করা হয়। রিজলীর মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তাই ভারত-সরকারের ঝানু সেক্রেটারী মনে বেশ বুঝেছিলেন যে বাঙ্গালী এ-ব্যবস্থা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না। বাঙ্গলা সরকারকে একটু সতর্ক করে দেওয়ার ছলে তিনি লিখেছিলেন যে, স-পারিষদ বড়লাট বাহাদুর মনে করেন "it is not unlikely that the proposal which is here put forward may meet with keen criticism, and perhaps in parts with strenuous opposition"—অর্থাৎ তীব্র সমালোচনা থেকে প্রচণ্ড বাধা দেখা দিতে পারে। তা হলেও তিনি এই অভিসম্পাত বাঙ্গলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মত সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। বিফল চেঁচামেচিতে তিনি ভয় পাবার লোক ন'ন।

সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। আর, প্রতিবাদের ঝড় সমস্ত দেশকে উদ্দাম করে তুলেছিল।

দেশীয়, এমনকি বিদেশী মালিক পরিচালিত পত্র-পত্রিকার অনেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যে তারিখের প্রবন্ধটি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ১৯০৩ ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত এরূপ পত্রিকার মধ্যে যাদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে—ইণ্ডিয়ান মিরর (১৩-ই), অমৃত বাজার পত্রিকা (১৪-ই), বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, হিন্দু পেট্রিয়ট, চারু মিহির (১৫-ই), জ্যোতিঃ, সঞ্জীবনী, ট্রিবিউন (১৭-ই), ইংলিশম্যান (২৩-এ), প্রতিনিধি (২৬-এ), বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপরই "ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" স্বরূপে এসে উপস্থিত। এদের মধ্যে কয়েকটির পরিচয় বিশদভাবে দেওয়া হচ্ছে। সবগুলিই ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার মতামত একই ছাঁচে ঢালা। কেউ কেউ এর মধ্যে মঙ্গলের চিহ্নও দেখতে পেয়েছিল। ১৯০৪ জানুয়ারী (১২-ই) "চারু মিহির" পত্রিকা বলেছিল যে, এটা অভিশাপের বদলে আশীর্ব্বাদ বলেই গ্রহণ করা সমীচীন। এই এক প্রস্তাবে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত নিরক্ষর, প্রজা জমিদার—সব একসঙ্গে মিলিত হলেন। যে জমিদারকুল নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যস্ত থাকতেন, আজ তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী সকল পত্রিকার কথা বাহুল্যভয়ে আর স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজন নেই। বিদেশী মালিকানার পত্রিকা এ-প্রতিবাদে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তারাও এর কুফল যে কত সুদূরপ্রসারী, সেটা বুঝতে ভুল করেনি। সেটা দেবার আগে, বাঙ্গলার বাইরের একটি পত্রিকার মতামত প্রকাশ করা যাচ্ছে।

"ট্রিবিউন" ১৯০৪ জানুয়ারী (১৬-ই) পূর্ব্ববঙ্গের আন্দোলনের ওপর বেশ জোর দিয়েছিল। তার মতে, বর্ত্তমানে (তৎকালে) যে সোরগোল উঠেছে, ভারতবর্ষে কোন ব্যাপারে সেরকম আর দেখা যায়নি। বঙ্গচ্ছেদ কারও উপকারে আসবে না। উপরন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষতিসাধন করবে। মানসিক উত্তেজনার তো কথাই নেই। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনা যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না, এ কথা মনে করা যেতে পারে।

বিদেশী-পরিচালিত পত্রিকা "ইংলিশম্যান" ১৯০৪ জানুয়ারী ২৩-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে যে, "বাঙ্গলার অধিবাসীর কাছে বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা যে মহা আপত্তিকর, সে-কথা বেশী লিখে কাকেও বোঝাবার প্রয়োজন নেই। অতি উচ্চ, অতি কোমল সকল পর্দ্দায়, সকল খাদে ধিক্কার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। কেবল ভাবজগতে নয়, জাগতিক বুদ্ধির বিচারে এ-পরিকল্পনা কোনোরকমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেবল বড় বড় সম্প্রদায় নয়, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিরোধ চেষ্টা হচ্ছে। ভাবের জগৎ থেকে যে প্রবল ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে যাঁরা এ-আন্দোলন শুরু করেছেন, তাঁরাও এর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছেন। গভর্ণমেণ্টের সমর্থনে অতি ক্ষীণ একটা শব্দও শোনা যায়নি।

এর যদি সামান্য সম্ভাবনাও থাকতো, সেটাও সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কর্ণভেদী তীব্র নিনাদের কাছে নীরব বা শব্দলেশহীন হয়ে পড়তো। সামান্য বিচারেই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, সাধারণ নিরীহ বাঙ্গালীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং একটা সমগ্র প্রদেশকে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ত্বরিত এবং সহজ উপায় আবিস্কার করা হয়েছে।''

এখানেই শেষ নয়; মাসখানেকের মধ্যে ঐ পত্রিকাই আবার লিখেছে—"যারা আপত্তি জানাচ্ছে তারা যে দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হয়ে করছে—এটা প্রমাণ করবার জন্য মুষ্টিমেয় যে-ক'জন সমর্থক আছে তারা যেন অন্য যুক্তি আবিষ্কার করে", অর্থাৎ এখন যে কারণ তারা দর্শাচ্ছে, সেটার কোনও মূল্যই দেওয়া যায় না; নিতান্ত বালকোচিত বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

"দি ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ" (The Indian Daily News) পত্রিকা ১৯০৪ জানুয়ারী (২৯-এ) একটু ব্যঙ্গ করে বলেছিল—"পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী মনে করতো যে, ভারত-সরকার অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তনের প্রতীক। ব্যাপার দেখে মনে হয়, জনমতের বিপক্ষে অহেতুক এতবড় পরিবর্তন সাধন করতে গেলে যে অশান্তি ও সঙ্ঘাত বাধবার সম্ভাবনা বহন করছে, তাতে ভারত-সরকারের 'র‍্যাডিক্যাল' বা দ্রুত আমূল পরিবর্তনের সব লক্ষণই বর্তমান।''

সকল জেলা থেকেই প্রতিবাদের ধ্বনি উঠতে থাকে। কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। মার্চ্চ ১-লা বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন তাঁদের লিখিত মতামত বাঙ্গলা সরকারকে জ্ঞাপন করেন। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত বড়, বিত্ত ও প্রভাবশালী জমিদার এই সমিতির সভ্য। তাঁরা বললেন, বাঙ্গলা বিভক্ত করা কিছুতেই উচিৎ হবে না। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনও মতানৈক্য নেই। (Bengal should not be divided as proposed. .... There is no divergence between Hindus and Mahomedans".) নিতান্ত স্বার্থান্ধ ব্যতিরেকে কারও কাছ থেকে এ-ব্যবস্থায় সমর্থন পাওয়া যাবে না বলে তাঁরা দীর্ঘ স্মারকলিপি শেষ করেন।

১৯০৪ মার্চ্চের ১৮-ই, টাউন হল্-এ মহারাজা নাটোরের পরিচালনায় বিরাট সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা মজুমদার, সীতানাথ রায়, লালমোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতায় ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট প্রচার করতে ত্রুটি করেনি যে, মুসলমান সমাজ প্রায় একবাক্যে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করেছে। এটা যে সর্বৈব মিথ্যা, সেটা আগের নজির থেকে বুঝতে পারা যায়। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক বহু সম্ভ্রান্ত জমিদার, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি সকল স্তরের মুসলমান এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছিলেন। সভা-পরিচালনা, বক্তৃতা-দান এবং সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের

বহু উদাহরণ আছে। সংবাদ প্রচার হওয়া থেকে প্রকৃত বঙ্গ-বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু দেশভক্ত মুসলমান সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলে একটা অমূলক কুৎসার প্রত্যুত্তর হতে পারবে।

সভ্যগণের নাম ও বন্ধনীর মধ্যে সভার স্থান ও তারিখ প্রদত্ত হ'ল ঃ

কাজি রিয়াজুদ্দিন মহম্মদ (জমিদার, কুমিল্লা, ২৮. ৮. ০৫), মুন্সী জিলার রহমান (তালিবপুর, বহরমপুর ৩. ৯), রাজা আনোয়ারুদ্দিন খাঁ চৌধুরী (ভাঙ্গা, ফরিদপুর, ৪. ৯), মৌলভী মুসারফ হোসেন (জলপাইগুড়ি, ৪. ৯), সৈয়দ মোতাহার হোসেন, বার-এ্যাট-ল' (পিরোজপুর, বাখরগঞ্জ, ৪. ৯), মুন্সী রেজা সাহেব (দিনাজপুর, ৬. ৯), ডাঃ বাচা শেখ, এ. কে. গজনবী, ওয়াজের আলি, আবুল কাশিম (কলিকাতা, ২২. ৯), এ. রসুল (রাজাবাজার, ২৩. ৯), মোঃ এক্রাম খাঁ, আব্দুল হোসেন, দেদার বক্স, মৌলভী হেদায়েতুল্লা, আব্দুল মজিদ, লিযাকত হোসেন, আসরাফুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন।

সারা বাঙ্গলা ছেয়ে সভা-সমিতি হয়েছে। মুসলমানপ্রধান জেলাতে দুই বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। একযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদাহরণ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। নিরপেক্ষ ইতিহাস এঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে নিশ্চয়ই কার্পণ্য করবে না। আর, পরে বিভেদের মূলে ইংরেজ (বিশেষতঃ বড়লাট লর্ড মিণ্টো) যে জঘন্য অংশ গ্রহণ করেছিল, ইতিহাস ক্রমে তা উদঘাটিত করছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন আছে বলে লর্ড কার্জ্জন গভর্ণমেণ্টের প্রচারযন্ত্র ভীষণ আরাব সৃষ্টি করে লোককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছিল। তদুত্তরে নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন, সি.আই.ই. এবং কেন্দ্রীয় মুশ্লিম সমিতি (Central Mahomedan Association)-এর সেক্রেটারী লিখিতভাবে বাঙ্গলার চীফ্ সেক্রেটারীকে ১৯০৪ ফেব্রুয়ারী ১৭-ই জানালেন—" 'পার্টিশন' সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত। যদি সংসাধিত হয়, তা হলে বহু শতাব্দীর আচরিত ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" কিন্তু কথায় বলে—"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে পার্টিশনে আপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছিল ১৯০৫ জানুয়ারী ১০-ই, টাউন হল্-এ অনুষ্ঠিত মফস্বল-আগত তিনশত-প্রতিনিধি-সভায়। বাঙ্গলার সমস্ত জেলা থেকে ধনী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন, এমনকি রাজভক্ত দেশবাসীও এসেছিলেন। কটন (Sir Henry Cotton) সভাপতিত্ব করেন এবং যাতে বক্তারা রাজপুরুষদের আপত্তিজনক কোনও ভাষা ব্যবহার না করেন, সে নির্দ্দেশ দেন। তিনি সরকারী ব্যবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং যাতে পার্টিশন প্রস্তাব রদ হয়, সে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সামস্-উল হুদা, এ. চৌধুরী, এ. এইচ্. গজনবী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদের বার্ত্তা প্রতি জেলায় বহন

করে নিয়ে যেতে বলেন এবং পুলিশের ভয় যেন অভিভূত না করে, সে বিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

এর পরে কার্জ্জনী সরকারের গোপন অভিযান আরম্ভ হয়েছিল। পত্র-পত্রিকার ভাষা আর সাধারণ লোকের তীব্র বিরোধিতার প্রমাণ পেয়ে কার্জ্জন বুঝলেন তাঁর পক্ষে একটা বড় দলীয় সমর্থন প্রয়োজন। তিনি, ফেব্রুয়ারী ১৯০৪, রওনা হলেন, পূর্ব্ববঙ্গ-দিগ্বিজয়ের বাসনা,—তিনি স্বয়ং বুঝিয়ে দেবেন পার্টিশনের উপকারিতা। ‘খাদ বড়লাট বেরিয়েছেন তদারকিতে, যাত্রাপথ সরগরম হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রামে পৌঁছুলেন ১৫-ই ফেব্রুয়ারী। সভা-সমিতি, উৎসব, আলাপ-আপ্যায়ন শেষ করে ১৮-ই উদয় হলেন ঢাকায়। এখানে তিনি মুসলমান এক মুষ্টিমেয়-সংখ্যক লোকের সমর্থন লাভ করলেন। এতেই উৎফুল্ল হয়ে শেষ ঘাঁটি ময়মনসিংহে গেলেন।

মতলব করলেন কেবল সরকারি কোঠা-কুঠিতে সরকারি অভ্যর্থনা-ব্যবস্থায় কালহরণ না কবে, বাছাই প্রতিপত্তিশালী লোক ধরে, ঘাড়ে ভর করলে, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জাব খাতিরে হয়তো অতিথিকে ক্ষুন্ন করবেন না। জনপ্রিয় কোনো বিখ্যাত জমিদারকে ধরতে পাবলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। ময়মনসিংহে যখন গেছেন, তখন মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী অপেক্ষা আব কাউকে প্রভাবশালী বলে মনে স্থান পেতে পারে না।

উঠলেন “রাজ”প্রাসাদে দল-বল নিয়ে। এতবড় যাত্রায় অন্ততঃ ডজন-খানেক বড় মেজ সেজ ছোট সেক্রেটারী ও সহচর থাকা চাই। বলা বাহুল্য, আদর-আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হয়নি; বরং তার বেশীই হ’ল, যাতে জাঁকজমকপ্রিয় কার্জ্জনও চমৎকৃত হয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে, বেশ খোস-মেজাজে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। অটুট বিশ্বাস ছিল যে গভর্ণমেণ্টের আওতায় যাঁরা স্বচ্ছন্দে জমিদারীর সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করছেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ রাজপ্রতিনিধির প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারবেন না।

কার্জ্জন সাহেবের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। তিনি যাঁকে পাকড়াও করলেন তিনি বড় “কঠিন বান্দা”। দেশের স্বার্থে, ভবিষ্যতের মঙ্গল যেখানে ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা, সেখানে লাট কেন, স্বয়ং সম্রাট এসে হাজির হলেও প্রত্যাখ্যাত হতেন। বড় নিরাশ হলেন লর্ড কার্জ্জন।

তিনি সব চেপে গিয়ে রাজধানীতে ফিরে প্রচার করলেন পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের সমর্থন পেয়েছেন—অর্থাৎ চৌদ্দ লক্ষ টাকা নামমাত্র সুদে ঋণ দিয়ে ঢাকার নবাব-বাহাদুরকে কতকটা ভজাতে পেরেছেন। তলে তলে ভারত-সরকার অন্য খেলা খেলে চলেছেন। ১৯০৫ ফেব্রুয়ারী ২-রা কার্জ্জন সাহেব বিলাতে ভারতসচিবের নিকট আর্জ্জি পেশ করেছিলেন। তাতে নূতন যুক্তি কিছু ছিল না, ছিল কেবল ১৯০৩ সাল থেকে এযাবৎ যে-সকল নথিপত্র পেশ করা হয়েছে, তারই সংক্ষিপ্তসার।

বলা বাহুল্য, তেমনি গোপনে ৯-ই জুন, ভারতসচিব ব্রোডরিক সাহেব তাঁর

সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। রয়টার জানালে, জুলাই ৮-ই : স-পারিষদ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল সকল দিক বিবেচনা করে মত দিয়েছেন যে, নয়া ব্যবস্থা অতিমাত্রায় যুক্তিযুক্ত ; তবে একটু সংশোধন না করলে তাঁর পদমর্য্যাদা ও নিমকের ইজ্জত রক্ষা হয় না। কাজেই তিনি বিরাট এক পরিবর্ত্তন সাধন করলেন। ভারত-সরকার নূতন প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম দিয়েছিল—"নর্থ-ঈষ্টার্ণ প্রভিন্‌সেস্" (North-Eastern Provinces)। সেটাতে "খোদার ওপর খোদকারী" করে বললেন, এর নাম হোক—"ঈষ্টার্ণ-বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম" (Eastern-Bengal & Assam)।

যেহেতু বিশ্বের বাজারে আসামের চা পরিচয় লাভ করেছে, আজ হঠাৎ খোদ "আসাম"কে চোখের সামনে দেখতে না-পেলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। চা-শিল্পের কিছুটা ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে যে-সব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল সে-বিষয়ে দীর্ঘ বিবৃতিতে একটি কথারও উল্লেখ ছিল না।

ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। সেচকার্য্য সেরে তাতে বীজ উপ্ত হ'ল। বিষফল ফলতে বিশেষ দেরী হ'ল না। ভারতসচিবের অভিমত পাকাপাকিভাবে প্রচারিত হবার আগেই গুজবে যখন সংবাদটা জনগোচর হ'ল তখন 'ট্রিবিউন' পত্রিকা (১৯০৫ জুলাই ৮-ই) যা লিখেছিল, সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হতে বেশী সময় যায়নি : "রাজভক্ত ও শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় একটা জাতিকে রাজ্যপরিচালনা ব্যাপারে আস্থাহীন এবং বিদ্রোহী করে তুলতে যদি কোনো কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ("Machiavelli") তাঁর সমস্ত সর্ব্বনাশা দুরভিসন্ধি নিয়ে এ-কাজে মনঃসংযোগ করতেন, তা হলেও বর্ত্তমান-আচরিত কু-ব্যবস্থার সমপর্য্যায়ে উঠতে পারতেন না"।

'কেশরী' পত্রিকা (১৯০৫ আগষ্ট ১৫-ই) একেবারে খাঁটি কথা বলে বসলো। তার মতে "এইসব সুদূরপ্রসারী গুরুতর অমঙ্গল জোর করে চাপিয়ে দেওয়ায় সাম্রাজ্যের ভিত টলে উঠেছে, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে"। পার্লামেণ্টে যখন আগষ্ট (১৯০৫) মাসে ব্যাপারটা আলোচনা বা সমর্থনের জন্য উত্থাপিত হয়, তখন একজন ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট (ভারতসচিব) রবার্টস্ (Sir Herbert Roberts) ক্ষোভ করে বলেছিলেন যে, এতবড় একটা গুরুতর ব্যাপারে পার্লামেণ্টকে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। তখন ব্রোডরিক সাহেব বলেছিলেন যে, যতদিন না পার্লামেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত কাগজপত্র বিচার করে দেখবার সুবিধা পাচ্ছে, ততদিন কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হবে না।

কার্য্যতঃ কিন্তু সবটাই "ভাঁওতা" বা চোখে ধূলো দেবার ব্যবস্থা। সব ব্যাপারই ভারতবর্ষে বসে স্থির করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী ভারতসচিব মর্লি (Lord Morley) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, নিতান্ত এটা শাসনবিধির কথা এবং যারা এর কুফলের দ্বারা প্রপীড়িত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশেরই অমতে হয়েছে ("it was and remains undoubtedly an administrative operation,

which went wholly and decisively against the wishes of most of the people concerned")।

ইত্যবসরে কার্জ্জনী দুরভিসন্ধি দানা বেঁধে উঠেছিল। সিমলা থেকে ১৯-এ জুলাই (১৯০৫) তারিখের ২৪৯১-নং ইস্তাহারে (২২-এ জুলাই, 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত) বলা হয়েছিল যে, কার্জ্জন পূর্ব্ববঙ্গ সফরকালে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ আসামের সঙ্গে জুড়ে নূতন রাষ্ট্রীয় প্রদেশ সৃষ্ট হবে। আরও বলা হয় যে, ইতিমধ্যে ছোটলাটের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর মতে, আসামের সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলা যোগ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এর ওপর 'রসান' দিয়ে ভারত-সরকার তার সুস্পষ্ট মতে জানালে, ছোটলাটের মত মেনে নিয়ে বলতে হয় যে, তারও সঙ্গে রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার সংযুক্ত করে দেওয়া হোক।

তা হলে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে—

চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ সম্পূর্ণ, মালদহ ও ত্রিপুরা উপস্থিত আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

এইবার ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত হয়ে উঠছে। পার্লামেণ্টের বিষয় ধামা-চাপা পড়ে রইল। ৬-ই সেপ্টেম্বর (১৯০৫) কলিকাতা গেজেটে সিমলা থেকে ১-লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রচারিত বিবৃতি, নং ২৮৩২, ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে তুলে মুদ্রিত করে দেয়।

ভোল পাল্টাতে পাল্টাতে এখন এসে দাঁড়াচ্ছে—

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ—পূর্ব্ববঙ্গ, আর আসাম এর সঙ্গে যুক্ত হবে।

দ্বিতীয় ইস্তাহারে (নং ২৮৩৩) বঙ্গচ্ছেদের তারিখ ১৯০৫ অক্টোবর ১৬-ই (৩০-এ আশ্বিন ১৩১২) নির্দ্ধারিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

এই ব্যবস্থাকে আইনমতে বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১১-ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভার (বড়লাট কাউন্সিল) অধিবেশন হবে বলে স্থির হয়। কারণটা জানা নেই, তবে ৮-ই সেপ্টেম্বর (১৯০৫) এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নয়া প্রস্তাব বিচারের জন্য আলোচ্য বিষয়-তালিকায় উপস্থাপিত হয়েছিল। তখন বঙ্গ-ভঙ্গের বিল (খসড়া) সভ্যদের গোচরীভূত হ'ল।

এ ব্যাপারে আরও এক নতুন পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। বড়লাট-পরিষদে কয়েকজন বে-সরকারী ভারতীয়কে গ্রহণ করা হয়েছিল—লোকের চক্ষে ধূলো দেবার জন্য। তাঁদের পদ হ'ল "অতিরিক্ত সভ্য", ইংরেজিতে "Additional Members"; কাজের মধ্যে, আইন-প্রণয়ন বা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের ("for making Laws and Regulations") সময় তাঁরা উপস্থিত থাকবেন। এই সময়ে মোট সাতজন

বে-সরকারী সভ্য লাট-কাউন্সিলে ছিলেন। তন্মধ্যে ২২-এ মে ১৯০৩ গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং ১৯০৪ সেপ্টেম্বর ২১-এ দ্বারভাঙ্গার (মহারাজা) রামেশ্বর সিং সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। মোট কথা, এই সাতজনের একজনকেও সভায় উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ দেওয়া হয়নি, সুতরাং উপস্থিত থাকবার সুযোগ তাঁরা পাননি। আজ অবশ্য একবার মনে প্রশ্ন ওঠে, যখন সব ব্যাপার প্রকাশ হয়ে গেল তখন আর কেউ না করুন, গোখেল এ নিয়ে আপত্তি জানাননি কেন ? অবশ্য পার্লামেণ্টে পরে আলোচনা-কালে একাধিক সভ্য এই ঘটনা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

৮-ই সেপ্টেম্বরের পর মুলতবী সভা ২৯-এ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বিনা প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ বিল পাশ হয় এবং ঐ দিনই বড়লাট-বাহাদুরের স্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হয়ে যায়, Act VII of 1905.

এর প্রথম স্তবকে আসাম সরকারের এবং দ্বিতীয় স্তবকে পূর্ব্ববঙ্গের বিচ্ছিন্ন অংশের তালিকা দেওয়া হয়।

প্রথম ঃ গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, নওগাঁ, শিবসাগর, লখিমপুর, সিলেট, কাছাড়, গারো পর্ব্বতমালা, খাসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়, নাগা ও লুসাই পর্ব্বত-পুঞ্জ থাকবে 'খাস আসাম' বলে পরিচিত।

দ্বিতীয় ঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও মালদহ হবে 'পূর্ব্ব-বাঙ্গলা'।

ছোট একখানি সে-যুগের দু' আনা তিন পাই (ন'পয়সা) দামের বই (Act VII of 1905) বিরাট অশান্তির কারণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল বর্ষণ-বঞ্চিত বিরাট শুকনো জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যোগ হয়ে গেল। দাবানল ছড়িয়ে পড়লো। এইটি প্রধান কারণস্বরূপ হয়ে কার্জ্জনকে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা বলে গ্রহণ করা হয়।

বহু পত্রিকায় বহু চিন্তাশীল বিদ্বান বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বরে এই এক ব্যঙ্গোক্তি ধ্বনিত হয়েছিল।

যখন পার্টিশন শাসনক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'ল, তার প্রতিবাদে চরমপন্থী, নরম-পন্থীদের আপত্তি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ভাষার তীব্রতার পার্থক্য ছিল, কিন্তু মোট ব্যাপারটা যে ভারতের স্বার্থহানি ঘটিয়েছে, এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল না। সমর্থনে যে ক্ষীণ ভাষা ছিল, সেটা অপরপক্ষের দুর্দ্দান্ত কলরবে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

উপসংহারে স্থির, ধীর, নরমপন্থী, কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশনে (১৯০৫)-র সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি পার্টিশনকে একটি "cruel wrong" (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে অভিহিত করেন।

যে আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে, সেটা তীব্রতা, ব্যাপকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে ভারতের রাজনৈতিক সকল বিক্ষোভকে অতিক্রম করেছে (.."that nothing more intense, widespread and spontaneous had been seen in Indian political agitation")।

"জনসাধারণের ক্ষোভের এই বিরাট উদ্গিরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাতির প্রস্তুতির পথে এক গভীর রেখাপাত করবে। বাইরের কোনও উস্কানি ছাড়াই সকল শ্রেণীর লোকই দেশের এই বিরাট অমঙ্গলের প্রতিবিধানে তৎপর হয়ে উঠেছে।"

গোখেলের নিজ ভাষায়ঃ "The tremendous upheaval of popular feeling which has taken place in Bengal in consequence of the partition will constitute a landmark in the history of our national progress. For the first time since British rule began all sections of the community, without distinction of caste or creed, have been moved by a common impulse and without the stimulus of external pressure to act together in offering resistance to a common wrong."

ঘৃতাহুতি

যখন কার্জ্জন এসে ভারত-শাসনযন্ত্রের ভার গ্রহণ করলেন, তখন উদারপন্থী দলেব প্রভাব ক্ষয়ের দিকে চলেছে এবং কার্জ্জনী শাসনের ফলস্বরূপ তাঁরা লোপ পাবার পথ ধরতে বাধ্য হয়েছেন।

যখন মহারাষ্ট্রে রাজকর্ম্মচারী হত্যা, অরবিন্দর অভ্যুদয়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রের গুপ্ত-সমিতি গঠন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন পথ গ্রহণ প্রভৃতি ঘটেছে, তখন কার্জ্জনের শাসনকাল বছর দুই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তিনি চোখ খুলে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের সময় করতে পারেননি বা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চলেছেন। বিপ্লবের আসন্ন ঘনঘটা তাঁর বিচারশক্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে মনে হয়।

বিপ্লবের পথে দ্রুত ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে সরকারী ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। তথ্য আজ বিতর্কেব স্তর অতিক্রম করেছে। ভারতবর্ষে কার্জ্জনের আবির্ভাব ও ক্রিয়াকলাপ মহারাষ্ট্রের র‍্যাণ্ডের অত্যাচার কাহিনীকে ম্লান করে ফেলেছিল। জাতীয়তা বিপদসঙ্কুল পন্থা গ্রহণে বাধ্য করার জন্য যদি একক কাকেও প্রধান অংশের গৌরব দান করতে হয়, তাহলে লাট কার্জ্জনের কথা প্রথমেই মনে আসে।

এই সময়ের ঘটনা-পরম্পরায় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রগতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ভারতে ইংরেজ-শাসন চিন্তাশীল শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মন বিষাক্ত করে রেখেছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দ্দশা দ্রুত বেড়েই যাচ্ছিল। অপরাপর সকল বিষয় এখানে উত্থাপন না করে একজন উদারপন্থী মাননীয় নেতার মতামত উদ্ধৃত করা হচ্ছে,—মনে রাখতে হবে, তালিকা বহুলপরিমাণে অসম্পূর্ণ এবং কিছু বাদও দিতে হয়েছে। লর্ড কার্জ্জনের এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উচ্চারিত বাণীর প্রতিবাদ বেরিয়েছে ফিরোজ শা মেহ্‌তা প্রদত্ত ১৯০৫ সালে কংগ্রেসে এক বক্তৃতার ভিতর দিয়ে।

লাট-বাহাদুর বলেছিলেন যে ইংলণ্ড সম্বন্ধে ভারতবাসীর মধ্যে দুটি (বিরুদ্ধ) দল থাকতেই পারে না। ("There might be no two parties about England in India.")

তদুত্তরে মেহ্‌তা বললেন—(*Indian Daily News,* January 6, 1905) :

এ আশা পোষণ করা নিতান্ত অযৌক্তিক, কারণ সেটা কখনই সম্ভব নয়,—

"যখন (while)

(মহারাণীর ঘোষণায়) সমস্ত প্রজার মধ্যে যে সমতার উল্লেখ ছিল, সেটা

ছাপার অক্ষরে তুলে রেখে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হয় না,—পরন্তু উপেক্ষিত হয়—

যখন, মহারাণীর মহান ঘোষণা-মতে জাতি-ধর্ম্ম-দেশ-নির্ব্বিশেষে সকল পার্থক্য তিরোহিত হলেও, কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ গুণ বা শক্তির ছলনায় বর্ত্তমান ভারতীয়কে অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করা হয় এবং শ্বেতাঙ্গ মনোনীত হয়—

("While the distinctions .... of race, colour and creed are introduced under the plausible guise of distinctions based on distinctive merits and qualifications inherent in race") ;

যখন, বিশাল সাম্রাজ্যের অসহনীয় বোঝা সমস্ত উপনিবেশের সঙ্গে ভারতকে সমানভাবে ভাগ করে নেবার কথা, সেখানে অশোভন পক্ষপাতিত্বে একা ভারতের ধনভাণ্ডারের ওপর সেই ভার চাপানো হয় ;

যখন, সামরিক প্রয়োজনে ইংরেজের স্বার্থে এবং নিরাপত্তার অজুহাতে অবলম্বিত সমস্ত ব্যয় ভারতের ক্ষীণ অর্থসঙ্গতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ;

যখন, শ্বেতাঙ্গ জাতির গোপন স্বার্থে ও ছলনার আশ্রয়ে আচরিত নীতি দ্বারা ভারতীয় নাগরিক তাদের ন্যায্য, সঙ্গত দাবী ও প্রাপ্য হতে বঞ্চিত হয় এবং যে-সকল আচরণকে কোনও কোনও ব্রিটিশ মন্ত্রী বুয়র যুদ্ধের কারণ বলে নির্দ্দেশ করেন, আর সেইসব নীতি ভারতে প্রযুক্ত হয় ;

("While the Indian subjects of Her Majesty are allowed to be deprived of their rights of equal citizenship in the undisguised interests of the white races against the dark in a manner which responsible Ministers of the Crown gravely declared, furnished a just cause of war against the Boer") ;

যখন, দুই দেশের অর্থবণ্টন নীতি ও বিলি-ব্যবস্থা গরীয়ান দেশের (ভারতবর্ষ) স্বার্থ উপেক্ষা করে বলবানের পক্ষে প্রযুক্ত হয় ;

যখন, ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতের শিল্প-প্রচেষ্টা ব্যাহত করা হয় ;

যখন, শাসনকর্ত্তাদের অন্তরে ভারতের প্রতি 'অত্যুগ্র প্রেম' (consuming love) গর্ভজ সন্তানের প্রতি অতি স্বাভাবিক প্রেমের মত মনে হয় ;

("While the 'consuming love' for Indians in the breasts of Rulers has more the colour and character of affection towards a foster-child or a step-son, than the equal and engrossing love for a natural son") ;

যখন, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের নির্ভরযোগ্য অকপট (bona fide) প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ, স্বেচ্ছাচারী ('autocratic) আদেশে ভণ্ডুল করা হয় ;

যখন, অস্ত্র আইন (Arms Act) প্রয়োগে একটা সমস্ত জাতিকে শক্তিহীন করে ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশের স্বার্থহানি করা হয় ;

যখন ...... ,

যাক্‌গে, ভারতের আপত্তিকর ও তাহার বিরুদ্ধ-স্বার্থে পরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থার তালিকা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই ।"

এই যখন মডারেট বা নরমপন্থী একজন সর্ব্বজনমান্য নেতার মনোভাব তখন এসকল ব্যাপারে উগ্রপন্থীদের কারও মতামতের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কার্জ্জন যেটা করতে চাইলেন, সেটা কৃষ্ণবর্ত্মে হবিঃ-সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয় ।

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে জর্জ্জ ন্যাথানিয়েল কার্জ্জন বড়লাটরূপে ভারতে পদার্পণ করেন। তাঁর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হয়নি। কারণ তখনও তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়নি। বিশেষ করে, লাট নির্ব্বাচিত হবার পর ইংলণ্ড পরিত্যাগের প্রাক্কালে তিনি 'সুদুর্লভ মনোহারী বচন' দিয়ে ভারতীয়ের মন অভিভূত করে ফেলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কার্জ্জনের ভাষার উল্লেখ করেছেন,

"I love India, its people, its history, its government, the complexities of its civilization and life."

অর্থাৎ "আমি ভারতকে ভালবাসি, ভালবাসি তার জনসাধারণকে ; তার ইতিহাস, তার শাসনব্যবস্থা, তার সমস্যাসঙ্কুল সভ্যতা এবং তার জীবনের ধারা ।"

এ বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। আরও বলেছিলেন যে, ভারতীয় ভাইসরয়, অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধির দুটি বিশেষ গুণ—সাহস ও সহানুভূতি ("courage and sympathy") থাকা অপরিহার্য্য। ফলে যা পরিচয় পাওয়া যায়, সেটাও মিথ্যাভাষণের অপূর্ব্ব দক্ষতা বলে মেনে নিতে হয়।

সংস্কৃত প্রবচনে আছে ঃ

"মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্"

—দুরাত্মাদের মন, বচন ও কর্ম্ম—প্রত্যেকটি অপরটি হইতে ভিন্ন। এদের একের সঙ্গে অপরের কোনো মিল নেই এবং তার জাজ্বল্য প্রমাণ কার্জ্জনের আচরণ।

লাটসাহেবের আসল মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হ'ল, যখন 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশন' (ভারত সভা) থেকে তাঁকে লাটপ্রাসাদে অভিনন্দন জানাবার তোড়জোড় করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ এক বিশিষ্ট নাগরিকদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, দুইজনের পায়ে দেশীয় ধরনের জুতা থাকাতে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে তাঁদের বিদায় করে দেন। ক্ষুব্ধ অপমানিত ভদ্রলোকদ্বয় চলে যাবার পর দালানে লাটমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।

এর পরই কার্জ্জন ১৯০১ সালে সিমলায় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় এক গোপন বৈঠকের

(Educational Conference) ব্যবস্থা করেন। সেখানে কোনও ভারতীয়ের স্থান ছিল না। সেই সভাতেই তিনি বলেন, যেখানে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত, সেখানে গোপনীয়তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। অথচ এই অনুষ্ঠানেরই আলোচ্য বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কোনও সময়েই প্রকাশ করা হয়নি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় যেটুকু স্বাধীনতা জনপ্রতিনিধিদের ছিল, তা খর্ব্ব করে তিনি এটিকে গভর্ণমেণ্টের তাঁবেদাবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বিক্ষোভ হয়েছিল, কিন্তু কোনও ফলই হয়নি। রমেশ দত্ত লিখেছিলেন—"Real popular government was at an end."

ঊনবিংশ শতকের শেষ ক'টা বছর—ভারতের অতি দুঃসময়। দুর্ভিক্ষ ও দারুণ অন্নাভাব দেশকে জর্জ্জরিত করে তুলেছিল। সেই সময় কয়েকটি ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানে ও অবান্তর যুদ্ধাভিযানে কোটি কোটি টাকা অনর্থক ব্যয় করেছেন কার্জ্জন। লোকের মন তিক্ত-বিরক্ত অবস্থা থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তখন। ১৯০৪ আগষ্ট ১৬-ই 'কাল' পত্রিকা লিখেছিল যে, নিহিলিষ্টরা যে দাবী করেছে (জনমতের প্রাধান্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধবিবর্তি, ইত্যাদি) তার সঙ্গে "ভারতের দাবীর আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এবং সরকারের তিব্বত অভিযান দুটি আলোচনা করে বলতে হয় যে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এখানে নিহিলিষ্ট (যারা সেরা বাছাই রাজকর্ম্মচারী হত্যা করতে পারে) নেই"। ২-রা সেপ্টেম্বর পত্রিকা আরও বলে যে, "নিহত রুশ-রাজকর্ম্মচারী (এম্. প্লেভে)-র অত্যাচারের তালিকা কার্জ্জনের অত্যাচারের কাছে অতি তুচ্ছ বলে পরিগণিত হবে।" এর নির্গলিত অর্থটা হচ্ছে—"কার্জ্জনকে কেউ হত্যা করছে না কেন ?"

কংগ্রেসের ওপর কার্জ্জন খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তাদের লিখেছিলেন, কংগ্রেসের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এসেছে ; তিনি তার শান্তিপূর্ণ সমাধির জন্য চেষ্টা করছেন। মানসিক এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সার হেনরী কটনের সঙ্গে সাক্ষাতে অস্বীকার করে তাঁর নিজ বিষাক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। কথায় আছে, আসন্ন বিপত্তিকালে পুরুষের ধীঃ মলিন হয়ে পড়ে।

১৯০৪ সালে অধিবেশনের শেষে ২৯-এ ডিসেম্বর কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্জ্জনের হাতে দেবার জন্য সভাপতি কটন এক পত্র দেন। ১৯০৫ জানুয়ারী ২-রা তাঁর সেক্রেটারী জানান, এর পূর্ব্বে কোনও বড়লাট-বাহাদুর এরূপ কাকেও সাক্ষাতের সুযোগ দেননি ; তা ছাড়া এরকম একটা (অপ-) কর্ম্ম করে অনুগামীদের জন্য তিনি কোন নজির সৃষ্টি করতে চান না। যুক্তি অকাট্য ; তখন যে আগুন জ্বলে উঠছে, সে বিষয়ে কার্জ্জন লাট অন্ধ হয়ে বসেছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে এইভাবে অপমান গুরুতর হয়ে লোকের প্রাণে বেজেছিল, আর তার ফল ফলতে বিশেষ দেরী হয়নি।

এই অশালীন আচরণ ইংলণ্ডের অনেকগুলি পত্রিকা-সম্পাদকের দৃষ্টি এড়ায়নি। 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' (Indian Daily News) পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা ১৯০৫ জানুয়ারী ৬-ই তার-যোগে জানিয়েছিলেন যে, বিলাতে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে, কার্জ্জনের পক্ষে কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করা তখনকার ইংলণ্ডের একশ্রেণীর উৎকট মনোভাব প্রকাশ করছে। কিন্তু 'লণ্ডন ডেলি নিউজ' (London Daily News) ও 'মর্ণিং লীডার' (Morning Leader) কার্জ্জনের আচরণের তীব্র নিন্দা করে। প্রথমোক্ত পত্রিকা বলে যে, কটনের অপমান সারা ভারতের মর্ম্মে আঘাত করেছে ; এটা কটনের ব্যক্তিগত অপমান নয়। ব্যবহারটা ভারতবাসীর প্রতি আমলাতন্ত্রী (bureaucratic) লাটের ঘৃণার পরিচায়ক।

("It embodies in a personal affront the contempt with which the bureaucratic Viceroy regards the popular movement.")

এর সঙ্গে ছিল সতর্কবাণী। নানাভাবে কার্জ্জন এযাবৎ ইংলণ্ডের প্রতি ভারতীয় জনগণের বিরাগ সৃষ্টি করে আসছেন, কিন্তু তাঁর এই উদ্ধত ব্যবহার তাঁর ইতিপূর্ব্বেকার সকল বুদ্ধিহীন, নিন্দনীয় ও বেদনাদায়ক আচরণকে অতিক্রম করেছে।

("Lord Curzon has throughout done his best to lose us the sympathy of the natives, but he has never equalled the tactless offensiveness of his latest affront.")

কার্জ্জনের অহঙ্কাব ছিল—সত্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ প্রধানতঃ প্রতীচ্যে উদ্ভূত ("The highest ideal of truth is to a large extent, a Western conception")। এতেই তাঁর বক্তব্য শেষ হয়নি। তিনি বলেছিলেন—"প্রাচীতে সম্মান পাবার আগেই প্রতীচ্যের নীতিশাস্ত্রে সত্য অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল, আর সেই সময় প্রাচীতে চাতুরী ও কূটনীতিক বঞ্চনা অতি গৌরবের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।" ১৯০৫ ফেব্রুয়ারী ১১-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে তিনি স্নাতকোত্তর ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষিত গণ্যমান্য অতিথিদের এই তথ্যদানে ধন্য করেন। তাঁর মতে, ভারতীয়ের প্রথম দোষ অতিরঞ্জন (exaggeration)। বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, তথ্যবিবর্জ্জিত আবিষ্কার (invention) ও আরোপ (imputation) ভারতে অস্বাভাবিকরূপে পুষ্ট হয়ে থাকে ("flourish in an unusual degree")। তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ঘেঁটে তিনি দেখেছেন এবং তাঁর ফলে বলতে বাধ্য হচ্ছেন—"অশ্বনীড়" ('হমো-পাখীর বাসা'), বা আজগুবি গল্প ভারতে যত চলে, অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয় ("I know no country where mare's nests are more prolific than here")।

এততেও তাঁর গায়ের জ্বালা মেটেনি। আর যে-কয়টি দুর্ব্বলতা ভারত থেকে তিনি নির্ব্বাসন দিতে চান, সেগুলি হচ্ছে চাটুবাদ (flattery), কটু নিন্দাবাদ

(vituperation), তোষামোদ (sycophancy), পরীবাদ, কুৎসা (slander), গালি-গালাজ (villification) ও মিথ্যা আরোপ (imputation)। মহাপুরুষের এই উক্তি শুনে শ্রোতাদের মনের ভাব ব্যক্ত করা কঠিন। সোদরোপম বন্ধু যোগেশচন্দ্র বাগল ('মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এ) বলেছেন যে, সিষ্টার নিবেদিতা কার্জ্জনের বই—*The Problems of the East* (প্রাচ্যের সমস্যা) থেকে এক উদ্ধৃতি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় সরবরাহ করেন। বক্তৃতার তিন দিনের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে এটা প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায়, কোরিয়ার রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সত্যসন্ধ কার্জ্জন তাঁর বয়স সম্বন্ধে সরাসরি মিথ্যা বলেছিলেন, আর তিনি অবিবাহিত এবং রাজপরিবারের কেহ না হলেও "রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব", বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় তাঁর কপালে ঝুলছে। প্রাচ্যের অধিবাসী ও কোরিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপে ভরা লেখাটি ছাপা হলে হয়তো কার্জ্জনের মত লজ্জাহীনেরও কিছু সরম হয়েছিল, কারণ পরের সংস্করণে বই থেকে এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়।

ঠিক একমাস বাদে ১০-ই মার্চ্চ (১৯০৫) টাউন হল্-এ এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহূত হয়েছিল। সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ সখেদে বলেছিলেন, প্রাচ্যে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মেছিলেন—গৌতম বুদ্ধ, যীশু খৃষ্ট, মহম্মদ—তাঁরা অপরের ওপর কর্তৃত্ব করতে শেখাননি। শিখিয়েছিলেন কেমন করে মরতে হয়, অর্থাৎ পবিত্র মৃত্যুভয়-লেশহীন জীবনযাপন করে গেছেন এবং সেই আদর্শ দেশবাসীর জন্য রেখে গেছেন। এই বক্তৃতার তিন বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালী ছেলেরা কেমন করে স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছে।

কার্জ্জনের অবিবেকিতার শেষ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী প্রভুত্ব-স্থাপন চেষ্টা, ছাপাখানা ও পত্রিকার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ, "দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ" ("poor white")-দের জন্য কর্ম্মসংস্থান প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর যে দরদের (sympathy) নিদর্শন পাওয়া যায়, তার তুলনা মেলা ভার। একেই অশান্তি ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, এমন সময় এল বঙ্গ-বিভাগ, ১৬-ই অক্টোবর ১৯০৫। দেশের স্বাধীনতার রুদ্ধদ্বার একটুখানি ফাঁক হয়ে ভিতরের দিব্যজ্যোতির এক-কণা প্রকাশ করে দিল।

কথায় আছে, অতিদর্পে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত লঙ্কেশ্বরের নিধন ঘটেছিল, "অতি"র অত্যাচারে দুর্য্যোধন ও বলিরাজের পতন ঘটে। ব্যতিক্রম ঘটেনি কার্জ্জনের ক্ষেত্রে। এই প্রভুত্ববিলাসী লোকটি ভারতের বক্ষেই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি হলেন "ভাইসরয়"—ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিভূ, সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের মত সামরিক সকল বিভাগের অধ্যক্ষ বলে মনে করেছিলেন। ভারতের সেনাপতি হবেন তাঁর একজন পরামর্শদাতা পার্ষদ মাত্র। তিনি না বুঝে এই শক্তির পরীক্ষায় নেমে পড়েছিলেন। দ্বন্দ্ব বাধলো ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রিয় ও

প্রভাববান, ভারতের প্রধান সেনানায়ক ঝানু কিচ্‌নারের সঙ্গে। দারুণ বাদানুবাদ ও বিতণ্ডা চলেছিল ভিতরে ভিতরে। শেষপর্য্যন্ত অসামরিক লাটের পরাজয় ঘটে জঙ্গীলাটের কাছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কার্জ্জনের অনেক আবদার সহ্য করেছিল; এবার কিচ্‌নারকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস হ'ল না। কার্জ্জনের নানা আচরণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হয়তো আর তত পছন্দ করছিল না। ভারতের নানা স্থানে অশান্তি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছিল, বিশেষতঃ সামরিক বিভাগে প্রধান সৈন্যসরবরাহকারী পাঞ্জাবীদের মধ্যে ঘনায়মান অসন্তোষ সুষ্ঠুভাবে দূর করতে সমর্থ হওয়ায় কিচ্‌নারের তখন 'একাদশ বৃহস্পতি'র সময় চলেছে। রণে পরাজিত হয়ে ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে কার্জ্জন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ২০-এ আগষ্ট (১৯০৫)।

কার্জ্জন ৯-ই নভেম্বর চিরতরে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করলেও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে ভারতবর্ষের অহিত-সাধনে অলস ছিলেন না। তিনিই বলেছিলেন, পূর্ব্ব-বাঙ্গলার ছোটলাট ফুলার (Bampfylde Fuller)-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা অন্যায় হয়েছে। মনে রাখা ভাল, বাঙ্গালীকে উত্ত্যক্ত করে মারতে তিনিও কার্জ্জনের মত এক ধুরন্ধর।

চক্ষুলজ্জা বলে একটা বস্তু কার্জ্জনের সামান্য কিছু যে ছিল, তার একটা প্রমাণ আছে। ১৯০৮ জুনের শেষে পার্লামেণ্টে হাউস্‌-অফ্‌-লর্ডস (House of Lords)-এ এক সভায় তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে দায়িত্ব পরের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলেন। 'লণ্ডন টাইম্‌স' পত্রিকা আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলে, তিনি ১-লা জুলাই তার এক লিখিত উত্তর পাঠিয়ে দেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, পার্টিশনের চরম রূপ সম্বন্ধে তিনি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না; কারণ ১৯০৪ সালে ছুটি উপলক্ষে তাঁর ইংলণ্ড অবস্থান-কালে এটা সংসাধিত হয় এবং ডিসেম্বর মাসে ফিরে গিয়ে তাঁর সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। একটু সংশোধিত আকারে বলেন, "পত্রিকা যেমন বলছে, চরম দায়িত্ব আমার এবং আমি তা কখনও এড়াতে চেষ্টা করিনি" ("Of course, as you say, the final responsibility thus became mine, and I have never said one word to repudiate it")।

পার্লামেণ্টের ঐ অধিবেশনেই ভারতে অশান্তির কারণ হিসাবে কার্জ্জন বলেন যে, ভারতে (কু) শিক্ষা বিস্তার, পার্লামেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারত-শাসন-ব্যবস্থা এবং রুশ-জাপানের যুদ্ধে রুশের পরাজয়—এশিয়াবাসীর প্রতি অলিগলির পথে-প্রান্তরে সাধারণ লোকসমাগমের আড্ডায় আলোচিত হচ্ছে ("The reverberations of that victory had gone like a thunderclap through the whispering galleries of Asia")। তাঁর অপকর্ম্ম পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী সহ্য করেননি, এই হ'ল পার্লামেণ্টীয় শাসনের ওপর কার্জ্জনের আক্রোশের কারণ। যথেচ্ছাচার শাসনই বোধ হয় ভারতের পক্ষে উপযোগী বলে তাঁর বিশ্বাস।

বড় ব্যথা অপমান নিয়ে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল, সে-কথা ভুলতে পারেননি ; পারবার কথাও নয়।

কার্জ্জনী শাসন চলেছিল জগদ্দল পাথরের নীচে ফেলে জনমতকে দলিত নিষ্পিষ্ট করে। কোথাও কোনও আন্দোলন যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। স্বাধীনতা-লাভ-প্রচেষ্টায় জাগ্রত জাতির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কার্জ্জনের কোনও জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরই সময় বাঙ্গলার জাগরণ উৎকট রূপ ধারণ করেছিল। লর্ড রোনাল্ডসে (Lord Ronaldshay: *Life of Lord Curzon*, p. 326) কার্জ্জনের জীবনী লিখেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বাঙ্গলার তৎকালে বিচার-বিচ্যুত উৎকট ভাবধারা ও তজ্জাত প্রয়াসের ঝড় উঠেছে এবং ভাবাবেগে লোককে জাগতিক প্রাকৃত ঘটনার ঊর্দ্ধে তুলে ধরছে (অগ্রপশ্চাৎ সাধ্যাসাধ্য তারা আর ভাবছে না)। লাট কার্জ্জন ফুৎকারে যে ভাবাবেগ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বিরাট তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ওঠার মত, সেই উন্মাদনা আজ বাঙ্গালীর স্নায়ু, শিরা, উপশিরা স্পর্শ করেছে।" এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? লর্ড রোনাল্ডসের ভাষা তুলে দিতে হ'ল, কারণ অনুবাদে কিছু ব্যত্যয় ঘটে থাকবে ঃ

"Bengal, in fact, was passing through one of those storms of unreasoning passion which were ever liable to sweep its emotional people off their feet. Their nerves were thrumming like the strings of a giant harp to the magic touch of the very sentiment which Lord Curzon was inclined too lightly to brush aside."

রোনাল্ডসের উক্তি থেকে বোঝা যায়, কার্জ্জন "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাম্" হরণ করতে বিফল চেষ্টা করেছিলেন। অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে,—কার্জ্জন ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বেই নানা স্থানে বিক্ষোভ বিস্ফোরণের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। কিন্তু কার্জ্জন তখন (বলতে হয়, ভারতের মঙ্গলের জন্যে) অগ্রপশ্চাৎ-জ্ঞানশূন্য হয়ে দমনেব বিফল পন্থা গ্রহণ করেছেন।

নানা স্থানে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। না হবার কারণ নেই। কার্জ্জনের শাসনকালেই ১৯০৪, ২৬-এ নভেম্বর 'সন্ধ্যা', ১৯০৬, ৩-রা মার্চ্চ 'যুগান্তর' ও আগষ্ট মাসের ৬-ই 'বন্দে মাতরম্' জন্মেই অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করেছে।

কার্জ্জন সম্বন্ধে ১৯০৫ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে গোপালকৃষ্ণ গোখেল কার্জ্জনকে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেন। "দুজনের মধ্যেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার দৃঢ়চিত্ততা ও একাগ্র প্রচেষ্টা, আত্মভোলা কর্ত্তব্যবোধ, বিস্ময়কর কর্ম্মশক্তি, বহুর মধ্যে সঙ্গিহীন একাকিত্বভাব, মানবজাতির ওপর ঘোর অবিশ্বাস ও নির্য্যাতনপ্রবণতা প্রভৃতি দোষগুণ বর্ত্তমান। আর

তার ফলে বিরাট চিত্তবিক্ষোভ ও বিফলতাজনিত তিক্তচিত্ততা তাঁকে অভিভূত করে রেখেছিল। ··· ·· লর্ড কার্জ্জনের অন্ধ ভক্তরাও বলতে পারবে না যে, তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তির সামান্য পরিমাণেও শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।" বাকীটুকু তিনি প্রাণ খুলে বললেই পারতেন যে, উভয়েই বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ রোপণ করেছিলেন এবং সে-বৃক্ষে, ফলের না হলেও, ফুলের আবির্ভাব লক্ষ্য করে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতের পুরাণকার বলেন, একদা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য অসময়ে সনকাদি ঋষিগণ গোলোকে এসে উপস্থিত হলেন এবং জয় ও বিজয় দুই দ্বাররক্ষী প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হতে পারে এই আশঙ্কায় পথ ছেড়ে দিতে আপত্তি জানান। মহর্ষিরা অভিশাপ দিলেন মর্ত্ত্যে গিয়ে তাঁদের জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং চিরতরে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন থেকে বঞ্চিত হতে হবে। হতবুদ্ধি হয়ে তাঁরা প্রভুর শরণ নিলেন। ঋষিবাক্য অন্যথা হবার নয়—যেতেই হবে। তবে সাত জন্ম মিত্র ও তিন জন্ম শত্রুভাবে, এই দুয়ের মধ্যে একটা তাঁরা বেছে নিতে পারেন। মিত্রভাবে সাত জন্ম বাদে আসতে হলে বহুকাল লেগে যাবে ; তাই শত্রুভাবে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, কংস ও একদন্ত রূপ গ্রহণ করে পরম ভক্তরা তিনবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেইরূপ মনে করা যেতে পারে, ভারতেরই এককালীন বন্ধু কার্জ্জন-রূপ ধরে এসেছিলেন। আনন্দমোহন বসু সত্যই বলেছিলেন ঃ

"Lord Curzon has done us indeed signal service which enables us to lay the priceless foundation of a new national life."

সত্যিই কার্জ্জন সাহেব এক স্মরণীয় উপকার করেছেন। আমরা সেইসূত্রে জাতীয় জীবনের অমূল্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সমর্থ হয়েছি।

বিপ্লবের ইতিহাস যতই আলোচিত হবে, ততই কার্জ্জন ও বঙ্গ-বিভাগের প্রতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং কার্জ্জনের দানের "কীর্ত্তি" ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারবেন, ১৮৯৯—১৯০৫ (আগষ্ট) এই সাড়ে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে একজন ভারতীয় লাট এতরকমে লোককে উত্ত্যক্ত করেছেন, যার ফলে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চতুর্গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছে।

বিপ্লবের উৎস

কালপ্রবাহে এমন এক-একটা সন্ধিক্ষণ আসে যখন সব অসম্ভব ঘটনা একসঙ্গে ঘটে এবং সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে তার কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সাল সেইরকম একটি বছর যা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করে রেখেছে।

বাঙ্গলার বিপ্লবযজ্ঞের হোতা অরবিন্দ ভারতবর্ষে পৌঁছলেন ১৮৯৩ সালে, আর আসার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কেবল বাঙ্গলার নয়, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড়-রকম সাড়া পড়ে গেল। গণ-আন্দোলনে বিপ্লবের রশ্মিপাত করেন তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসবের ভিতর দিয়ে। ঐ সালেই সিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের যুগান্তকারী বক্তৃতা, আর এ্যানি বেশান্টের ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ। আরও ঘটে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সভ্যপদের জন্য দাদাভাই নওরোজির বিজয়।

এসকলের মধ্যে অরবিন্দর অভ্যুত্থান চিরস্মরণীয় ঘটনা। ইংলণ্ড পরিত্যাগের আগেই তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রগতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। ভারতে ফিরে তাঁকে শিক্ষানবিশী করতে হয়নি। 'ইন্দু প্রকাশ'-এ প্রথম প্রবন্ধ বেরোয় ১৮৯৩ আগষ্ট ৭-ই এবং অনিয়মিতভাবে হলেও সেটা চলে ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। (সব কয়টি প্রবন্ধর নকল শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট টাইপ-করা অবস্থায় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।)

'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় "পুরাতনের স্থলে নতুন বর্ত্তিকা" প্রবন্ধাবলী কেম্ব্রিজের বন্ধু এবং পত্রিকা-সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে লেখা। গোটা দুই প্রকাশিত হবার পর যখন সেগুলি জোঁদা, প্রবীণ রাজনীতিকদের চোখে পড়লো, তখন তাঁরা আঁতকে উঠলেন। বাঙ্গলায় বিপ্লবের পাকা ভিত সেদিন স্থাপিত হ'ল। কালক্রমে সেই বজ্রাগ্নি-লিখন সারা ভারতকে উদ্ভাসিত ক'রে, বিস্ফোরণের বিকট শব্দে বুঝিয়ে দিল—সুপ্তোত্থিত ভারত "রণং দেহি" বলে মেতে উঠছে।

কংগ্রেস তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করছে; ফিরোজ শা মেহ্‌টা প্রভৃতি ধুরন্ধরগণ কংগ্রেসের কর্ণধার। যাঁরাই কিছুটা রাজনীতি চর্চ্চা করেন, তাঁরা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত; তাঁরা সরকারের বিপক্ষে উৎকট বিরুদ্ধ ভাব বা ভাষা কোথাও না থাকাতে বাৎসরিক সভায় নরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

সেই একটানা সুরে খাদ এসে পড়লো। তখনও অ-খ্যাত অরবিন্দ বলেছিলেন, "কংগ্রেস একটা ভ্রান্ত পথ ধরেছে এবং সে-পথে ভারতের মুক্তি নেই।" বলা বাহুল্য,

সে-যুগে কংগ্রেস 'মুক্তি'র কথা চিন্তাই করতে পারেনি। কর্ণধারদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই তখন তার পরম ও চরম লক্ষ্য।

বলে চললেন অরবিন্দ—"কংগ্রেস পুরানো হয়ে গেছে, তাতে পচন আরম্ভ হয়েছে। নতুন করে ঢেলে সাজা প্রয়োজন। তাজা রক্ত না-জন্মালে শক্তিহীন ক্ষীণ হয়ে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেবল ধনী ও শিক্ষিতদের ছাড়া কংগ্রেস সমস্ত জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেনি। বিরাট জনসংখ্যার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই, কাজেই এতে জনমানসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। আছে এতে 'বনার্জ্জি' (ডব্লু-সি), 'ব্যানার্জ্জি' (সুরেন্দ্রনাথ) ও 'ঘোষ'রা (লালমোহন ও মনোমোহন) এবং মাত্র মুষ্টিমেয় লোক সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তা দিয়ে আইনসভার ভারতীয় সভ্যসংখ্যা বাড়তে পারে, সমকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে ও ইংলণ্ডে পরিচালিত হতে পাবে, এখানে ওখানে দু-একটা বড় পদে ভারতীয় নিযুক্ত হতে পারে বা এইজাতীয় ভেক বা মেকি সংস্কার আসতে পারে, তার বেশী আর কিছু সম্ভব নয়। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আনতে আনতে ভারতের নামটাই বজায় থাকবে, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কগণেব অঙ্গুলি-হেলনে ভারতের সকল স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে যাবে। শত মৌখিক প্রতিবাদ এবং দীর্ঘ 'রেজলিউশন' ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পর্য্যবসিত হবে।

"বিরাট মূক জনগণের প্রতিনিধি এই কংগ্রেস। কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের কথা, অনাহার, অর্দ্ধাহার, নিরক্ষরতা, চিররুগ্নাবস্থা, শিল্পনাশ, লুণ্ঠনের দ্বারা দারিদ্র্য-সৃষ্টি প্রভৃতি অবাধে চলে যাচ্ছে, কংগ্রেস তাকে রোধ করতে পারছে না বলে তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ সে-বিষয়ে একটা বিধিবদ্ধ কর্ম্মধারা পর্য্যন্ত নেই।

"নেতৃবৃন্দ মনে করেন এইরকম কোনও পথ অবলম্বন করতে গিয়ে জোর করে কিছু বলতে গেলে, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষরা ক্ষিপ্ত হবে, তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা রাজদ্রোহী বলে গর্জ্জন করে উঠবে, সর্ব্বশক্তি দিয়ে ইংরেজ সকল দাবী দমন করে দেবে। মডারেট নেতাদের ভয়ে যতটুকু হচ্ছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

অরবিন্দ আরও লিখছেন—'কিছুই তো হচ্ছে না, দেশ ক্ষয়ের দিকে চলেছে অব্যাহত গতিতে। অসহায় দর্শকরূপে নেতৃবৃন্দ সেই সর্ব্বনাশ দেখে যাচ্ছেন। কোথাও এক-আধটা বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ বা বই ছাপিয়ে আসল চিত্র দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু জোর করে প্রকৃত অবস্থার কথা বলবার লোকও নেই। এই ধ্বনি সাধারণের কানে জোর করে আঘাত করলে, তারাই একদিন প্রতিকারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাদের ন্যায্য দাবীর প্রচণ্ডতা রোধ করার শক্তি কারও থাকবে না ; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

"এই বিরাট জনশক্তিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা ভারতের জননায়কদের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে দারুণ অবহেলা তো আছেই, বরং কংগ্রেসকে ভুলপথে চালিত

করা হচ্ছে। নেতামাত্রেই স্বার্থদুষ্ট, এ কথা মনে করবার কারণ নেই, কিন্তু তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব আজ সব বানচাল করে দিতে বসেছে। এখন সময় এসেছে যখন আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয় ; দাবী উত্তরোত্তর বিস্তৃতক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

"বিদেশী শাসকবর্গের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করা এবং তার ফললাভের জন্য নিশ্চেষ্ট বসে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। নানা দুর্ব্বলতা জাতির অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, তাকে দূর করতে শক্তিচর্চ্চা করতে হবে। নিজে শক্তিহীন হয়ে পরের কাছে যাচ্ঞা করে কোনও জাত বড় হতে পারেনি। যার মেরুদণ্ড দুর্ব্বল তাকে যত উৎসাহই দেওয়া যাক্, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সমস্ত জাতির মধ্যে শক্তির তেজের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে হবে, মানুষ নিজেকে চিনে তার নিজের পথ বেছে নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে ; তখন তার গতি দুর্ব্বার হবে, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না, সাহসও করবে না। অন্ততঃ দু'পক্ষের একটা কঠোর শক্তিপরীক্ষা হবে ; আর দৃঢ়চিত্ত জাতি পরাধীন হলেও যথাকালে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।

"ভারতবাসীর শত্রু বাইরে যতটা, তার চেয়ে দেশের ভিতর অনেক বেশী। নানা দুর্ব্বলতা দেশের সকল অস্থিসন্ধি ছেয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনের শক্তি, কাম্যবস্তুর প্রকৃত চিত্রের অভাব, আত্মকলহ, পরস্পর দ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক কলহ প্রভৃতি তো আছেই, সঙ্গে আছে বিদেশীর উস্কানি। দেশের অভ্যন্তরের সকল দুর্ব্বলতা দূর করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছুবার কোনও সম্ভাবনা নেই। পথের মাঝেই স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সকল মোহ পরিত্যাগ করে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে হবে এবং তার জন্য সকলপ্রকার চেষ্টা করে চলতে হবে।"

এসব কথা জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হিসাবে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার নানা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের নানা ক্রুটির কথা বলেও অরবিন্দ ক্ষান্ত হননি। বাঙ্গলায় এসে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। হাতিয়ার নেই বলে নিরুৎসাহ হবার বা নিশ্চেষ্ট থাকবার কথা তিনি মনে স্থান দেননি।

তাঁর বক্তব্য ঃ বিপ্লব (সশস্ত্র) আনতেই হবে, কিন্তু এটা কেবলমাত্র কয়েকজন সাহসী বিপ্লবীর বিপদবরণ বা ত্যাগের মধ্য দিয়ে হওয়া সম্ভব নয় ; এর পশ্চাতে প্রকাণ্ড জনসংখ্যার দেশপ্রেমজাত প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন থাকা চাই। তা না হলে কয়েকজন কর্ম্মী বেছে বেছে ধরে সাজা দিলে সমস্ত আন্দোলন বানচাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার এবং তাতে শক্তি-সংযোজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

অরবিন্দ সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করতেন না, এ কথার কোনও ভিত্তি নেই। তিনি সংগ্রামী গুপ্ত-সমিতির সমর্থক ছিলেন ("joined the secret society whose purpose was to prepare a national insurrection")। তিনি 'ব-কলমায়' বলেছেন,—"he had studied with interest the revolutions and rebellions which led to national liberation". যে-সকল বিপ্লব ও বিদ্রোহ পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছে, তিনি সে-সকলের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন ; এবং "the struggle against the English in mediaeval France and the revolts which liberated America and Italy"—ইংরেজের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ফ্রান্সের সংগ্রাম এবং সেই-সকল বিদ্রোহ যার সাহায্যে আমেরিকা ও ইটালী পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। (*Aurobindo on Himself*, p 35)

স্বাধীনতা-লাভের আন্দোলন কি পথ নেবে, তিনি সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ১৮-ই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুণগান করেন 'ইন্দু প্রকাশ'-এর প্রবন্ধে। ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রজা বা সামন্তশক্তির বিরোধের কথা তুলে তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, রণিমীড (Runnymede) থেকে হল্ (Kingston-on-Hull)-এর হাঙ্গামায় পৌঁছুতে ইংলণ্ডের সাত (?) শতাব্দী লেগেছিল, কিন্তু তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্ন পথ ধরেছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, রণিমীড-এ ১২১৫ জুন ২-রা সম্রাট জন্-কে দিয়ে ইংরাজ সামন্তশক্তি ম্যাগ্না-কার্টা সই করিয়ে নিয়েছিল। আর, হল্ সহরে ১৬৪৩ সালে সম্রাট চার্লস-এর সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিল স্থানীয় গণতন্ত্রীদলের নেতারা। তারা স্লুইস গেট ("কপাটে কল") খুলে দিয়ে সহরের ঘেরা পরিখা সাহায্যে জল এনে আশপাশ সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়ে দিলে, সম্রাটের দলবল অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে, এই উদাহরণ অরবিন্দ পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করলেন।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই আরও গুরুতর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন অমন সহজ সরল পথে এবং সুচারুরূপে হয়নি। বরং সেখানে তারা রক্ত ও অগ্নিপরীক্ষায় পাপমুক্ত হয়েছিল ("the first step of that fortunate country towards progress was not through any decent or orderly expansion, but by a purification of blood and fire")। ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় ফ্রান্সের রক্তবিপ্লবকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন—"এখানে সম্ভ্রান্ত শান্তশিষ্ট নাগরিকের সভা এই পরিবর্তন সাধন করেনি ("It was not a convocation of respectable citizens but the vast and ignorant proletariate ... that blotted out in five terrible years the accumulated oppression of seven centuries") ;

করেছিল অজস্র বিশাল জনতা এবং তারা ভয়াবহ পাঁচ বছরে সাত শতাব্দীর সঞ্চিত অত্যাচার, অনাচার ধুয়ে মুছে ফেলেছিল।

এরপর অরবিন্দর নির্দ্দিষ্ট পন্থার কথা নিয়ে আর আলোচনার অবকাশ নেই। তিনি বিপ্লবী দলের কর্ণধার হয়ে বাঙ্গলায় বসেন ১৯০৬-এ, আর প্রবন্ধটি লেখা ১৮৯৩ সালে, অর্থাৎ অন্ততঃ বারো বছর আগে।

তিনি ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে তোলার জন্য দেশকে প্রস্তুত হবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্টের মতে, অরবিন্দ সারা ভারতবর্ষকে ইংরেজ বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, যাতে একস্থানে বিদ্রোহ দমিত হলে আর-একস্থানে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে পাবে।

বাঙ্গলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তিনি নূতন ধারায় প্রবর্ত্তন করেন। আরাম-কেদারায় বসে, গায়ে একটিও আঁচড় লাগতে না দিয়ে, কেবল ফতোয়া ঝাড়া আর বাৎসরিক বক্তৃতা দিয়ে দেশের স্বার্থরক্ষার কিছুই হবে না; তার ওপর তিনি নিজ আচরণে দেখালেন, স্বার্থত্যাগ করে দেশের সেবা করতে হবে, ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হবে। নিজ স্বার্থ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ যে ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়, সে-কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন।

তাঁর সহকর্ম্মীরা বুঝতে পেরেছিল, এর পরের স্তর নির্য্যাতন, যেখানে জেল, জরিমানা ভোগ করা থেকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দান করতে হবে। সাহসী মন চাই, যা অকাতরে সকল বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে পৌঁছে দেবে। হয়তো নিজ জীবনে পূর্ণ না-হবার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু বর্ত্তমানের আদর্শে ভবিষ্যৎ "সন্তানদল" গড়ে উঠবে, যাবা ত্যাগ, শৌর্য্য, বীর্য্য, নিষ্ঠা, সেবা দ্বারা নিজেদের যশ ও দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

অরবিন্দর নিজের ভাষায়—"আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য।"

অরবিন্দই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করে বলেন—"পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া 'স্বরাজ' কথার অন্য অর্থ নেই।" সখারাম গণেশ দেউস্কর "স্বরাজ" শব্দটি সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেন এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজি সভাপতিরূপে সেটি গ্রহণ করেন; কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ তখন সাহস করে কেউ বলেনি। এটা অরবিন্দর জন্য তোলা ছিল; "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা সে-বাণী প্রচার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্ত্তি ও মন্ত্রদান করলেন; বিবেকানন্দ তাতে করলেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা; অরবিন্দ তাঁকে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা করলেন দেশের সামনে।

সমসাময়িক কালে অপর যাঁরা এ-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন অগ্রদূত। প্রকৃতপক্ষে গোড়ার দিকে ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও বন্ধু যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দর দুই বাহুস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। যতীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মাটীতে বিপ্লব-মন্ত্র কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বরোদা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এটা পরম গৌরবের বিষয়।

যতীন্দ্রনাথেব মনে দুটি ভাব অতি প্রবল এবং সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়েছিল। যদি তাঁকে আনন্দমঠের সন্তানদলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে খুব ভুল হবে না। একদিকে সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের প্রতি আসক্তি; আবার দেশপ্রীতি, দেশের পরাধীনতায় বেদনাবোধ—তাঁর জীবনের আর একটা দিক।

তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দ্দেশ ছিল বাঙ্গালীকে কোনও স্থানে সামরিক-বিভাগে স্থান না-দেওয়া। নানা স্থানে চেষ্টা করে তিনি বিফল হন, অথচ তাঁর বিশ্বাস, ইংবেজের সঙ্গে লড়াই কবে তাকে তাড়াতে না পারলে সে বিদায় হবে না। সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য যে উপায়েই হোক সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করতেই হবে। তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় কিছুটা মেলে যখন দেখা যায় তিনি সে-যুগেই একখানা ব্লক্ (Bloch)-লিখিত *Modern Warfare* (আধুনিক যুদ্ধপ্রকরণ) সংগ্রহ করেছিলেন, যেটা থেকে বারীন্দ্র কর্ত্তৃক 'বর্ত্তমান রণনীতি' বইখানা লেখা হয়। আলিপুর বোমার মামলায় তাঁকে ব্লক্-লিখিত বইখানা কাছে রাখার জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তিনি সেনাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং বইখানি তাঁর অধিকারে রাখা তত দোষাবহ মনে না হওয়ায় তিনি নিষ্কৃতি পান।

বাঁকিপুর ও এলাহাবাদে (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "কায়স্থ পাঠশালা"য়) শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি উপযুক্ত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় এবং কি উপায়ে সেনাবিভাগে ঢুকতে পারেন, তার অনুসন্ধান হ'ল তাঁর সর্ব্ব-প্রধান প্রচেষ্টা। বরোদায় এক প্রভাবশালী বাঙ্গালী আছেন, তাঁর দ্বারা কিছু সুবিধা হতে পারে, এই মনে করে ১৮৯৯ সালে সেখানে এসে উপনীত হন। তিনি যাঁর সন্ধানে এলেন, তিনি অরবিন্দ ঘোষ। সামরিক বিভাগে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে যতীন্দ্রনাথ অশ্বারোহী (trooper) শ্রেণীতে নিযুক্ত হন।

বরোদায় আসবার পর থেকেই আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা আহরণের জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠেন। বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি এবং আগ্রহের পরিচয় পেয়ে, মাধব রাও যাদব নামে অশ্বারোহী বিভাগের একজন উৰ্দ্ধতন পর্য্যায়ের নায়ক তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করেন।

বরোদায় অরবিন্দর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগে তিনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ তাঁকে

"exceedingly energetic and capable" বলে মনে করলেন এবং ১৯০০ সালে বাঙ্গলায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য, বাঙ্গলায় ছোট ছোট বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং খুঁজে খুঁজে তার সভ্য যোগাড় করা।

কলিকাতায় এসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, পি. মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পি. মিত্র প্রথম হতেই দোস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ সময় "একলা চল রে" নীতি গ্রহণ করে যতীন্দ্রনাথ বন্ধুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন। বারীন কলিকাতা এলে তাঁর পূর্ব্বপরিচিত একজন সহকর্ম্মী পেয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথই বাঙ্গলায় বিপ্লবী ভাবধারা বহন করে এনে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বিপ্লবীসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন, এ কথা স্মরণ করলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

১৯০২ সালে বারীন্দ্র এলেন কলিকাতার হাল-চাল দেখতে; মফঃস্বলেও সামান্য ঘোরাঘুরি করে তিনি বরোদায় ফিরে যান। এরই পরে বারীন (১৯০৪) কলিকাতায় আসেন এবং অল্পকালের মধ্যেই পি. মিত্র, যতীন ও বারীনের মধ্যে মতান্তর হয়। যতীন্দ্রনাথ তিক্ততা এড়াবার জন্য কলিকাতা ছেড়ে চলে যান। প্রকৃতপক্ষে এর পর অনুশীলন বা যুগান্তর—কোনও দলেরই সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না।

সাধারণতঃ যতীন্দ্রের এই পর্য্যন্ত পরিচয় হয়তো বিপ্লবের পথে যথেষ্ট বলে মনে করা যেত। মনটা তাঁর ত্যাগের দিকে ঝুঁকেছিল বেশী, সুতরাং তিনি সন্ন্যাস নিয়ে কার্য্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে বিশেষ বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁকে ভিন্ন ধাতুতে গড়েছিলেন। কলিকাতায় কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে বিপ্লবের কাজের জন্য সারা ভারত, বিশেষতঃ উত্তর ভারত পড়ে রয়েছে; সে কথা তাঁর বিপ্লবী মন একবারও ভোলেনি। আরও একটা বিষয় ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। বরোদায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অরবিন্দর পরামর্শদাতা ঠাকুরসাহেব ইংরেজের বেতনভুক্ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করতে মনোনিবেশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ মনে করলেন, তাঁর যাযাবর জীবনে তিনি এ-কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। তাই লোকে যখন জানলো তিনি কুটিল কর্ম্মপন্থা ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গেলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সে-সময় দেশের মঙ্গলে এই নতুন বিপদসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অরবিন্দ ও বারীনের উপস্থিতিতে গ্রামের ভিটা চান্নায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করে তিনি প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তিনি চলেছেন, আর কেউ সংবাদ না রাখুক, বাঙ্গলার পুলিশ তাঁর পিছন ছাড়েনি; দূর থেকে তাঁর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে। তাদের কথায় জানা যায়, তিনি কলিকাতা ছেড়ে বেরিয়ে প্রথম বছরটা দার্জ্জিলিং ও নেপালের তরাই অঞ্চলে

পরিভ্রমণ করেন। এইখানে বৈপ্লবিক কার্য্যের কোনো প্রচেষ্টা করেছেন বলে সন্ধান পাওয়া যায় না।

পরবৎসর তিনি চলতে শুরু করে প্রথমে যান তিব্বত এবং সেখানে মনে হ'ল যেন জীবনের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। শক্ত করে মন বেঁধে নিয়ে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। পথে যেখানে সামরিক ছাউনি পেয়েছেন, সেখানে তিনি আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তিনি গাড়োয়াল এবং হরদৈ জেলাব নযাশরণ অরণ্যে কিছুদিন কাটিয়ে দেন। এতে এক-বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়।

তৃতীয় বৎসরে, ১৯০৬ সাল নাগাদ তিনি আলমোড়া আসেন এবং সেখান থেকে পঞ্চনদের বিভিন্ন অঞ্চলে পবিক্রমা চালিযে যান। এখানে উগ্রপন্থী বলে পরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবেছেন এরকম বেশ কয়েকজন যুবকের মনে বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন। কিন্তু মন অশান্ত ; বিশেষ কাজ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় আগুন জ্বলে উঠেছে, তার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। মনের দিক থেকেও বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছেন না, কাবণ কতকটা তিক্ততা নিয়ে তাঁকে বাঙ্গলা ছাড়তে হয়েছিল। যাই হোক, ১৯০৭ সালে পুলিশ তাঁকে পেশোয়ারে আবিষ্কার করে। তিন দিন মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করার সঙ্গে সরকারী আদেশে তাঁকে ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়। সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্য-ভঙ্গের প্রচেষ্টা হ'ল তাঁর বিপক্ষে বড় অভিযোগ।

অসুবিধায় পড়লেও তিনি বিশেষ দমে পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পেশোয়ার থেকে ক্যাম্পবেলপুর জেলায় পাঞ্জাসাহেব যান। চলার পথ ; কাজের সুযোগ না পেলেই আবার চলতে আরম্ভ করেন। এর পর এ্যাবোটাবাদ। সেখান থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের জন্য তিনি সেখানে চলে যান। এর মধ্যে কোনও বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিছুদিন কাশ্মীর বাস কববার পর তাঁর পর্য্যটনের এবং হয়তো দেশসেবার নেশা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তিনি কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন এবং অধিকাংশ সময়ই নিজ গ্রামের (চান্না, বর্দ্ধমান) আশ্রমে, কলিকাতা বা তার উপকণ্ঠে বন্ধু, ভক্ত শিষ্যদের আশ্রয়ে কালযাপন করতেন।

যে কোলাহলময় পথ তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তারপর তাঁকে আর সেই আবর্ত্তের মধ্যে দেখা যায়নি। শান্তিময় পরিবেশে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়েছে।

নিবেদিতা

রম্যাঁ রলাঁ অরবিন্দকে স্বামীজির "young friend" (যুবা-বন্ধু) ও "intellectual heir" (ধীঃ-জগতের উত্তরাধিকারী) বলেছেন। কার্য্যক্ষেত্রেও তাই

দেখতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দর প্রভাব অরবিন্দর ওপর বহুলাংশে যে পড়েছিল, তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্বামীজির রাজনীতিভক্ত প্রিয় শিষ্যার সঙ্গে অরবিন্দর গভীর যোগাযোগ হয়েছিল এবং মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর দুজনে একই পথে চলেছেন সম্পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে। এমনকি, অরবিন্দ কলিকাতা ছেড়ে যাবার সময় "কর্ম্মযোগিন্"-এর সম্পাদনার ভার নিবেদিতার ওপর নিশ্চিন্তমনে দিযে যান।

অরবিন্দ যখন বরোদায় ধীরে-সুস্থে বসে, সাধারণের অজ্ঞাতে বললেও চলে, কর্ম্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল ফলাবার জন্যে মাটী তৈরী করছিলেন, তখন নিবেদিতা পুরোদমে বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। তাঁর গুরু তাঁকে কর্ম্মের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আর সেই শক্তিতে তিনি আপন পথে চলেন। বিরোধ বেধেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধারগণের সঙ্গে এবং সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতা রাজনৈতিক যে দলেব সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন, তাতে কেবল অধ্যাত্মবিষয় এবং কতকটা সেবাধর্ম্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারী বিষনজর পড়ার সম্ভাবনা।

বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানী ওকাকুরার দান অসামান্য। নিজেদের দেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের পরিচয় দিয়ে তিনি বাঙ্গালীকে জেগে ওঠবার জন্যে ঘরোয়া আলোচনা, পরামর্শ বা প্রকাশ্য বক্তৃতায় উৎসাহ দিতে ছাড়তেন না। ১৯০০-১৯০১ সালে ওকাকুরা ভারতে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর ধীরে ধীরে ভারতে তাঁর কর্ম্মপন্থা ঠিক করে নেন। জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এধারে ওকাকুরা আবার পি. (প্রমথ) মিত্র ও সরলা দেবীর সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। তার ফলাফল অন্য সময় আলোচনা করার প্রয়োজন হবে।

নিবেদিতার মনে ক্রমে রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করলেও, তিনি তাঁর ধর্ম্মমত ও পথ থেকে বিযুক্ত হননি। স্বামীজির বিরাট ব্যক্তিত্বে বেদ-উপনিষদ-পুরাণের ধর্ম্ম, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার চেষ্টার জন্য দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও সেবার পরামর্শ ও ব্যবস্থা, সমগ্র জাতির মনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য রক্ষা করার আদর্শ-স্থাপন সম্ভবপর হয়েছিল। নিবেদিতা মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ১৯০২ জুলাই ১৮-ই (স্বামীজি দেহরক্ষা করেন ৪-ঠা জুলাই)। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত দেশকে মূর্ত্তিমতী "মাতৃদেবী" বলে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে ভারতবাসীকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা তাঁর ধর্ম্মজীবনের অংশ বলে কাজে নেমে পড়েন। তিনি "অজ্ঞেয়" ব্রহ্মের সন্ধানে কালক্ষেপ করার চেয়ে "প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার সেবা"র পরামর্শ দিলেন তাঁর সহকর্ম্মী, সমধর্ম্মী, অনুরাগী, অনুচরদের মধ্যে।

স্বামীজির মতের অনুকরণে তিনি শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্রবত্তা অনুশীলনের সঙ্গে কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহ দান করলেন ; ঠাকুরঘরে দেবদেবীপূজা ও আরাধনা পরে এলে তত ক্ষতি নেই। দেবপূজা ও তাঁদের উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করা অপেক্ষা মানুষের সেবা অধিক বাঞ্ছনীয়। দেশাত্মবোধের উন্মেষ যাতে যুবকদের মনে সর্ব্বপ্রকারে সম্ভব হয়, তার জন্যে কোনও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাঁর। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা-লাভের জন্য কি করেছে, সেটা বাংলার যুবকদের জানাবার জন্যে তিনি তৎসংক্রান্ত নানা বই সংগ্রহ করে দিতেন। সে সময় যুবচরিত্র গঠন করবার পক্ষে এসকল পুস্তকের মূল্য ছিল প্রচুর।

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গোখেল প্রভৃতি তদানীন্তন দেশবরণ্যে নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে নিবেদিতার এক বিশিষ্ট স্থান হয়েছিল তাঁর পরিবেশের মধ্যে। সেই সময় যখন অরবিন্দর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল, তখন নিবেদিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধ্যানধারণা, কর্ম্মপদ্ধতিকে রূপ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান এবং সেখানে অরবিন্দর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তাঁর আলোচনার সুযোগ ঘটে। তিনি অরবিন্দর 'ইন্দু প্রকাশ'-এ মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। স্বামীজির তিরোধানের পর একজন প্রগতিপন্থী সৎসাহসী উগ্রজাতীয়তাভাবাপন্ন নেতার সঙ্গে পরিচয় উভয়ের জীবনে কল্যাণপ্রদ হয়েছিল। ১৯০২ অক্টোবরের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে বরোদায় উভয়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা চলে।

একটা প্রচলিত মত আছে, নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন বাঙ্গলায় এসে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন কর্ম্মীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য। হয়তো কিছু সত্য এর মধ্যে আছে ; কিন্তু তা নিয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই। বরোদায় বসেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রগতি বদল করবার চিন্তা যে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল, এ কথা অরবিন্দ নিজেই বলেছেন।

নিবেদিতার দান যে কত বিরাট, তার কিছুটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি কায়মনোবাক্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি, তাঁর সন্ন্যাসিনী-জীবন সে-সময় বহুল পরিমাণে দূরে সরে গিয়েছিল। যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ, সভা-সমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সাহায্যে যুব-সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্‌বুদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা—সবই তাঁর কর্ম্ম-তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

অরবিন্দ এসে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার আগে নিবেদিতার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন। ১৯৬৭ জুলাই সংখ্যা "পুরোধা" পত্রিকায় ('স্বপ্ন') যে তথ্য প্রকাশিত হয়, তাই থেকে আমরা পাই: ১৯০২ অক্টোবরে নিবেদিতার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ অরবিন্দ মনে করছিলেন

"এখনও সময় হয়নি"। নিবেদিতা প্রকাশ্যভাবেই বলেন, "আমি আপনার দলে"। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বিপ্লবের বার্ত্তা প্রচার করতেন। নানা কথার পর অরবিন্দ বলেন যে, বিদেশী, বিশেষতঃ আইরিশ মহিলা এবং বহু গণ্যমান্য নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকায় গভর্ণমেণ্ট তাঁকে একটু সমীহ করে চলতো। তাঁর কাজ সম্বন্ধে সব কথা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ আশীর্ব্বাণী দিয়েছিলেন তাঁকে ঃ

"Be thou to India's future son
Mistress, servant, friend in one."

আর তিনি বিপ্লবের কাজে তার পরিচয় রেখে গেছেন। উঁচু মহলে, এমনকি, করদ-নৃপতিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং যাঁকে দিয়ে যতটা কাজ পাওয়া যায় তা আদায় করে নিতেন। "বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা, টাকা দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, আবার বোমা তৈরী শিখবার জন্যে বিদেশে ছেলে পাঠানো, ইত্যাদি কত কি!" তারপর আরও যা ছিল সে-সব কাজে অপর কা'কে-কা'কেও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে তাঁর মত খুব বেশী লোক তখন পাওয়া যায়নি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "এক কথায় বলা যায়, বিপ্লবীদের সাফল্যের মূলে তাঁর দান অপরিসীম।"

সাগ্নিক পূজারী

অরবিন্দ ভারতের রাজনীতির আকাশে উল্কার মত এসে বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে আশ্রমের স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক পরিবেশে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। না-পেরেছিল ইংরেজ রাজশক্তি তাঁকে কারাগৃহে বন্ধ রাখতে, না-পেরেছিলেন ধরে রাখতে তাঁর সহকর্ম্মীরা, যাঁরা আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে দেশোদ্ধার কার্য্যে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭) বলেছিলেন—

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি', করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

তাঁর মতের ধারক ও বাহক ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সব ব্যাপারই জানতেন, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, বিপ্লবের হবিঃ সমিধ যুগিয়েছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সাহস রাখতেন না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন

সখারাম্ গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯-১৯২০), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০)। সংশ্লিষ্ট না হলেও, সরলা দেবী (১৮৭৩-১৯৫০)-র নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। আরও কয়েকটি নাম এসে পড়ে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

✓রাজনীতি-ক্ষেত্রে নরম দল যখন তাঁদের আবেদন, নিবেদন, প্রবন্ধ, বিবৃতি, বক্তৃতামালার ভাষায় কিছু তেজ, কিছু উষ্মা-প্রকাশ বৃদ্ধি করেছেন, তখন অপরদিকে রাজনীতির মোড় ফিরিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা দুটো দিকে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করলেন। প্রথমতঃ, তাঁরা নিলেন দারিদ্র্য, উপেক্ষা, নির্য্যাতন, কৃচ্ছ্রসাধন, চরম ত্যাগের পথ; আর দ্বিতীয়ত নিলেন দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নতুন আয়ুধ—বারুদ বোমা, রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র।

এখন রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রেব কবিতা রূপ নিতে চলেছে। "দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে" আর "এ সব দৈত্য নহে তেমন"; এদের সঙ্গে যুঝতে হলে "অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ"। এসব সুপ্ত মন্ত্র এখন মূর্ত্তি ধারণ করে ভক্তহৃদয়ে ও বাহুতে অমিত শক্তি সংযোজন করেছিল। এঁরা জীবন দিয়ে রচনা করলেন নতুন কাব্য, নতুন গাথা, জীবনের নতুন ধারা। জাতির হতাশ্বাসের মধ্যে এঁরা এনে দিলেন হুতাশনের তেজ, বজ্রের বিক্রম।

এসব নাম বারে বারে আসবে। এঁদের এবং এঁদের শিক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে এলেন আত্মত্যাগ-মহিমায় ভাস্বর দধীচি, দশানন-বিজয়ী রঘুপতি রাঘব, কংস-নিসূদন সুদর্শনধারী মুরারি, গাণ্ডীবী সব্যসাচী, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর, আর কুরুক্ষেত্র সমরের অপরাপর বীরবৃন্দ—অমিততেজা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা প্রভৃতি।

অরবিন্দর সখা ও সচিব রূপে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)-এর কথা বলা হয়েছে। তারপর যাঁরা এলেন, তাঁদের কেবলমাত্র নামগুলি উল্লেখ করা যাক। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১), অবিনাশ ভট্টাচার্য্য (১৮৮২-১৯৫০), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮), উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫-১৯৫০), রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫), কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮), প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) প্রভৃতি। এঁদের কাহিনীতে বাঙ্গলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আবার, রবীন্দ্রনাথের ভাষার এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বলা চলে ঃ

…… তোমা লাগি নহে মান
নহে ধন, নহে সুখ; ……

* * *

.... মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট যাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ....

আর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে

.... "তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্জা সাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জ্জরবে
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।"

নরমপন্থীদের মধ্যেও যাঁরা বিপ্লবীদের অন্ততঃ মনে মনে সমর্থক ছিলেন, তাঁরা প্রকৃতরূপের কল্পনাতেই বলে উঠলেন—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।"

—তোমার রূপ দেখে আমি হৃষ্ট হচ্ছি, অথচ ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠছে।

অতএব এই বিপদসঙ্কুল পথ ছেড়ে তাঁবা "তদেব রূপং" অর্থাৎ শান্ত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। এই দলের মধ্যে তদানীন্তন কালের বহু প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যাঁরা উত্তরকালে কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষ পরিচয় রেখে গেছেন।

"বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা" মাথায় করে নব্যদলটি "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে" বন্ধুর পথে যাত্রা আরম্ভ করলেন, তাই থেকে বিস্ফোরণের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যেতে লাগলো।

সমিতি ও সঙ্ঘ

বাঙ্গলায় নানারকম সমিতি বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বহুকাল হতেই চলে আসছিল, সেগুলি মোটামুটি ধর্ম্ম, শরীর-চর্চ্চা বা সেবা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। জাতীয়তাবাদের কথা এদের মধ্যে ছিল না।

স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হবার সময় থেকে স্বাস্থ্যচর্চ্চা, আক্রমণ-প্রতিরোধে শিক্ষা প্রভৃতিব জন্যে নতুন ধাঁচে সমিতির উদ্ভব। বঙ্গ-বিভাগেব অনেক আগে থেকেই ধীরে ধীবে এই ধরনের কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল এবং ইংরেজ বা ফিরিঙ্গি ও পুলিশের অহেতুক বা অশালীন আচরণেব যথোচিত প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে মন ও দেহ প্রস্তুত কবার কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাঙ্গলা-বিভাগেব আগে তো বটেই, দু'তিন বছর পবেও সশস্ত্র আক্রমণ বা প্রতিরোধেব কথা ওঠেনি। কালের গতিতে এ-চিন্তা ও প্রস্তুতি এসে পড়েছিল। অবশ্য মহারাষ্ট্রের কথা একটু স্বতন্ত্র সে-কথা নানা স্থানে বলা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ দশক থেকে সমিতি-স্থাপনে নূতন ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ-জাতীয় যে খবর পাওয়া যায়, তাতে বাঙ্গলার মধ্যে **আত্মোন্নতি সমিতির** নাম প্রথমেই মনে পড়ে। ১৮৯৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোযার (রাজা সুবোধ মল্লিক পার্ক) ছিল উদ্ভবের স্থান ; পরে ১৩-১ বহুবাজার (বিপিন গাঙ্গুলী) ষ্ট্রীটে উঠে যায়। একেবারে গোড়ার দিকে এর উদ্যোক্তা ছিলেন নিবাবণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চ্চা ছিল প্রধান কার্য্যতালিকা ; আর ১৯০৫ সাল থেকে দস্তুরমত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র দেব, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খাঁটি বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।

সমসাময়িককালে (১৮৯৭) বোম্বাইয়ের বাইবে কাশীতে এক মহরাষ্ট্র বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আরও কোথাও কোথাও হয়তো হয়ে থাকবে, কিন্তু এর সঙ্গে বাঙ্গলার কিছু সম্পর্ক ছিল বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে অপরাপর স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৮৯৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক একটি মারাঠি স্কুল স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ তখন এত মারাঠি কিশোর, যুবক কাশীবাস করতো না, যাতে একটা স্কুল স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। এই থেকে উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

এই ঘটনার পূর্ব্বে তিলক যখন লক্ষ্মৌ আসেন (১৮৯৪), তখন এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যতদূর বোঝা যায়, এঁরা তিলকের সমর্থন লাভ করেছিলেন। তিনি ১৯০০ সালে স্বয়ং কাশী আসেন এবং

ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিয়ে কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরই পরে "চাপেকার ক্লাব"-এর কয়েকজন সভ্য কাশীতে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের ফলে "কালিদাস" নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শুরু হতেই "কালিদাস" যে ভাষা ব্যবহার করে বসলো, তাই থেকে তার মতিগতি বুঝতে কষ্ট হয়নি। এরকম মনে করা ভুল হবে না যে, উত্তরপ্রদেশে এখন থেকে যে বিপ্লবের বেশ উঠেছিল তা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি।

কয়েক মাসের মধ্যে সম্পাদক কে. এ. গুরুজীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং তাঁর নিকট আট হাজার টাকা পরিমাণ জামীন তলব করা হয়। কোনোক্রমে সে-ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেও 'কালিদাস' আর পূর্ব্বের অধ্যায়ে ফিরে যেতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত গো-বীজ টিকা দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় পত্রিকা সরকার কর্ত্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কালে কাশীর কেন্দ্র বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল এবং ১৯০৬ জানুয়ারী ৪-ঠা এক সভায় তিলক স্বয়ং ও তাঁর তিন সহকর্ম্মী উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হতে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও কাশীর কেন্দ্র উভয়ের মধ্যে সেটা দৃঢ়তর করতে সমর্থ হয়।

১৯০২ সালে (চন্দননগর) গোন্দলপাড়ায় বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় এক আলোচনা-সভা স্থাপিত হয়। সে-কালের রীতি অনুযায়ী "সাহিত্য ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা, নৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষাদান" ছিল প্রধান লক্ষ্য। ক্রমে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাকালে এর নাম হয় **গোন্দলপাড়া (চন্দননগর) বান্ধব সম্মিলনী**। ক্রমে যথারীতি "সম্মিলনী"র কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারলাভ করে। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি খ্যাতনামা বিপ্লবীরা "সম্মিলনী"র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "সম্মিলনী"র পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় যে, আলিপুর গোঁসাই-হত্যায় ব্যবহৃত রিভলভার দুইটি প্রতিষ্ঠানের দুই সভ্য বসন্ত ও শ্রীশ সরবরাহ করেন।

ময়মনসিংহের **সুহৃৎ সমিতি**র আবির্ভাবকাল ১৯০০-০১ সাল। প্রথমদিকে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী। এই সমিতির একটু বিশেষত্ব আছে। ১৯০৪ সালে জানুয়ারী মাসে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-সভায় উদ্যোক্তারা 'ফেষ্টুনের' ওপর বড় করে লিখে দিয়েছিলেন "বন্দে মাতরম্"। আর উৎসাহ, হর্ষ, সমর্থন প্রভৃতি জ্ঞাপন করতে সমবেতভাবে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠেছিল চারিদিক থেকে। বহু অনুসন্ধানের পর আমার এ-ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, এইখান থেকেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি সারা বাঙ্গলা কেন, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—জাতীয় সকল ভাব ভাষায় ব্যক্ত করবার জন্যে।

১৯০৫ সালে সরলা দেবী "সমিতি" পরিদর্শনে গিয়ে কর্ম্মীদের "সন্তান" বলে অভিহিত করেন। পরবৎসর অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুবোধচন্দ্র (মল্লিক) সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হলে, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বিপ্লবের ইতিহাসে অনুশীলন সমিতির যোগ্য স্থান দিতে হলে, তার স্বতন্ত্র উল্লেখ না করলে "সমিতি"র পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সঙ্ঘের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত হচ্ছে "অনুশীলন সমিতি"। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলন' থেকে নামটি গ্রহণ করা হয়। সংক্ষেপে বলে রাখা যাক্—প্রারম্ভে এটি ছিল "ভারত অনুশীলন সমিতি", পরে 'ভারত' শব্দ উহ্য হয়ে যায়।

চিংড়িপোতা (স্বাস্থ্য) কেন্দ্র প্রায় একই কালে প্রথমতঃ স্বাস্থ্যচর্চ্চা নিয়েই গঠিত হয়। একটু ছোট পরিসরের মধ্যে এটির উদ্ভবের কথা বললে বোঝা যাবে কত সামান্য সূত্র ধরে অন্যান্য 'সমিতি' গড়ে উঠেছিল। ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য তারতম্য অবশ্যই ছিল। ১৯০৪-০৫ সালে এম্. এল্. (মতিলাল) বোসের সার্কাস কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য সহরে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। মতিলাল বসুর বাড়ী ২৪-পরগণাব হরিনাভি গ্রামে। কলিকাতায় তাঁর "পার্টি" নিয়ে এলে, তিনি নিজ গ্রামে যেতেন এবং স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে খুব মিশতেন আর নানারকম ব্যায়ামের গল্প বলে উৎসাহ দিতেন। "ছেলেরা" মনে করলে "বোসের সার্কাসে" অ-বাঙ্গালী অপরাপর অংশভাগীদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলেরাও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে, তখন তারাও এর কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে। এইভাবে (পুলিশ-দপ্তরে বিশেষ পরিচিত) **চিংড়িপোতা গ্রুপ** গড়ে ওঠে। হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ভূষণ মিত্র প্রমুখ যুবকরা কুস্তির (বিশেষ করে মাটীর কুস্তি) আখড়া গড়ে তোলেন। তারপর হাওয়া-বদলের সঙ্গে সেই আখড়া (প্রায় নামহীন) লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা, বক্সিং, আক্রমণ ও প্রতিরোধাত্মক ব্যায়ামে লিপ্ত হয়ে যায়। যারা হরিকুমার প্রভৃতি "পাণ্ডাদের" সঙ্গিরূপে সে-যুগে আখড়ায় যোগ দিয়েছিল, তারা প্রায় সকলেই বিচারে বা বিনা বিচারে কারান্তরালে স্বল্প বা দীর্ঘকাল জীবন অতিবাহিত করেছে। এইরকম ভাবে অন্যান্য সঙ্ঘও ধীরে ধীরে বিপ্লবাত্মক কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশ করেছে। এই বিবর্ত্তন স্বতঃই হয়েছে, নতুন কোনও আলোচনার প্রয়োজন হয়নি।

ঢাকার **মুক্তি সঙ্ঘ** স্থাপিত হয় ১৯০৫-এ; শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের নাম পত্তন হতেই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একসময় এই সঙ্ঘ বিশেষ পরিচয় লাভ করেছিল; পরে **বি. ভি.** (Bengal Volunteers) নামে খ্যাত হয়ে ওঠে।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় পান্নালাল বসাক **ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব** (United Friends Club)-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ সালে এটি সুপরিচিত

হয়ে ওঠে এবং একসময় পুলিশী অত্যাচার দমনে এই ক্লাবের অংশ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বরিশালের **স্বদেশ বান্ধব সমিতি** স্থাপিত হয় ১৯০৫ আগষ্ট ৮-ই; পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (জমিদার) উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সমিতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পার্টিশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য কমপক্ষে ১৫৯ শাখা জেলার বিভিন্ন স্থানে কাজ চালিয়ে গিয়েছে।

প্রায় কোনও জেলা বাদ যায়নি। ১৯০৬-এ ফরিদপুরে গড়ে উঠেছিল প্রসিদ্ধ **ব্রতী সমিতি**। প্রথমদিকে অম্বিকাচরণ মজুমদার ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। গভর্ণমেণ্ট 'ব্রতী সমিতি'র প্রতাপে একসময় খুবই বিব্রত হয়ে উঠেছিল। কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন মনে হওয়ায় ৬-নং কলেজ স্কোয়ারে এক শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে যাঁরা পরিচালনা করতেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ললিতমোহন ঘোষালের উদ্যোগে ৩৫-নং আহিরীটোলা লেনে গড়ে ওঠে **স্বদেশ সেবক সমিতি** (১৯০৭)। এই বছরই রাণাঘাটে (নদীয়া) **শক্তি সমিতি** স্থাপিত হয়েছিল। ছোট্ট প্রতিষ্ঠান; কিন্তু নানা বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ায় এর কোনও কোনও কর্ম্মী দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছে।

এসকল "পার্টিশন"-এর পরের ঘটনা। কিন্তু একই ধারায় চলেছে বলে আরও কয়েকটি ক্লাব-এর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। মোটামুটি এদের প্রত্যেকটির উপর পুলিশের নজর ছিল এবং বিপ্লব-সংক্রান্ত কাজে কিছু কিছু পরিচয় ছিল। প্রায় সব-ক'টিই কলিকাতায় অবস্থিত।

১৯০৮ মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় **যুবক সমিতি** স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলগুলিকে সম্মিলিত করার চেষ্টা ছাড়া এরা 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' সাড়ম্বরে পালন করতো।

বলরাম বসু ষ্ট্রীট ২৭-নম্বরে ছিল 'এ্যাথেলেটিক ক্লাব' (Athletic Club)। সঙ্গে ছিল হোগলকুড়িয়া লেনে 'রায়বাগান ক্লাব'। জগন্নাথ সেন লেনে 'বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব', মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও কালিদাস সিঙ্গী লেনে 'আখড়া', নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে 'যুবক সমিতি', ছিদাম মুদি লেনে 'মডেল এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশন', কালীঘাটে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সেবক সমিতি', রসা রোডে 'শান্তি শিক্ষা সমিতি', মল্লিক লেনে 'আর্য্য কুমার সমিতি' প্রভৃতি অজস্র সঙ্ঘ বাঙ্গলায় পল্লীতে পল্লীতে গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো নিরীহ কার্য্যকলাপের জন্যে পুলিশের দৃষ্টিপথে পড়তে হয়নি।

আক্রমণাত্মক কার্য্যবিধি কিছু প্রচার না করেও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত

'ডন' পত্রিকা ১৮৯৩ হতেই চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকের শ্রদ্ধা সমাদর লাভ করতে **সমর্থ** হয়েছিল। এই পত্রিকার পরিচালক গোষ্ঠী ১৯০২-তে **ডন সোসায়েটি**র প্রতিষ্ঠা করেন। "মানুষ গড়া" ছিল উদ্যোক্তাদের প্রধান লক্ষ্য। এখানে রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি মনীষীরা বক্তৃতা দিতেন। দর্শন, কাব্য, কলা, সাহিত্য, দেশপ্রেম, দেশবিদেশের জ্ঞান আহরণ, চরিত্রগঠন প্রভৃতি সবই আলোচিত হ'ত। পরে বিপ্লবের অংশভাগী এমন বহু যুবক এখানে শিক্ষা-লাভ, মহাপুরুষদের সঙ্গলাভের জন্য যাতায়াত করতো। অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু দেশের মর্য্যাদা-রক্ষায় প্রয়োজন হলে, অস্ত্র-ব্যবহারে প্রবৃত্তি গড়ে তুলতে 'ডন সোসায়েটি'র একটি বড় স্থান ছিল।

প্রতিষ্ঠানটি নিছক রাজনৈতিক, অবশ্য নামটিতে একটু খোলস দেওয়া ছিল। যাঁরা ১৯০৪-এ গড়েছিলেন **ছাত্র ভাণ্ডার,** তাঁরা প্রায় সকলেই কোনও-না-কোনও কাজের জন্য "সরকারী" নজর এড়াতে পারেননি। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক অত্যল্প কালের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করেছিলেন।

"ভাণ্ডার" একটি ছিল—ব্যবসায়, উপার্জ্জনের দিক দেখাবার জন্য, কিন্তু "ছাত্র"দের আবাসটি ছিল বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষার একটি "আড্ডা"। পরে হলেও, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "শ্রমজীবী সমবায়" একই উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

এ তালিকা আর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। অনেক নামই হয়তো বাদ পড়েছে; সান্ত্বনা এই যে, তারা তাদের কাজ সুসম্পন্ন ক'রে বিনা পরিচয়েই লুপ্ত হয়েছে, নাম-প্রসারে লক্ষ্য না রেখেই অন্তর্হিত হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মফঃস্বলে আরও নানা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, আর সে-খবর স্থানীয় সভ্যদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অরবিন্দর কাছে যখন সে-সংবাদ পৌঁছল, তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্যে 'যুগান্তর' পত্রিকায় বারীনের সহকর্ম্মী দেবব্রত বসুকে নিয়ে ১৯০৮-০৯ সালে বিভিন্ন জেলায় ঘুরতে বেরোন। আখড়া-সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লবের দিগ্‌নির্ণয় ছিল তাঁর অপর উদ্দেশ্য (*Aurobindo on Himself*, p. 31)।

অনুশীলন সমিতি

আগেই বলা হয়েছে, বঙ্গ-বিভাগ যখন হ'ল, তখন দেশে বেশ কয়েকটি 'দল' তৈরী হয়েছে। এদের মধ্যে 'অনুশীলন সমিতি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ব্ব থেকে ইংরেজ সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত নানা পর্য্যায়ে, নানা দলে

'অনুশীলন সমিতি' সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। মূল স্রোত থেকে অনেক শাখানদী বেরিয়েছে, যেমন—শক্তিশালী 'যুগান্তর পার্টি'। কিন্তু আপন স্রোতের ধারা কখনও মাঝপথে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

আনুষ্ঠানিকভাবে কলিকাতায় ১৯০২ সালে স্থাপিত হলেও, তার বৎসরখানেক আগে সতীশচন্দ্র বসু কলেজে ছাত্রাবস্থায় ব্যায়াম, পাঠ, চরিত্রগঠন প্রভৃতি লক্ষ্য করে কয়েকজন যুবক নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি এ-কাজে কলেজের (General Assembly's Institution) কোনও কোনও অধ্যাপকের সহায়তালাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন বেশ গড়ে উঠেছে, তখন মদন মিত্র লেনে আখড়া স্থাপন করেন। পি. মিত্র এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অবগত হলে, সতীশ-চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং 'অনুশীলন সমিতি' পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করে।

প্রাথমিক কর্ম্মীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা উত্তরকালে 'যুগান্তর' দলের প্রতিষ্ঠাবান নেতা বলে পরিচিত হয়েছেন।

✓অনুশীলন সমিতি'র বড় কবে পরিচয় হয়, তার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত শাখার সাহায্যে। ১৯০৫ সালে পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ সফরে গেলে, ঢাকার কর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (৩রা মার্চ্চ, ১৯০৫)। উত্তরকালে প্রচুর খ্যাতিমান পুলিনচন্দ্র (দাস) এই সমিতি পরিচালনা করে এক নব উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। নানা স্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক-সময় তার সংখ্যা পাঁচ-শ'য়েরও বেশী হয়েছিল। কলিকাতায় মদন মিত্র লেন (পরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে) অবস্থিত কেন্দ্র ছাড়া আরও দু'তিনটি কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৩-নং ঈশ্বর ঠাকুর লেনের কেন্দ্র জমিয়ে বসতে পেরেছিল।

তার একটু আগের কথার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে (১৯০১) একটি "আখড়া" প্রতিষ্ঠা করেন আপার সার্কুলার রোড (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ও সুকিয়া ষ্ট্রীটের (কৈলাস বসু ষ্ট্রীট) সংযোগস্থলের কাছাকাছি। সেখানেই প্রথম লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা, ড্রিল, ঘোড়ায় চড়া, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পি. মিত্র মহাশয়কে এ সংবাদ জানিয়ে রাখা হয়। 'প্রথমদিকে তাঁর নিকট কোনও যুবক এসকল বিষয় শিক্ষার সন্ধানে এলে তিনি, "বরোদা থেকে যারা এসে আখড়া স্থাপন করেছে", তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রতিষ্ঠার সময় সমিতির সভ্যতালিকাভুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্র হালদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায়, এচ. ডি. বসু প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। দুটি সংস্থা একযোগে কাজ করাতে এবং যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় ক্রমে যুবকের

দল এসে যোগ দিতে আরম্ভ করে এবং স্বল্পকালের মধ্যে 'অনুশীলন সমিতি' এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়।

পি. মিত্রের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ আবার স্বতন্ত্র হয়ে যান এবং বারীন্দ্র এসে কলিকাতায় অধিষ্ঠিত হবার পর উভয়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। পূর্ব্বে এ পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে।

যতদূর বলা হয়েছে তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, **অনুশীলন সমিতি ঐ** সময় একাই সবাইকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। যারা স্বল্পকাল পরেই 'যুগান্তর দল' বলে পরিচয় লাভ করে, তারা সকলেই এই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে বলে রাখা চলে যে, 'যুগান্তর' স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হবার পরে মফঃস্বলের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি এই দুই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যুগান্তর দল (পুলিশের খাতায় "পার্টি") নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়নি। যখন অবস্থা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তখন কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সংস্থায় ছিলেন সভাপতি পি. মিত্র, সহ-সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পরে বারীন ও তাঁর সঙ্গীরা অনুশীলন সমিতির সভ্য বলেই পরিচিত। কিন্তু কার্য্যক্রম নিয়ে একটু মতভেদ হয়। পি. মিত্র চাইছিলেন শরীরচর্চ্চাকে ভিত ক'রে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারের কথা। বারীন প্রভৃতি একটা দল চাইলে, আর যাহাই হোক, বিপ্লবের চিন্তাধারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, কারণ বহু সহস্র শ্রোতা বা চিন্তাশীলের মধ্যে কয়েকজনকেই মাত্র এ বিপদসঙ্কুল পথে পাওয়া সম্ভব হবে।

সভাপতি বা পরিচালক মহাশয় এতটা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। 'সন্ধ্যা' বেরিয়েছে ১৯০৪ সালে। ১৯০৫ মার্চ্চ পর্য্যন্ত লেখায় ইংরেজের তাঁবে সম-সুযোগ ভোগ করবার কথা ছিল। 'যুগান্তর' প্রকাশিত হ'ল মার্চ্চ ১৯০৬ ; আর 'বন্দে মাতরম্' নভেম্বর মাসে।

এখন চললো "সন্ধ্যা-যুগান্তর-বন্দে মাতরম্" পত্রিকার যুগ। মূল পরিচালক সমিতি বাইরের ঠাট বজায় রাখলেও পত্রিকাগুলির লেখা যে-পথের সন্ধান দিচ্ছিল, তাতে মতান্তরের পথ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। তখনও অনুশীলন ও যুগান্তর এক দল, তবে 'যুগান্তর' পত্রিকা, তার প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মধারায় যারা বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে একটু আলাদা হয়ে পড়াই সম্ভব। "যুগান্তর পার্টি" বলে পরে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও সেটা স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেনি।

উগ্র মতামত যারা পোষণ করতো, তারা ধীরে ধীরে অরবিন্দের পরামর্শ, সাহচর্য্য খুঁজতে শুরু করে দেওয়ায় মূল সংস্থায় একটা চিড় খেয়ে গেল। মিত্রমহাশয় দেখলেন যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একক কর্তৃত্ব তাঁর হাত থেকে সরে যাচ্ছে। অতটা

মারমুখী হয়ে ওঠার মত মন গড়ে তুলতে না পারায়, তিনি পরিচালক থাকলেও, তাঁর অনুশীলনের আদি সভ্যদের কাছেও একটু পিছনে সরে গেলেন।

তারপর হ'ল কার্য্যধারা নিয়ে মতভেদ। তখন দলের যুবকদের মধ্যে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। যারা অরবিন্দ-ভক্ত, তারা কোনও বড় বাধা পেল না। তিনি প্রকাশ্য উৎসাহ না দিলেও পরের অর্থ লুণ্ঠনের ব্যাপারে তাঁর যে খুব বড় আপত্তি নেই, সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের স্পর্শ অনেক "সাধু"কে দলে টেনে এনেছিল; সংগ্রাম-শেষে তাঁরা সন্ন্যাস-গ্রহণে শান্তিলাভ করেন।

এখন অনুশীলনের যুবকদল মনে করতে আরম্ভ করে যে, তাদের ওপর ভীরুতার অপবাদ এসে পড়ছে। সুতরাং তারাও কতকটা এগিয়ে পড়তে লাগলো। বিশেষ করে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পক্ষে আর অলস হয়ে বসে থাকা চলছিল না। তাদের বিবিধ ব্যায়ামের প্রয়োগ-ক্ষেত্র চাই। কিছু কিছু গোলযোগের খবর কলিকাতায় আসতে লাগলো। এই সময় কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ঢাকা সমিতি সম্বন্ধে সমকালীন পুলিশ রিপোর্ট (Mr. Daly) বলে:

"The Dacca Samiti was more rapid in its advance, more businesslike in its organisation and more daring in its deeds, perhaps owing to the fact that a young Bengali in Eastern Bengal is ahead of a young Bengali of West province in natural audacity and physical courage."

সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে এই—ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রসার হয়েছে দ্রুত; প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতায় বিশেষত্ব এবং কার্য্যক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত সাহস বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ হিসাবে মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ বাঙ্গালী ছেলে পশ্চিমের চেয়ে দুঃসাহসিকতায় ও দৈহিক শক্তিতে অনেক এগিয়ে আছে।

এই প্রকৃতিদত্ত ও অর্জিত শক্তি আর যেন বাধা মানতে চাইছিল না। এবং এই কারণেই ঢাকা অনুশীলন সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হয়ে পড়ে। এদিকে "যুগান্তর" পত্রিকাকে ঘিরে পরোক্ষে অরবিন্দ এবং প্রত্যক্ষে যে দল গড়ে উঠলো, তার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় কতকগুলি সাহসিকতাপূর্ণ, বিপজ্জনক ও নাম-করা কাজের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর বোমার মামলা এবং তার মধ্যে নরেন গোঁসাই নিপাতপর্ব্ব যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন প্রমুখ ব্যক্তিরা দলকে আরও সম্ভ্রমযুক্ত করে তোলেন।

একেবারে খুনখারাপি আরম্ভ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পি. মিত্র সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের শিরোমণি ছিলেন। দল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে আর পূর্ণ যোগাযোগ-রক্ষা সম্ভব হচ্ছিল না, যখন ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা

প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট-বড় বহু বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তখন এসকলের একসূত্রতা মিত্র-মহাশয়ের নাম বজায় রেখেছিল, যদিও তিনি এ-সময় প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ক্রমে গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি নতুন আকার ধারণ করলো এবং সমিতিগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখা হতে লাগলো। সভ্যদের পিছনে গুপ্তচর নিয়োজিত হওয়ায় তারা বিব্রত হয়ে পড়লো; অনুশীলন ও যুগান্তর এবং তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি দুটি বড়রকম বিভাগের মধ্যে অবস্থিত হ'ল। একই উদ্দেশ্যে গঠিত বলে পরস্পরের মধ্যে কিছু রেরারেষি থাকলেও তারা একেবারে সম্প্রীতিহীন হয়নি। অন্ততঃ পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য তারা পরস্পরকে সাহায্য করেছে।

একটা কথা চলিত আছে যে, মিত্রমহাশয় কোন সময়ে কোন ভাবে অর্থ-লুণ্ঠন সমর্থন করতেন না। এ কথা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করলেও, সত্যের অপলাপ হয় না। হরিকুমার চক্রবর্ত্তী একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী এবং অনুশীলন সমিতির খুব গোড়ার দিকের সভ্য। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য্যে বিশেষ হৃদয়বত্তা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মিত্রমহাশয়ের স্নেহ ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা লাভ করেন। তাঁর কাছে শোনা,—মিত্র-মহাশয় বলতেন যে, সমিতির সভ্যরা ব্যায়াম, লাঠি, ছোরা, তরবারি চালনায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করছে, কিছু কিছু সাহসের পরিচয়ও দিচ্ছে, কিন্তু তার বেশী আরও কিছু প্রয়োজন। তিনি সে-সময় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করে বোমা তৈরীর কথা চিন্তা করেছিলেন। এ বিষয়ে হরিকুমারের ওপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মিত্রমহাশয়ের নির্দ্দেশে তাঁকে উপযুক্ত গোপনীয় স্থান অনুসন্ধানে বেরুতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে করে তিনি চক্রধরপুরের কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে স্থান নির্ব্বাচন করে মিত্রমহাশয়কে জানালে, তিনি অর্থ-সাহায্য করতে থাকেন। কিছু কাজও এগিয়েছিল। রাসায়নিক মালমশলা নিয়ে সেখানে জমা করা চলছে; মিত্রমহাশয় বেশ আনন্দ প্রকাশ করছেন, উৎসাহও দিচ্ছেন। কিন্তু গভীর জঙ্গলের মধ্যে ভদ্র যুবকরা যাতায়াত করছে—সেটা কাষ্ঠসংগ্রহকারী স্থানীয় লোকের নজরে পড়ে এবং ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়বার উপক্রম হলে, সেখানকার পাট তুলে দিতে হয়।

মিত্রমহাশয়ের আরও এক পরিকল্পনা ছিল। কোনও দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতদলের মাতব্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে কেবল অর্থ-লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতি হয় বটে, কিন্তু দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হবার নেশা তাদের ঠেলে নিয়ে যায়। মিত্রমহাশয় স্থির করেন, এদের কা'কে-কা'কেও ডেকে বলবেন, যাতে ডাকাতির নৃশংসতা বাদ দিয়ে যথাসম্ভব উৎপীড়ন ছেড়ে তারা ডাকাতি করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের মঙ্গলের কথা স্মরণ রাখতে হবে—অর্থাৎ যা-তা ডাকাতি না-করে সরকারী অর্থ লুঠ করতে হবে। লাভের অংশ বেশীর ভাগ তারাই পাবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করে তাদের দেওয়া হবে, সঙ্গে

থাকবে তাঁর নির্ব্বাচিত 'ছেলে' দু'চারজন। এইভাবে ছেলেদের কেবল দুঃসাহসিক মনোভাব গড়ে উঠবে তাই নয়, তারা গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করবার মত কৌশল শিখে নিতে পারবে।

দেশবাসীর, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ঘরে ডাকাতিতে তাঁর আপত্তি ছিল। এই নিয়ে দলের অত্যুৎসাহী যুবকদের সঙ্গে তাঁকে অনেক বোঝাপড়া করতে হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এ-মতেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মনে হয়। যখন (হুগলি জেলায়) বিঘাটি গ্রামে ডাকাতি হয় এবং সমিতির ছেলেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে—এ কথা জানতে পারেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্বস্ত বন্ধুস্থানীয়, প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে সহকর্ম্মী, অরবিন্দর অন্তরঙ্গ, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম সচিব অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী)-কে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, "যাক্, ছেলেরা তাহলে একটা সাহসের পরিচয় দিয়েছে।" স্বামীজিকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, পি. মিত্র শেষের দিকে বহুলাংশে সংঘর্ষের পথ সমর্থন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই ডাকাতি সম্পর্কে তাঁর ২০৯-নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়েছিল।

আলিপুর বোমার মামলা তদানীন্তন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির মধ্যে একটা ছেদ সৃষ্টি করে। অনেক সময় নেতৃত্বের বিরোধ প্রধানতঃ দুই দলকে বিভক্ত করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে মিলনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন বিপ্লবীরা বুঝলো ইংরেজের লিপ্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা এবং সে-সুযোগ গ্রহণ করা উচিত, তখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিলনের আবার একবার চেষ্টা হয়।

বাংলায় যে-সকল গুপ্ত দল গঠিত হয়েছিল, তাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার জন্য নানা ধর্ম্মীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হ'ত। এটা চিরাচরিত রীতি, যেন আনন্দমঠের সন্তানদের কাল থেকে চলে আসছিল। ঠাকুরবাড়ীতে রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গোপন দল (হাঞ্চু পামু হাফ) গঠন করেন, "সেখানে টেবিলের দুই পাশে দুই মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা।" (প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ঃ 'বিপ্লবী যুগের কথা', পৃঃ ২)। শিবনাথ শাস্ত্রীর দল (বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশঙ্কর সুকুল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি) বক্ষোরক্তে প্রতিজ্ঞাপত্র সিক্ত করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির নানা প্রতিজ্ঞা ও প্রক্রিয়া ছিল। আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও

বিশেষ—এই চার দফা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হ'ত। নানা স্তরের ভক্তদের জন্য এইসকল ব্যবস্থা ছিল। "বিশেষ প্রতিজ্ঞা" পর্য্যন্ত খুব কম লোককেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হ'ত কোনও দেব-দেবীর সামনে উপস্থিত হযে। আদিকাণ্ড হয় কলিকাতায় পুলিন দাসের দীক্ষাগ্রহণের সময়। এ বিষয় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর "জেলে ত্রিশ বছর" পুস্তকে (পৃঃ ১৫) লিখেছেন—"পুলিনবাবু পি. মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ প্রণালী এইরূপ ছিলঃ পূর্ব্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, সংযমী হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইত। দেবীর সম্মুখে ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সাজাইয়া, বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসিয়া (বাম হাঁটু গাড়িয়া শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই হাতে প্রতিজ্ঞাপত্র ধরিয়া পাঠ করিতেন।"

অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে চারিত্রশক্তির ওপর বেশ জোর দেওয়া হ'ত। সঙ্গে ছিল নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা-পালন আর বিশেষ করে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি। বিশ্বাসভঙ্গে হত্যাই ছিল প্রধান দণ্ড। এ-কথা 'রিক্রুট' (নূতন সভ্য)-দের বিশেষ করে জানিয়ে দেওয়া হ'ত। এই অপরাধের সন্দেহে পূর্ব্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতির অনেক কর্ম্মীকে চিরতরে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

যুগান্তর দল সংবিধান প্রভৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয়নি ; কার্য্যকারণ পরম্পরায় 'অনুশীলন' থেকে একটু তফাৎ হযে পড়ে। কোনও কোনও সহযোগী দলের মধ্যে শপথগ্রহণের রীতি কিছুটা প্রচলিত থাকলেও মূল যুগান্তর দলের সভ্যদের বাঁধাবাঁধি কোনও শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান ছিল না। যাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে, স্থানীয় নেতারা তাদের ওপর ক্রমে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন, ফলে কর্ম্মীরা যোগ্য স্থান পেয়ে কাজের ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। এদের মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড অনুশীলন সমিতির মত অত নির্ম্মম বা ব্যাপক ছিল না ; নিহত কর্ম্মীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলা চলে।

একদিকে অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে সরলা দেবী নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি। 'সমিতি'র সঙ্গে কোনও সময়েই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না, কিছুটা সংবাদ রাখতেন—এই পর্য্যন্ত। তিনি নিজেই **আখড়া** স্থাপন করেছিলেন। তার প্রথমটি হ'ল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের (বিধান সরণি) **লক্ষ্মী ভাণ্ডার** (১৯০৩)। এটার কতকটা আখড়া, কিছুটা 'ভাণ্ডার' বলে ধরা যেতে পারে, মূলে ছিল একটি মিলনের কেন্দ্র যেখানে দেশসেবকরা এসে মেলামেশা করতে পারে।

কিন্তু সরলা দেবীর আসল পরিচয় হ'ল বালিগঞ্জে (১৯০৪) স্থাপিত স্বাস্থ্য **এ্যাকাডেমী (Academy)**। এইখানে দস্তুরমত আক্রমণ ও প্রতিরোধ প্রণালী,

লাঠি, ছোরা, তলোয়ার পরিচালনা, যুযুৎসু, বক্সিং, ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং প্রথম তিনিই এসব কাজের যোগ্য শিক্ষক মুর্ত্তাজা সাহেবকে নিযুক্ত করেন। বড়-লাঠি-খেলায় তিনি কয়েকটি বিখ্যাত শিষ্য তৈরী করেছিলেন, তার মধ্যে পুলিন দাস অন্যতম।

সরলা দেবী কবে এবং কি-ভাবে ভারত স্বাধীন হবে, সে উপায় চিন্তা করার সঙ্গে যুবকদের মনে শক্তির বিশ্বাস ও বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি "ভারতী"র আষাঢ় সংখ্যার, ১৩১০ সন, ২১৬ পৃষ্ঠায় "বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল" কাহিনী সম্বলিত প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন। আবার কার্ত্তিক সংখ্যায় (পৃঃ ৬৯০) ছাপলেন "কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম"। তার অন্তর্গত ছিল "চাবুক পরিপাক" ও "ঠনঠনের নির্মকি"। প্রথম প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখা ছিল ঃ "আমাদের অভিধানে 'ঘুষি' শব্দ দাঁত-খিচুনি, মুখ-ভ্যাঙানি, গালিগালাজ, লাঠির গুঁতা, ছাতার খোঁচা, চাবুকের আঘাত, প্লীহা-ফাটানো ও বন্যপশু ভ্রমে (মানুষ) শিকার।" আর 'কিল' শব্দ (বাঙ্গালীর দাওয়াই) "আক্রান্তের আত্মরক্ষার ত্রিবিধ উপায়বাচক, যথা—বল, ছল ও কৌশল"। দুই প্রবন্ধেই বাঙ্গালীর হাতে ফিরিঙ্গী (বা শ্বেতাঙ্গ)-র লাঞ্ছনার উদাহরণ দেওয়া হয়। ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, এই "মারের বদলে মার" নীতির প্রচার বাঙ্গালীর বুকে সাহস ও বাহুতে বল এনে দিয়েছে। পূর্ব্বে যখন লাঞ্ছিত হলে "হজম" করে নেওয়া, উপেক্ষা করা, চেপে যাওয়া রীতি দাঁড়িয়েছিল, এখন অপমান-বোধ এসে সে-স্থান অধিকার করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের চিন্তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং নানা ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, অত্যাচারীর কাপুরুষতার সীমা নেই, ঘুরে দাঁড়ালেই "সত্রাসে পথ-কুক্কুরের মত" পালিয়ে যায়। বাঙ্গলার বিপ্লবী-আন্দোলনে এই বলিষ্ঠ চিন্তা ও কার্য্যধারা একটা নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" এই নীতি-প্রচারে শতমুখ হয়ে উঠেছে। "ভারতী"র এই প্রবন্ধদ্বয় "সন্ধ্যা" আবির্ভাবের কিছু আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক সরকারী গুপ্ত রিপোর্ট বলেছে—

"It worked the beginning of an organised expression of the spirit of assertive nationalism in Bengal."

এখানে তাঁর "বীরাষ্টমী"র উল্লেখ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ১৯০৪ সালে তিনি এই "ব্রত"র প্রবর্ত্তন করেন। এ উপলক্ষে প্রদর্শনী হয়েছে, যেখানে নানারকম শক্তির পরীক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হ'ত। তিনি নিজে রঙ্গমঞ্চে অসি ধরে আবির্ভূতা হতেন এবং পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিতেন। সে-যুগে এক মহিলার পক্ষে এ-কাজ অতি সাহসের নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বীরাষ্টমীর গান, "মাতৃভূমি তরে" অকাতরে প্রাণ দান করলে গোলোকে যে স্থান হয়, সে-কথা "ভারতী" (কার্ত্তিক, ১৩১১) জোর গলায় বলেছে।

আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, এইসকল বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানই শুধু বাঙ্গলার বিপ্লব কেন, সকলরকম কল্যাণকর, বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কাজের

কর্ম্মী জুটিয়েছে। "স্বদেশী" আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্য বর্জ্জন, 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায়, এ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসায়েটি, শিল্প-প্রদর্শনী, জাতীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা, "ভলণ্টিয়ার" দল গঠন প্রভৃতি নানা ব্যাপারের ভার এদের ওপর দিয়ে নেতারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। জনপ্রিয় হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সমাজের নানা ক্ষেত্রে স্বামীজি-নির্দ্দেশ-মত সেবাদান মন্ত্র পালন করা ধর্ম্ম বলে গৃহীত হয়েছে। বিশেষতঃ, গ্রামের মধ্যে শক্তিহীনেরা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এদের দিকে চেয়ে থাকতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্ম্ম-দল-নির্বিবশেষে বিপন্নকে উদ্ধার করে, "যোগে যাগে" বহু লোকের সমাবেশে স্বার্থহীন ক্লেশবহুল সেবাদানে এদের জুড়ি পাওয়া যেত না। ১৯০৮ (২-রা ফেব্রুয়ারী) 'অর্দ্ধোদয় যোগ'-এ একটা বিরাট ব্যাপার ঘটেছিল। পুণ্যলোভী গঙ্গাস্নানার্থীর ভিড় ঘাটে ঘাটে এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম্মকুশলতা, ক্লেশ-সহনশীলতা ও আন্তরিকতা সেবার একটা আদর্শ বলে পরিগণিত হয়। এ সম্বন্ধে (আদি ও অকৃত্রিম) 'যুগান্তর' পত্রিকা ৩-রা ফাল্গুন ১৩১৪ (১৯০৮, ফেব্রুয়ারী ১৫-ই) লিখেছিল—"বাঙ্গালীর ছেলেরা মান অভিমান, লোকলজ্জা, বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে যাত্রিগণের সেবা করিতেছে দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ হ'ল। এমনটি আর দেখি নাই। বাঙ্গলার বক্ষে কত অর্দ্ধোদয়, কত সূর্য্যগ্রহণ, কত চন্দ্রগ্রহণ, কত বারুণী তৃতীয়া, কত মহাষ্টমী চলিয়া গেল,—কত লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই মহানগরীর জনকোলাহল বাড়াইয়া চলিয়া গেল, কত নিঃসহায় রমণী, কত পীড়িত যাত্রী, কত শিশুসন্তান অনাহারে কত বিপদে পড়িয়াছে, এতদিন ভ্রাতৃস্নেহে, পুত্রস্নেহে সেই নিঃসহায় যাত্রীকুলকে কেহ ত আর আলিঙ্গন করে নাই ; কলেরায়, বসন্তে কত যাত্রী রাস্তা-ঘাটে পড়িয়া বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইয়াছে, কেহ ত তাহাদের খোঁজখবর নেয় নাই। হাসপাতালের নিষ্ঠুর চিকিৎসকরা পরীক্ষার্থে শবদেহ পাইবে বলিয়া কত উল্লসিত হইয়া থাকিত ; চোর-বদমায়েসের পর্ব্ব বসিত। পুলিসের জুলুমের মাত্রা বাড়িত। কিন্তু এ কি একেবারে যুগ পরিবর্ত্তন !" যাত্রীদের আরও নানা অসুবিধা, বিপদের কথা বলে পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় লিখে চলেছেন—"আজ দেখিলাম শত শত যুবক দিন নাই রাত নাই, এই লক্ষ লক্ষ বিদেশী যাত্রিগণের সেবা করিয়া আনন্দিত হইতেছে।…… কেহ বসিয়া নাই। স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তাররা রোগীর ঘরে ঘরে ঔষধ পথ্য লইয়া দিন-রাত বসিয়া। কর্ম্মক্লান্ত স্বেচ্ছাসেবকরা আহার বিশ্রাম আশা পরিহার করিয়া মৃত গঙ্গাযাত্রীর তীর্থরজঃপূর্ণ পবিত্র দেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য, এই হৃদয়-বিলানো দৃশ্য কত সুন্দর !"

সেবা, সহানুভূতি ও নানাপ্রকার সাহায্য দ্বারা এরা গ্রামের মধ্যে বহু শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিল। কেবল তাদের আদর্শে যুবচিত্ত যে বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল তা নয়, তাদের সঙ্গ পাবার জন্য, তাদের আদেশ পালন করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য

লাভ করবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। ক্রমে, হয়তো অজ্ঞাতসারে, গ্রাম্যনেতাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে বিপদ-আপদের অংশভাগী হযেছে।

ক্রমে বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছিল। গভর্ণমেণ্ট এদের কার্য্যকলাপের ওপর খরদৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে। সরকারী রিপোর্ট (*The Administration of Bengal under Sir Andrew Fraser*, 1903—08, pp. 15-16) এইসকল আখড়া, সমিতি ও ক্লাব সম্বন্ধে বলছে ঃ "In these clubs young men and boys went through a course of physical training, drill and discipline and set to work to train themselves in *lathi* exercise and wrestling. The members of these clubs were called National Volunteers, and the idea seems to have been that they would form a trained body able to resist force with force, and available for purposes of offence and defence." মোট কথা, এসকল ছেলেরা লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি চর্চ্চায় লেগে গিযেছিল এবং মনে হয়েছে প্রয়োজন হলে তারা মারামারি করতে পারবে, শক্তির পরীক্ষা দিতে পারবে।

এদের ভয়ে গভর্ণমেণ্ট তো বিব্রত হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গীরা চীৎকার আরম্ভ করে দিল, যাতে গভর্ণমেণ্ট এদের দমন করে। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় (১৯০৭ আগষ্ট ১৫-ই) পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এক পত্রপ্রেরক লিখলেন—"এই ন্যাশনাল ভলণ্টিয়াররা পথে পথে 'বন্দে মাতরম্' বলে চীৎকার করে বেড়ায়, পাযে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাবার অজুহাতের বা শক্তির অন্ত এদের নেই, বিশেষ করে অপরপক্ষ যদি শ্বেতচর্ম্মধারী হয়। এদের উপদ্রবে (মফঃস্বল) সহরে রাস্তায় বেরুবার সম্ভাবনা নেই (কখন কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে)। অ-ভারতীয়দের পক্ষে এরা দস্তুরমত উপদ্রবের কারণস্বরূপ হয়ে পড়েছে।"

গভর্ণমেণ্ট ছুতো খুঁজছিল। যখন-তখন আখড়ায় হানা দেওয়া, সভ্যদের থানায় ডেকে ভীতিপ্রদর্শন আর অভিভাবকদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারিত হতে লাগলো। (বেশীর ভাগ আখড়া ঝামেলা এড়াবার জন্যে ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করেছে ; অনেকগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে)।

বঙ্গ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আখড়াগুলিতে বৈপ্লবিক যে তোড়জোড় চলতে থাকে তার ফলে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কি-ভাবে সমিতিগুলির ধ্বংসসাধন করতে পারবে। অপেক্ষা ক'রে, ১৯০৯ জানুয়ারী ৫-ই—অনুশীলন সমিতি, ঢাকা ; স্বদেশবান্ধব সমিতি, বরিশাল ; ব্রতী সমিতি, ফরিদপুর ; সুহৃদ সমিতি, ময়মনসিংহ ; সাধনা সমাজ, ময়মনসিংহ, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে সারথী যুবক সমিতি, আকুলা (খুলনা) সমিতি প্রভৃতি বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং বাহ্যতঃ এসকলের বিলোপসাধন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি আরও গোপনীয়ভাবে চলতে থাকে। সমসাময়িক ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সক্রিয় প্রতিরোধ

'বয়কট'

বঙ্গ-বিভাগের সংবাদ পাকাপাকিভাবে প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই যে তীব্র আন্দোলন মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, তার মধ্যে বিদেশী (পণ্য) বর্জ্জন-নীতি অন্যতম। আপামর সাধারণ বাঙ্গালী তাকে 'বয়কট' নামে চালিয়েছে।

'স্বদেশী যুগ' অর্থাৎ ১৯০৫ ও পরের কয়বৎসরের কার্য্যক্রমে বয়কট-নীতি গৃহীত হয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের এক হাতিয়ার রূপে। শোনা যায় (অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৯০৫ নভেম্বর ১০-ই, ধর্ম্মানন্দ ভারতী লিখিত পত্র), ১৭৩০ সাল অর্থাৎ দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও-এর শাসনকালে সপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বতে গুরুপদস্বামী বাস করতেন। তাঁর অগাধ দেশপ্রেম ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি সে-যুগেই বুঝেছিলেন, বিদেশী পণ্যের চাপে দেশের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটবে এবং তার প্রতিকারকল্পে তিনি বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপের নানা জাতির পণ্য বর্জ্জনের সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তখন নিতান্তই একা, অনেকে এটা তাঁর একটা খেয়াল বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে এক বিশিষ্ট সভ্য বিদেশী পণ্য ব্যবহার করার তীব্র নিন্দা করেন বলে শোনা যায়। সুতরাং ১৯০৫ সালে বাঙ্গলার বয়কট-আন্দোলন একেবারে নূতন সৃষ্টি নয়।

বিরোধের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করেছে। বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল ; আর 'বয়কট' এক বিরাট শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হ'ল। ১৯০৫ জুলাই ১৭-ই "G" স্বাক্ষরে অমৃত বাজার পত্রিকা 'বয়কট' সম্পর্কে এক পত্র প্রকাশ করে। তা ছাড়া নিতান্ত অবান্তর হবে না বলে একটা নূতন বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে।

সমকালীন পুলিশ রিপোর্টে বয়কট-আন্দোলনের সঙ্গে টহলরাম গঙ্গারাম নামক এক অ-বাঙ্গালীর নাম দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মজীবন চরিত' (পৃঃ ২৪৪)-এ বলেছেন—"বঙ্গভঙ্গের বিরাট আন্দোলনের পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জনের উগ্র শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন হইয়াছিল। ··· টহলরাম ডেরা-ইসমাইলখাঁর একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তিনি লর্ড কার্জ্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।" তিনি বক্তৃতার মধ্যে ইংরেজের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বর্জ্জনের পক্ষে কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেন। তখনও অন্য নেতৃবর্গ এ-কথা বলা আরম্ভ করেননি। এ-কথার ইঙ্গিত অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে।

বাঙ্গলার দুরবস্থায় ব্যথিত হয়ে সুদূর ডেরা-ইসমাইলখাঁ থেকে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নির্য্যাতনের কাহিনীর সামান্য উল্লেখ করা ন্যায্য বলেই মনে হ'ল।

টহলরাম কলেজ স্কোয়ারে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন এবং তাতে প্রচুর লোকসমাগম হ'ত। তাঁকে পঙ্গু করে ফেলার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি এই গুণ্ডাদের দ্বারা নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন। নর্দ্দমা থেকে ময়লা উঠিয়ে তাঁর দেহে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একদিন তাঁর আঘাত এত গুরুতর হয় যে, তাঁকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা অফিসে নিয়ে, বহুতর শুশ্রূষা করে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর একদিন ঐ স্থানেই তাঁর দেহে-নিক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় কর্দ্দম পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। এত অত্যাচারেও পুলিশ তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি।

এই গুণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল তখনকার পত্রিকায়। ১৯০৫ এপ্রিল ১৫-ই 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা লিখেছে, যে-সকল মুসলমান বা ফিরিঙ্গি গুণ্ডারা টহলরামকে মেরেছিল, তাদের ধরবার কোনোরকম চেষ্টা না করে টহলরামের বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করা হয়েছে। নিরীহ লোকের ওপর বে-পরোয়া আক্রমণ রোধ করতে না-পারায় পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকা দেবার জন্য চেষ্টা অতি বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে করা যেতে পারে। 'সন্ধ্যা' (১৯০৫ এপ্রিল ৯-ই) পত্রিকা থেকে জানা যায়, পাছে টহলরামের বক্তৃতা শোনবার জন্য দারুণ ভিড়ের চাপে অকস্মাৎ কেউ (পার্শ্বস্থিত) পুকুরের জলে ডুবে মারা যায়, সেই কারণেই তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যার শেষ মন্তব্য ঃ "এর চেয়ে হাস্যাস্পদ কাহিনী আর কিছু হতে পারে না।" মহাভারতকার বলেছেন ঃ "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"।

টহলরাম যাই-ই বলে থাকুন, বাঙ্গলার চারিদিকে বয়কট আন্দোলন স্বতঃই মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ জুলাই ১৩-ই 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা লিখেছিল, গভর্ণমেণ্টের মতিগতি যে রূপ গ্রহণ করেছে, তাতে বাঙ্গালীর পক্ষে ইংলণ্ডের পণ্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করাই যোগ্য প্রত্যুত্তর। তা ছাড়া সরকারী বড় কর্ম্মচারী ও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করতে হবে। পরেই, ২১-এ জুলাই লালমোহন ঘোষ দিনাজপুরে এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সরকারী বা সরকার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন—জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত এবং 'অনারারী' (অবৈতনিক) হাকিমের পদ বর্জ্জনের কথা অতি জোরের সহিত বলেন। ২৪-এ জুলাই 'সন্ধ্যা'য় ব্রহ্মবান্ধব ঐ নির্দ্দেশকে "ঠিক পথ" বলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

এখানে প্রত্যক্ষ বিদেশী বর্জ্জনের কথা বলা হ'ল না বটে, কিন্তু লোকের মনোভাব যে কি দাঁড়াচ্ছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের নির্দ্দেশ এসেছিল প্রথমদিকটায় ১৮৯৪ সালে, যখন আমদানী শুল্ক পুনঃসন্নিবিষ্ট হয় এবং ভারতীয় যে শ্রেণীর বস্ত্র ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল, তার ওপর 'উৎপাদন শুল্ক' বসানো হয়। ১৮৯৬-তে ভারতে উৎপাদিত তুলাজাত সকলপ্রকার

দ্রব্যের বস্ত্রই উৎপাদন-শুল্কের আওতায় ফেলা হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে যে মোটা ধুতির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, তাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। রমেশচন্দ্র দত্ত (*Economic History of India in the Victorian Age*, Fifth Edition, p. 543) এই ব্যবস্থার উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কথার মধ্য দিয়ে সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৯১ থেকে 'বঙ্গবাসী' একাদিক্রমে বয়কট প্রচার করে চলেছে।

১৮৯৪ সালের আমদানী শুল্কনীতি গৃহীত হলেই জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। কলিকাতা টাউন হল্-এ রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে ৮-ই মার্চ্চ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নূতন ট্যারিফ বিলের প্রচণ্ড প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় (P. N. Singh Roy : *The Chronicle of the British Indian Association*, p. 90)। বিলাতী বস্ত্রের উপর আমদানী ও দেশী বস্ত্রের উপর উৎপাদন-শুল্ককে উপলক্ষ করে যে আন্দোলন হয়, তাতে বিদেশী বস্ত্র বয়কট করার চিন্তা খুব জোর করে দেখা দেয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হয়নি। মানুষের মন তখনও ভাল করে গড়ে ওঠেনি।

পুরাতন সূত্র ধরে বলা যায়, বয়কট-চিন্তা বঙ্গ-বিভাগের পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করে, সে-কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কে বা কারা এ-প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম উত্থাপন করেছিল, সে-কথা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। যখন মানুষের মন ইংরেজের সুবিচারের ওপর সকল আস্থা হারিয়ে বসেছে, তখন "the idea of a boycott of British goods was started by whom, I cannot say—by several, I think, at one and the same time (Surendra Nath Banerjea : *A Nation in Making*, 1917, p. 176)। তখন হয়তো একই সময়ে বহুজনে একই পথের কথা বলেছে। সুরেন্দ্রনাথের মতে, পাবনায় এক প্রকাশ্য সভায় প্রথম বয়কট সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সেই চিন্তাধারা দাবাগ্নির মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যখন বয়কট-আন্দোলন বাঙ্গলায় সবেমাত্র ভাল করে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন বৃহত্তর জগতে এ-নীতির সম্যক্ প্রয়োগে বিদ্রোহী মন অধিকতর শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করে—চীন ও আমেরিকার বিরোধে। ১৯০৫ মে মাসে আমেরিকা এক চীন-বিতাড়ন (Exclusive Treaty) নীতি গ্রহণ করে। আমেরিকায় ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ী চীনাদের ওপর নবাগত বা আগন্তুক পরীক্ষা-বিভাগ (Emigration Department) প্রবর্ত্তিত অসম্মানকর বিধি-ব্যবস্থার প্রতিবাদে চীনারা আমেরিকার পণ্য বয়কট করে। দৈনিক 'হিতবাদী' ১৯০৫ জুন ৩০-এ লিখেছিল যে, এই একটা "দাওয়াই" আমেরিকাকে 'এক্সক্লুশিভ্ ট্রিটি' (Exclusive Treaty)-কে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে।

এ সংবাদ বাঙ্গালীর নিকট এসে পৌঁছুলে, বয়কটের ফলাফল সম্বন্ধে সঙ্কল্পের

দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। (তখনকার) চীনারা যা পারে, বাঙ্গালীর পক্ষে সে-পদ্ধতি অনুসরণ করা মোটেই কষ্টকর নয় বলে মনে হয়েছিল এবং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হয়েছিল।

সংবাদ-পত্র-পত্রিকা ক্রমেই বর্জ্জনের নীতি প্রচার করতে থাকে। খুব গোড়ার দিকে, ১৯০৫ আগষ্ট ১-লা, ময়মনসিংহের 'চারু মিহির' পত্রিকা লেখে যে, বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে প্রতি বাঙ্গালী মনকে ইংলণ্ডের পণ্য ব্যবহারে স্বতঃই পরাঙ্মুখ করে তুলবে। ২-রা আগষ্ট সংখ্যায় 'বরিশাল হিতৈষী' বলে যে, এই আন্দোলন স্বায়ত্তশাসনের আভাষ দিচ্ছে। বাঙ্গালী এখন বাঙ্গলার বাজারে বিদেশী মাল আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে। পরে ৪-ঠা আগষ্ট 'মিহির ও সুধাকর' (কলিকাতা) দেশবাসীকে বিলাতী পণ্য বর্জ্জন দ্বারা সাচ্চা কাজের পরিচয় দিতে আহ্বান জানায়।

টাউন হল্-এ ১৯০৫ আগষ্ট ৭-ই, বিরাট জন-সমাবেশে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশী পণ্যের বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। টাউন হল্-এর দোতলায় মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী আর একতলায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া ময়দানে সহস্র সহস্র লোক কয়েকটি বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়। এই সভায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশের প্রতিনিধি থেকে অতিসাধারণ দোকান-পসারী, শিক্ষিত, নিরক্ষর, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকল বয়সের, সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। এরূপ জনসমাগম ইতিপূর্ব্বে কোনও সভায় হয়নি। উদ্যোক্তাদের সকল অনুমান ভুল প্রতিপন্ন করে জনসমাগম লক্ষাধিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলিকাতায় সভা হয়ে যাবার পর মফঃস্বলে বহু স্থানে বিরাট সভা হয়েছে। মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলে বাঙ্গালীর মনের অবস্থার একটা ধারণা করা যাবে। ময়মনসিংহের সেরপুর সহরে রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের সভাপতিত্বে ২৭-এ আগষ্ট "বিলাতী" পণ্য বর্জ্জনের নীতি গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে রাণাঘাট সহরে (২৭-এ) জমিদার যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, ২৮-এ কুমিল্লা সহরে মহম্মদ কাজি রিয়াজুদ্দিন, ২৯-এ ময়মনসিংহে বাগেশ্বর পাত্রনবিশ, ৩০-এ ঢাকায় অন্নদাচরণ রায় মহাশয়গণের সভাপতিত্বে, এবং বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রায় সকল জেলায় সভা আয়োজিত হয়েছিল। কোনও কোনও সভায় দশসহস্রাধিক শ্রোতা সমবেত হওয়ার সংবাদ বিরল নয়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র আত্মচরিতে লিখেছেন (পৃঃ ২৩৮)—"এই সঙ্গে (বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে) প্রতিবাদ কার্য্যকরী করিবার জন্য 'সঞ্জীবনী' এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 'সঞ্জীবনী' ইংলণ্ড হইতে যেসকল দ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং তন্মধ্যে যাহা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।" গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সভাপতিত্বে ১৯০৫ বারাণসীতে যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বয়কটের স্বপক্ষে (বিপক্ষতাচরণের লোকের অভাব ছিল না)

বলা হয়—"বিভক্ত বাঙ্গালার বিশেষ অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ যুক্তিসহ ও সমীচীন।"

সর্ব্বশেষ, "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় বয়কট বার্ষিকী উপলক্ষ করে ১৯০৭ আগষ্ট ৬-ই যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে বয়কটের নিগূঢ় তত্ত্ব অদ্ভুতভাবে আলোচিত হয়েছিল। পত্রিকার মতেঃ "৭-ই আগষ্ট ভারতের জাতীয়তার শুভ জন্মদিবস। জাতীযতার অর্থে দুটি জিনিস মনে করতে হবে ; প্রথম—স্বাধীনতার সঙ্কল্প নিয়ে আত্মোৎসর্গ, আর দ্বিতীয়—স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়া। এই হিসাবে যখন আমরা ৭-ই আগষ্ট বয়কট নীতি প্রচার করেছিলাম, তখন কেবল অর্থনৈতিক বিদ্রোহ ঘোষণা করিনি। প্রকৃতই এটা স্বাধীনতা-লাভের কর্ম্মকাণ্ড বলে মনে করেছিলাম। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সত্তা বা স্বয়ংসম্পর্ণতা লাভের প্রচেষ্টা অঙ্গাঙ্গিভাবে অপর জাতীয় স্বতন্ত্রতা লাভ প্রচেষ্টার সহিত জড়িত। সহজেই অনুমান করা যায়, এ দুটি পরস্পরের ওপর নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। এই কারণেই বলতে হয়, ৭-ই আগষ্টই আমাদের স্বাধীনতা জন্মলাভ করেছে।" বয়কট যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের নামান্তর, এ-কথা এখানে স্পষ্ট করেই বলা হযেছে। ভাষান্তরিত করতে গিয়ে প্রবন্ধের মূল ভাবের কিছু ব্যত্যয় হওয়াই স্বাভাবিক। "বন্দে মাতরম্"-এর নিজস্ব ভাষা উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

"The 7th of August was the birthday of Indian Nationalism, and Indian Nationalism means two things, the self-consecration to the gospel of national freedom and practice of Independence. Boycott is the practice of Independence. When, therefore, we declared the boycott on the 7th of August, it was no more economical revolt we were instituting, but the practice of Independence ; for the attempt to be separate and self-sufficient economically must bring with the attempt to be free in every other function of a nation's life, for these functions are naturally interdependent. August 7th, therefore, is a day when Indian Nationalism was born, when India discovered to her soul her own freedom, when we set our feet irrevocably to the only path to unity, the only path to self-realisation. On that day the foundation stone of Indian Nationality was born."

বয়কট সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা মনে পড়ে। এই আন্দোলন উপলক্ষ করে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করে। সুতরাং রাজদ্বারে দণ্ড, পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও সঙ্ঘর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বয়কট আমাদের রণভেরী, ধর্ম্মযুদ্ধের শঙ্খনিনাদ, শত্রুর প্রতি শর-নিক্ষেপ-নির্দ্দেশের সঙ্কেত।

বয়কট কেবল বিদেশী বস্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। নুন, চিনি ও সবরকম

বিলাস-দ্রব্য প্রথম দফায় এসে পড়ে। তালিকা কতদূর বিস্তৃত করা যাবে, এ নিয়ে বহুদিন ধরে তর্কবিতর্ক হয়েছে। বিশেষ করে চিনি-বর্জ্জন নিয়ে নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের মত নিয়ে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার অসিদ্ধ বলে প্রমাণ করা হয়েছে। চারিদিক থেকেই বয়কটের ধূয়া। বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারকারীদের জায়গায় জায়গায় বয়কট বা "একঘরে" হওয়ার সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়েছে ; ধোপা-নাপিত বন্ধ করবার হুমকি দিয়ে "স্বদেশী ব্রতে" টানবার চেষ্টা একটা বড় অস্ত্রস্বরূপ মনে করা যেতে পারে।

স্বদেশী আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রেই ছাত্রদের অংশ ছিল প্রধান। সুরেন্দ্রনাথ তখন শ্রেষ্ঠ জননেতা ; তাঁর রিপন কলেজেই ছাত্রদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ; ক্রমে ব্যাপক হয়ে পড়ে। সকল সভাসমিতিতে ছাত্ররা ভিড় বৃদ্ধি করতো। নেতাদের নির্দ্দেশ সাধারণের মধ্যে পালিত হবার তারাই ছিল বড় কর্ম্মী। সে-কারণে ছাত্রদের ওপর কোপ পড়ে খুব বেশী, কিন্তু তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি।

বিদেশী পণ্য বর্জ্জনকে ঘিরে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর একটা বড় সাহিত্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্য্যায়ে স্বদেশী পণ্যের লোপ ও আর্থিক দুর্দ্দশার বেদনা প্রকাশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্জ্জনের জন্য মন গড়ে তোলা, এবং শেষ পর্য্যায়ে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের নির্দ্দেশ।

বর্জ্জন-আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। কবি কালীপ্রসন্ন গান ধরলেন —

"(ভাই সব) দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে,
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা,
অভাব মোচন পরের হাতে।
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতাম কলার পাতে,
এখন এনামেলে মাথা খেলে,
কলাই করার ব্যবসাতে।"

মনোমোহন বসু প্রাঞ্জল ভাষায় দেশের শিল্পপণ্যে দুর্লক্ষণের কথা প্রকাশ করলেন—

"অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল ;
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল।
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।

* * *

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর
হ'ল দেশের কি দুর্দ্দিন !

* * *

"ছুঁচ সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

ক্রমশঃ মন গড়ে উঠেছে ; বিদেশীব প্রতি বিতৃষ্ণার ভাবের সঙ্গে দেশীয় পণ্যের উপর প্রীতি ও আকর্ষণ ফুটিয়ে তোলাব লক্ষণ পাওযা যাচ্ছে। কাব্যবিশারদ ভিক্ষা চাইছেন ঃ

"এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার,
স্বদেশেব বস্ত্র কর ব্যবহাব,
বিদেশীর কিছু ক'রো না গ্রহণ,
যদি তুল্য তাব দেশে পাওয়া যায়।"

এখন শপথ-গ্রহণের কাল সমুপস্থিত। জড়তা দূর করে মনকে শক্ত করে তুলতে হবে, যাতে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পরের ভূষণ পরের বসন, পরের অশন" ত্যাগ করবো এবং এইটাই

"নব বৎসবে কবিলাম পণ,
ল'ব স্বদেশেব দীক্ষা।"

স্বর্ণকুমারী দেবী শপথ নিচ্ছেন—আর ভিক্ষা করা হবে না, স্বনির্ভরতার শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। 'মহাশূন্য' তাঁর 'সাক্ষী', 'না লব বিদেশী পণ্য' ; অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে, তাতে ক্ষুন্ন হবার কিছু নেই। তার চেয়ে "পরি ছিন্ন দেশী সাজ" নিজেকে ধন্য মনে করবো। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত

"এই আমাদের ধর্ম্ম, এই জীবনের কর্ম্ম,
এই অস্ত্র এই বর্ম্ম আমাদের মুক্তিপথ।"

কবি জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রতিজ্ঞা করছেন ঃ "আজি ভারতের প্রতি জনে জনে, বিদেশের কিছু কিনিব না কেহ,—এ দেশের জিনিস যদি পাই।"

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ঐ সুরে মন বাঁধতে বলেছেন—

"যাব না, আর যাব না ভিক্ষে নিতে
পরের দোরে।
যা আছে অশন বসন তাই খাব
তাই থাকবো প'রে।"

সকল হৃদয় স্পর্শ করে, সাধারণের মনে দেশীয় পণ্যের ওপর প্রেম সঞ্জাত হয় "দীন দুঃখিনী মা যা দিতে পাবেন" তাই নিয়ে পরম আনন্দে থেকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলে বিশ্বাস রেখে চলার পরামর্শে। এ-সম্পর্কে যত গান রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কান্ত-কবির "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায তুলে নে রে ভাই" কবিতার তুলনা নেই। আমাদের মা পবম দুঃখিনী, ভাল করে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আজ তাঁর অন্তর্হিত। কিন্তু—

"সেই মোটা সূতোর সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই।"

বড় পরিতাপ, তাতে আমাদের দগ্ধহৃদয়ে কোনও ছাপ পড়ে না ; আমরা মায়ের স্নেহ-জড়িত অমূল্য রত্ন ফেলে "ওই পরের দোরে ভিক্ষা চাই"। আমাদের সকলের মুখে দেবার মত প্রচুর অন্ন নেই, আর আমরা এমনিই হতভাগা, বুদ্ধিহীন, "তবু তাই বেচে সাবান মোজা কিনে করছি ঘর বোঝাই"। এই দুর্ব্বলতার প্রতিকারকল্পে আমরা

"মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পবের জিনিস কিনবো না, যদি মায়ের ঘরেব জিনিস পাই।"

এরই জুড়ি-গানটি হযতো আরও সুন্দর, আরও হৃদযস্পর্শী। সেখানে বলা হচ্ছে—

"তাই ভাল মোদের মায়ের
ঘরের শুধু ভাত"

কারণ

"ভিক্ষার চেলে কাজ নেই
সে বড় অপমান।"

নিজের ঘরের দিকে তাকাতে হবে, তাতে আরামের সামান্য ব্যাঘাত হতে পারে ; তৎসত্ত্বেও

"মিহি কাপড় পরবো না আর
যেচে পরের কাছে,
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"

প'রে আমি আত্মসম্মানগর্ব্বে সুন্দর হব। তার কাছে যতই মনোমুগ্ধকর নয়নানন্দদায়ক বিদেশী পোশাক পরি, অপর সকল পণ্য ব্যবহার করি, আমি আত্মসম্মানে ক্ষুণ্ণ হয়ে নিজের কাছেই "ছোট" বলে প্রতিপন্ন হব।

মনের বাসনা কার্য্যে পরিণত করার কথা ভাবতে হবে। কবি মুকুন্দ দাস ও মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর আহ্বান "ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর প'রো না" নির্দ্দেশ বাঙ্গলার মা-বোনের হাত থেকে বেলোয়ারী চুড়ির নির্ব্বাসন ঘটিয়েছিল। অমৃতলাল বসু বলছেন—

"তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী
শাঁখের আবার রাখবো মান।"

শান্ত-ধীর, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী, সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা"য় বলাচ্ছেন—"শাঁখা থাকতে (কাচের) চুড়ি পরবো না" আর—বঙ্গনারীদের দেবীর নামে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন, বিদেশী চুড়ি আর ব্যবহার করা চলবে না।

বাঙ্গলার মাতা ভগ্নী জায়া কন্যা বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের শপথ গ্রহণ না করলে কোনও স্থায়ী ফল হবে না। অপরিজ্ঞাত কবি বলছেন—

"মোটা দেশী বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া,
বাঙ্গালিনী বেশে করিব পণ;
লুপ্ত কীর্ত্তি মা'র করিতে উদ্ধার—
সঁপিব সকলে পরাণ মন।"

কবি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন—

"নব অনুরাগে এস তবে বোন
প্রতিজ্ঞা করিব সকলে আজ,
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস
পরিব না আর বিদেশী সাজ।"

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলকে সতর্ক করে বলছেন—"বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই"। কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে অতি কঠোর ব্যবস্থা, তা না হলে এ-দুরবস্থা ঘুচবে না। তাই

"নগরে নগরে জ্বালারে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত,
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।"

মায়ের দৈন্য দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর সেই দৈন্য ঘুচাতে "সন্তান আজ জেগেছে"। পরীক্ষা কঠোর, কিন্তু হৃদয়ে দুর্ব্বলতাকে স্থান দিলে চলবে না। মায়ের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে আমরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হব। বিজয়চন্দ্র মায়ের চরণে প্রার্থনা করছেন—

"প্রেমডোরে তব দৃঢ় করি আজি
রাখ বাঙ্গালীরে বাঁধি মা!
পদতলে দলি বিলাতী বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা!"

নিতান্ত ভোগবিলাসী, দেশের স্বার্থরক্ষায় পরাঙ্মুখ, সরকারী কৃপাপুষ্ট স্বার্থান্বেষী বাঙ্গালী ছাড়া আর-সকলে এই বয়কট-আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল। মারামারি নয়, খুনখারাপি নয়, বিদেশী পণ্য পরিহার করার প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা ইংরেজ বণিক্ তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছিল। "হাতে মারবার" আগে ইংরেজকে "ভাতে মারবার" যে কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাতে যতটা সুফল লাভ করা সম্ভব, সেটা হয়েছিল। তারপর যখন ইংরেজ-শাসনের প্রকৃত রূপ ফুটে বেরুলো, তখন "ভীরু, দুর্ব্বল" বাঙ্গালী ইংরেজকে "হাতে মারবার" হাতিয়ার সংগ্রহ করেছে, দশপ্রহরণধারিণী "মা" একটি একটি করে আয়ুধ সন্তানের হাতে তুলে দিয়েছেন। "বজ্রসমুৎকীর্ণ" ছিদ্রপথে যেমন মণির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব হয়, সেইভাবে বয়কট-সাহায্যে বাঙ্গালী বিদেশী চক্রব্যূহের রন্ধ্র আবিষ্কার করে অভিমন্যুর মত সংগ্রাম করেছে, আর বিদেশী কৌরবকুল ভিতর থেকে শক্তিহীন হয়ে যুদ্ধান্তে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

বললে খুব অতিরঞ্জন হবে না যে, বয়কট যে-সংগ্রাম ঘোষণা করে, তারই উপর কেবল বিপ্লব আন্দোলন নয়, সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ সেই ভিতের উপরেই গড়ে উঠেছে। বঙ্গ-বিভাগ যখন হয়েই গেল, তখন তাকে রদ করবার যেমন চেষ্টা চলতে লাগলো, সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকায় আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে, অন্যদিকে আমরা যে "এক" রয়েছি মনে-প্রাণে সে-দিকটা প্রচারে বিশেষ জোর দেওয়া হ'ল। আর সেই সঙ্গে গঠনমূলক কাজের দিকটাও বেশ শক্তিলাভ করে উঠলো।

রাখীবন্ধন

পার্টিশনের গুজব ভারতে পৌঁছুতেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার সঙ্কল্প গজিয়ে উঠলো। ১৯০৫ সেপ্টেম্বর ২২-এ টাউন হল্-এ এক সভা হয়। গৃহীত প্রস্তাবে স্থির হয় যে, আমাদের ঐক্য ও অভিন্নত্ব রক্ষা করবো (will maintain unity and solidarity) সর্ব্বতোভাবে এবং পার্টিশনের পরে আমরা যে পৃথক হয়েছি এ-চিন্তা জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে দেব না।

পার্টিশনের পর এই ভাবধারাকে রূপ দেবার প্রতীকস্বরূপ জাতিধর্ম্মনির্বিবশেষে হলুদ-রঙের অন্ততঃ তিনটি সূতা বা "রাখী" পরস্পরের হাতে বাঁধবার নির্দ্দেশ দিলেন নেতৃবর্গ। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-বিভাগ নিয়ে যে ভাবপ্রধান চিত্তাকর্ষক বাণী দিলেন, চিরকালের জন্য তা অক্ষয় হয়ে আছে। যে-ভাবে রাখী অনুষ্ঠান পালিত হবে, সেটা "রাখী-সংক্রান্তির ব্যবস্থা" বলে প্রচারিত হয়। তাতে ছিল ঃ

"দিন। এ বৎসর ৩০শে আশ্বিন, আগামী বৎসর হইতে আশ্বিনের সংক্রান্তি।

ক্ষণ। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত।

নিয়ম। উক্ত সময় সংযম পালন।

মন্ত্র। 'ভাই ভাই, এক ঠাঁই,
ভেদ নাই, ভেদ নাই'।

উপকরণ। হরিদ্রাবর্ণের অন্ততঃ তিন সূতা রাখী।

অনুষ্ঠান। হিন্দু-মুসলমান-ক্রীশ্চান বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী অপর বাঙ্গালীর ডান হাতে রাখী বাঁধিতে পারিবেন। অনুপস্থিত ব্যক্তিকে রাখী পাঠাইতে হইলে সঙ্গে মন্ত্রটি লিখিয়া দিতে হইবে।

এই দিবস প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান বিধেয়।"

এই সামান্য অনুরোধ অপরীসীম শ্রদ্ধার সহিত পালিত হয়েছিল। অন্ততঃ লক্ষ লোক স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে ভিড় করেছিল। স্নানের পর রাখীবন্ধনের পালা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই "উৎসবে" অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর, সঙ্গে সঙ্গে গান "বাংলার মাটি, বাংলার জল" সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীরা সকলেই নগ্নপদ, কাহারও কাহারও পরিচ্ছদে অশৌচ-চিহ্ন।

সঙ্গে ছিল রামেন্দ্রসুন্দর-নির্দ্দেশিত অরন্ধন। কিছু বাদ দিয়ে, ঐ দিন প্রায় সকল বাঙ্গালী পরিবারের উনানে আর অগ্নিসংযোগ হয়নি।

"বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়"

"বন্দে মাতরম্" হয়েছিল বাঙ্গালীর তথা সর্ব্বভারতের যোগসূত্র। এই ধ্বনি প্রাণের মিল, কর্ত্তব্যপালনে ঐক্য, চলার পথে সৌভ্রাতৃত্ব প্রমাণ করেছে। অরবিন্দ বলেছেন—"সারা জাতটাকে ইংরেজ ভেড়ার দল বানিয়ে রেখেছিল। সেই ভীরুতা, কাপুরুষতা, মূঢ়তা ও তামসিক অবস্থা থেকে একমাত্র 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি জাগাল প্রাণে নূতন আলো, সাহস ও বীর্য্য।"

১৯০৫-এ "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" গড়ে উঠেছিল—উদ্যোক্তা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। নন্দকিশোর মিত্র প্রথমদিকে সম্পাদক হয়ে কার্য্যপরিচালনা করেন। সম্প্রদায়ের সভ্যরা দল বেঁধে "বন্দে মাতরম্" ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথে পথে জাতীয়তার বার্ত্তা প্রচার করতেন ; সভা-সমিতি, বৈঠক প্রভৃতিতে উপস্থিত থেকে সভ্যরা জাতীয়তার মন্ত্রগ্রহণে লোককে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। এঁদের কার্য্যকলাপ অজস্র লোককে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বদেশী ভাবের বন্যা বাঙ্গালী সমাজকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল ঐ "সম্প্রদায়"। প্রথম বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১২১-১-নং বিধান সরণীতে (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট)। সেখানে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দিগের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে—বিহারীলাল মিত্র, (রায়) যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রভৃতিকে। সভাপতি হলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ (R. G.) কর। যাঁরা ঐ বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন, সে তালিকা দেখলে মনে হয় "সম্প্রদায়" স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ এক অংশ গ্রহণ করেছিল। সভাপতি হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জন সহঃ সভাপতিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন দাশ। বাছাই অপর কয়েকজনকে নিয়ে কার্য্যপরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছিল।

"এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটি"

(Anti-Circular Society)

সমস্ত বাংলা সার্কুলার-জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছিল। কত কর্ত্তা কত সার্কুলার জারি করেছেন তার মাত্র কিছুটার পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ "সার্কুলাব" দ্বারা জাতীয় আন্দোলন বানচাল করতে যে-চেষ্টা হয়েছিল তার প্রতিকার করতে "এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটি" (Anti-Circular Society) সৃষ্ট হয়েছিল ১৯০৫ নভেম্বর ৪-ঠা। রংপুরে ছাত্র-নির্য্যাতনের সংবাদ অর্থাৎ স্কুল হতে বিতাড়ন, শিক্ষালাভের চেষ্টা ব্যাহত করবার জন্য যে পদ্ধতি পালিত হয়েছিল সেটা নিরাকরণ করবার জন্য সমিতির উদ্ভব।

জাপান থেকে খনিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে এলেও, ভবিষ্যৎ আর্থিক সমৃদ্ধির চিন্তা উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়েন রমাকান্ত রায়। লোভনীয় বেতনেও তিনি চাকুরিতে আবদ্ধ থাকতে সম্মত হননি। কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি শচীন্দ্র-নাথ বসুকে সঙ্গী করে এগিয়ে আসেন। সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। সোসায়েটির সভ্যরা ঘাড়ে মোট নিয়ে ফেরি করে লোকের নিকট স্বদেশী পণ্য বিক্রয় করতেন। মৌলভী লিয়াকত আলির নেতৃত্বে যে-সকল যুবক জাতীয় সঙ্গীত গান করে বেড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটির সভ্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বলা বাহুল্য, এ সমিতিকে গভর্ণমেণ্ট বিদ্বেষের চোখে দেখেছে এবং এর প্রচেষ্টা নানা উপায়ে বিফল করতে প্রাণপণ করেছে। এর সভ্যদের ওপর হামলা হয়েছে যেন তাঁরা এ পথ অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন।

"মিলন মন্দির"

(Federation Hall)

স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে একটি "মিলন মন্দির" স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯০৫ অক্টোবর ১৬-ই, বঙ্গভঙ্গের দিন, ২৯৪-নং আপার সার্কুলার (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) রোড-এর মাঠে এক বিরাট জনসভা হয়। উদ্দেশ্য, মিলন-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন। স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হীন অবস্থা নিয়ে দেশমাতৃকার সুসন্তান

আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব করতে আসেন। দাঁড়াবার শক্তি নেই, চেযারে বসিয়ে তাঁকে সভায আনা হয়। সেখানে বঙ্গ-বিভাগের কুফল ব্যাহত করতে প্রত্যেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সভা-শেষে সকলে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে আহূত সভায যোগ দেবার জন্য গমন করেন। এই সভায় ভারতের "জাতীয় পতাকা" প্রথম উত্তোলিত হয।

বিরাট জনসমাগমের মধ্যে অর্থ সংগৃহীত হতে থাকে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবস্থা নিযে, অর্থাৎ সংগৃহীত টাকা প্রথমে কোন্ কার্য্যে ব্যয়িত হবে তাই নিযে নানা মত দেখা দেয। ফলে, শেষ পর্য্যন্ত তখন আর "মন্দির" গড়ে তোলা সম্ভব হযনি। নির্দ্দিষ্ট জমি খালি পড়ে ছিল বহুবৎসর। পরে ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের ঐকান্তিক চেষ্টায় "ফেডারেশন হল্" নির্ম্মিত হযে ১৯০৫-০৬ সালের কল্পনা রূপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

"জাতীয়" শিক্ষা

বঙ্গ-বিভাগ নিযে বিদেশী শিক্ষার কুফলের কথা নতুন করে উঠেছিল। ইংরেজি শিক্ষা কাযেমী হয়ে বসার সঙ্গে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেখলেন যে, ভারতের ঐতিহ্য, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, কলা, অতীত গৌরবের কাহিনী ইত্যাদি সবই ধুয়ে মুছে যাবার উপক্রম হযে উঠেছে। যখন সব "ন্যাশনাল" করবার চেষ্টা হয়েছিল তখনও এ-প্রসঙ্গ যে উত্থাপিত হযেছিল সে-কথা বলা বাহুল্য।

বিদ্রোহী বাঙ্গালী যুবক (ডিরোজিও-র দামাল ছাত্রদল) যখন সব উল্টে-পাল্টে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন তখন প্রাচীনপন্থীর দল পুরাতন সংরক্ষণের চেষ্টা অবশ্যই করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্কিম, অক্ষয়কুমার, গুরুদাস, সতীশচন্দ্র (মুখোপাধ্যায), রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিবর্গ পুরাতনের ভিত্তির ওপর নতুন জ্ঞানের স্পর্শ দিয়ে বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্ত্তন-সাধনে যত্নবান্ হন সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবধারার প্রতিষ্ঠাকল্পে।

জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে "ডন সোসায়েটি"র নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ ঘটাবার জন্যই 'ডন' পত্রিকার জন্ম। প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনাসম্ভারে পত্রিকাখানি পূর্ণ থাকতো। এ বিষয়ে নিবেদিতার একটা খুব বড় অংশ ছিল। ১৯০২ সালে "ডন সোসায়েটি" স্থাপিত হলে, সতীশচন্দ্রের পাশে একদল কৃতবিদ্য যুবক এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে উত্তরকালে শিক্ষাজগতে বিশেষ পরিচয় লাভ করেছিলেনঃ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ) [এঁরা তিনজন একই সময়ে রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন (১৯১৪-১৫)], রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকার। আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

জাতীয় শিক্ষা (প্রসার) পরিষদের (The National Council of Education) উদ্বোধনী সভায় (১৯০৬ আগষ্ট ১৪-ই) সার গুরুদাস বলেছিলেন ঃ

"It may be said that though love of one's own country and own nation is laudable, yet education should not be limited by consideration of nationality, but proceed upon a cosmopolitan basis. This may be true to a certain extent, and so far as it is true the National Council accepts it by providing for incorporation of the best assimilable ideals of western life and thought with our own."

এই যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করে জাতীয় পরিষদ আগেই স্থির করেছিল যে, জাতীয় আদর্শকে প্রধান লক্ষ্য করে দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির শিক্ষাদান ব্যবস্থা করবে। ("The National Council has deemed not only desirable but necessary to resolve upon imparting education on national lines and attaching special importance to a knowledge of the country, its literature, its history and its philosophy.")

পূর্ব্বের বিক্ষিপ্ত চেষ্টাসমূহ বাঙ্গলা-বিভাগ উপলক্ষ্য করে একত্র হবার সম্ভাবনা হয়েছিল। এই কাজে দল-বেদল, উগ্র, মধ্য বা নরমপন্থী সকলেই এসে জুটেছিলেন। আজ সে মহামিলনের কথা মনে করলে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

(পার্ক ষ্ট্রীটে "ভূম্যধিকারী সভা" (Land-holders' Association)-ভবনে ১৯০৫ নভেম্বর ১৬-ই বেলা তিনটার সময় জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যাঁরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বা উপস্থিতির দ্বারা সভার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করেছিলেন তাঁদের নাম দেখলে মনে হয় বঙ্গজননী সত্য-সত্যই রত্নপ্রসবিনী। তালিকা প্রকাণ্ড এবং বাহুল্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিছুটা উল্লেখ না-করে পারা যায় না।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ঃ রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, এ. (আশুতোষ) চৌধুরী, জে. চৌধুরী, কে. এন্. চৌধুরী, লালমোহন ঘোষ, টি. (তারকনাথ) পালিত, মতিলাল ঘোষ, এন্. এন্. ঘোষ, পি. (প্রমথ) মিত্র, এস্. (সত্যেন্দ্র) পি. (প্রসন্ন) সিংহ, এ. এইচ্. গজনবী, নীলরতন সরকার, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বি. (ব্যোমকেশ) চক্রবর্ত্তী, নাটোরের মহারাজা, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সি. আর. দাশ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, ডাঃ এস্. (শরৎ) সি. (চন্দ্র) মল্লিক, মোহিতচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, কবিরাজ

উপেন্দ্রনাথ সেন, পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ সেন, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, এ. এন্. চৌধুরী, মৌলভী আবদুল মজিদ, মৌলভী সামসুল হুদা, রেভারেণ্ড বি. এ. নাগ, রমাকান্ত রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। রাজা পিয়ারীমোহন সভা পরিচালনা করেন।[১]

জাতীয় শিক্ষার আলোচনা চলছে, এবং এই সভা অনুষ্ঠিত হবার এক সপ্তাহ আগে, ১৯০৫ নভেম্বর ৯-ই, কলেজ স্কোয়ারে এক প্রকাশ্য সভায় রমাকান্ত রায় বক্তৃতা দেন এবং সুবোধচন্দ্র মল্লিকের এক লক্ষ টাকা দানের বিষয় উল্লেখ করেন।

মনীষিবৃন্দের ১৫-ই নভেম্বর তারিখের সভায় কার্য্যধারা নিরূপণের উদ্দেশ্যে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাঁদের নির্দ্দেশ ছিল—তিন সপ্তাহের মধ্যে, উঠতি বাঙ্গালী যুবকদের জাতীয়ভাবে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা বিষয়ে কি পথ অবলম্বন সমীচীন সে-বিষয়ে নির্দ্দেশ দেবেন। ("To determine and report within three weeks what should be done to provide on national lines for education, general and technical, of the rising generation.")

এই কমিটির সভ্য নিযুক্ত হয়েছিলেন কয় মহারথী ঃ

গুরুদাস, রাসবিহারী, পিয়ারীমোহন, এন্. এন্. ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, নীলরতন, এ. (আশুতোষ) চৌধুরী, মতিলাল, হেরম্বচন্দ্র (মৈত্র), সুরেন্দ্রনাথ ও এ. রসুল।

১৯০৬ মার্চ ১১-ই এই খসড়া-প্রণয়ন-কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয়। সেই সভায় গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরীর দান পাঁচ লক্ষ আর সুবোধচন্দ্র মল্লিকের এক লক্ষ টাকা গৃহীত হ'ল বলে প্রকাশ করা হয়।

বিরানব্বই জন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক নিয়ে "জাতীয় শিক্ষা সংসদ" (National Council ol Education) গঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, হেমচন্দ্র সেন এম্.বি., কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, গিরীশচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পি. কে. রায়, সেখ মহবুব আলি, সেখ ইব্রাহিম বার-এ্যাট্-ল', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমৃতলাল সরকার, পঞ্চানন তর্করত্ন (ভাটপাড়া), আনন্দচরণ চক্রবর্ত্তী (ঢাকা), তারাকিশোর চৌধুরী এম্.এ. (শ্রীহট্ট), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (রাজসাহী), ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (কুচবিহার), বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরমপুর), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী (ময়মনসিংহ), মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম.এ. (ঢাকা), ক্ষুদিরাম বসু বি.এ., লেঃ কঃ কে. পি. গুপ্ত, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি।

অর্থের সঙ্গতি আরও কিছু হয়েছিল। ময়মনসিংহের সূর্য্যকান্ত আচার্য্য লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। আবার, ময়মনসিংহেরই বিশ্বেশ্বরী দেবী (গৌরীপুর) এক লক্ষ টাকা দান করেন বলে কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মজীবন-চরিতে সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের দান-সম্পর্কিত দলিল ১৯০৬ জুলাই ১-লা রেজেষ্ট্রী করা হয়। সেই প্রসঙ্গে এ-সংবাদও প্রচারিত হ'ল যে, দানবীর তারকনাথ পালিত দশ লক্ষ টাকা দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ; সে-সময় প্রতিষ্ঠানের খরচ চালাবার জন্য মাসিক ছয় শত টাকা করে নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন।

কাজ চলছে। ১৯০৬ জুন ১-লা, ১৮৬০ সালের একবিংশতি আইন (Act XXI of 1860) অনুসারে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" রেজেষ্ট্রীভুক্ত হয়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। বিস্তারিত বয়ান এখানে দেওয়া হ'ল :

"To impart and promote the imparting of Education—literary and scientific, as well as technical and professional—on national lines .... attaching special importance to a knowledge of the country, its Literature, History and Philosophy and designed to incorporate with the best oriental ideal of life and thought the best assimilable ideals of the West and to inspire students with a genuine love for and a real desire to serve the country."

উদ্দেশ্য ও অর্থসঙ্গতি-সমস্যা যখন মিটলো তখন কার্য্যারম্ভের আর বিশেষ বিলম্বর হেতু ছিল না। কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁরা এসে জমেছিলেন তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, সত্যানন্দ বসু প্রভৃতি ছিলেন। ১৯১-১-নং বহুবাজার (বিপিন গাঙ্গুলী) ষ্ট্রীট ভবনে ১৯০৬ আগষ্ট ১৪-ই জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ কার্য্যারম্ভ করে। অরবিন্দ ঐ মাসেই বরোদার সম্পর্ক ছেদ করে কলিকাতায় এসে অধ্যক্ষ হন। সহকারী কর্ম্মসচিব হলেন শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী)।

সাধারণ শিক্ষা, অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ছাড়া, কারিগরী বা প্রযুক্তি (টেক্‌নিক্যাল) বিদ্যার দিকটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কাজেই প্রমথনাথ বসুর অধ্যক্ষতায় ১৯০৬ জুলাই ২৫-এ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল খোলা হয়েছিল। বর্ত্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই "টেক্‌নিক্যাল", পরে "টেক্‌নোলজিক্যাল" নাম বহুদিন জড়িত ছিল। ফলিত বিজ্ঞানের দিকে বেশী জোর দেওয়ার কথা উঠলে, তারকনাথ সেই দিকে বেশী উৎসাহ দেখান এবং তাঁর দানে পুষ্ট হয়ে "সায়েন্স" বা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে যাদবপুর শিক্ষাকেন্দ্র বিশেষ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। তখন রাসবিহারী ঘোষের নগদ দশ লক্ষ ও

তাঁর অন্যান্য দানের পরিমাণ আরও প্রায় দশ লক্ষ টাকা এসে পড়ায়, অর্থকষ্টের লাঘব হয়।

ইংরেজ সরকারের আমলে "জাতীয়" শিক্ষার যে কোনও পবিচয় থাকবে না, উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে নানা বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হবে, উপরন্তু পুলিশের দপ্তরে মার্কা-মারা হয়ে থাকার সম্পর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র এসে জুটেছিল। প্রথম দলের সপ্তম মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েকটি ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

প্রথম বিভাগে দশ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। গুণানুসারে প্রথম তিন জনের নাম যথাক্রমে যতীন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ী, রামেশ্ববপ্রসাদ সিংহ ও জগৎচন্দ্র পাল। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন কুড়িটি ছাত্র। এসব নাম বিচার করলে দেখা যায়, এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উত্তরকালে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং যথারীতি দণ্ডভোগ করেছিলেন।

১৯০৬ সালের জুলাই মাসেব দ্বিতীয় সপ্তাহে পরীক্ষাগ্রহণ এবং ৩০-এ জুলাই পরীক্ষাব ফল ঘোষণা করা হয়।

অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষালযের সঙ্গে খুব বেশীদিন যোগাযোগ রক্ষা কবতে পাবেননি। 'যুগান্তব' পত্রিকাব সঙ্গে পরোক্ষে এবং 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ায়, তিনি ১৯০৭ আগষ্ট ২-বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিন্ন করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন এবং ২১-এ আগষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র থেকে একেবারে বিদায় গ্রহণ করেন।

১৯০৭ আগষ্ট ২০-এ (১৩১৪ ভাদ্র ৭-ই) রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা "অরবিন্দ রবীন্দ্রেব লহ নমস্কার" সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়।

শিল্পোদ্যম

সকল আন্দোলনই হাওয়ায় পরিসমাপ্তি লাভ করেনি। কেবল বর্জ্জনের কথা বলে ছেড়ে দিলে, নিত্য-ব্যবহার্য্য বহু বিষয় গৃহস্থ-সংসার থেকে বাদ পড়ে যায়। সুতরাং দেশে চিরাচরিত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলতে থাকে। যন্ত্রশিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত দক্ষ বিদেশীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ ছিল না, সুতরাং প্রারম্ভে যে বহু চেষ্টা বিফল হয়েছিল সে-কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তথাপি বলতে হয়, সে-সময়ের পক্ষে যতটা করা সম্ভব হয়েছিল সেটাই বিস্ময়কর। ত্যাগ, বিশেষতঃ আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং মানসিক শক্তির পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

বস্ত্রশিল্পের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। পুরাতন তাঁত-শিল্পের উন্নতি ও বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি, মিল্ স্থাপন, জুতা, সাবান, চিরুনি, দিয়াশলাই, চিনি, ছুরি, কাঁচি, প্রসাধন (এসেন্স প্রভৃতি) শিল্পের দিকে কতকটা

অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি কারবারের দিকে কিছুটা কাজ হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ দেবার জন্য সাধারণের সহজ-প্রাপ্য হবে বলে দোকান খোলা হয়েছিল। প্রথম হয় ১৮৯১ সালে, নাম ছিল "স্বদেশী এম্পোরিয়ম"; প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (বিচারপতি) রমেশচন্দ্র মিত্র। তার পরে আসেন রবীন্দ্রনাথ, হ্যারিসন (মহাত্মা গান্ধী) রোডে "স্বদেশী ভাণ্ডার" নিয়ে ১৮৯৭ সালে। ১৯০৬ মার্চ ৩১-এ Overtoun Hall-এ স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী হয়েছিল। "স্বদেশী যুগ"-এ বহুবাজার (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) ষ্ট্রীটে, ১৯০৭-এ জে. চৌধুরী "ইণ্ডিয়ান ষ্টোর" খুলেছিলেন। এর কোনোটাই খুব বেশীদিন টেঁকেনি, তবে পরের যুগের দিক্-সঙ্কেত করে দিয়েছিল।

নানা স্থানে বিশেষ কারণ উপলক্ষ্য করে দেশীয় দ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা হ'ত। যুবকরা ঘাড়ে করে পণ্য এনে হাজির করতেন। কলিকাতার বাইরেও এসকল চেষ্টা চলেছিল। এতে স্বদেশী পণ্যের সঙ্গে পল্লীবাসীর যোগাযোগ স্থাপনে সুবিধা হয়েছিল। কলিকাতায় ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের সঙ্গে যে প্রদর্শনী খোলা হয়, সেটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

অ-পটু যন্ত্রপাতি, অ-দক্ষ কারিগর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞতার অভাবে বহু মূলধনের ক্ষতি করে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা সমানে চলেছে এবং কালের গতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ভারতে বৃহদাকার শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এককালে ভারতের সূতী ও রেশম বস্ত্র ইংলণ্ডে গিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। যন্ত্র, অস্ত্র ও রাজশক্তির সুযোগ নিয়ে বাঙ্গলার শিল্পকে হত্যা করা হয়। এখন আবার ভারতীয় মিল্-বস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানী হচ্ছে। ঐ কালে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ ও ডাঃ নীলরতন সরকারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

দক্ষ শিল্পীর অভাব পদে পদে অনুভূত হয়েছিল। সুতরাং বিদেশ থেকে কারিগরী শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এক সমিতি (The Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education) স্থাপিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানচর্চ্চামূলক সমিতি (The Indian Association for the Cultivation of Science)। এসবের পিছনে ছিলেন রাসবিহারী, নীলরতন, মহেন্দ্রলাল (সরকার), সুরেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র (ঘোষ) প্রভৃতি। বাঙ্গলার কয়েকটি জমিদার-বংশ, বিশেষ করে ময়মনসিংহের গৌরীপুর জমিদারগণের

নাম উল্লেখযোগ্য। এ-কালে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছেন আরও অনেকে। বাহুল্য-ভয়ে তালিকা দেওয়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হ'ল।

যাঁরা প্রথমদিকে এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই দেশে ফিরে শিল্পপ্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালেই প্রথম জাপান ও জার্ম্মানীতে শিক্ষালাভের জন্য যান এস্. (সত্যসুন্দর) দেব। এসে, কলিকাতা এবং মিহিজামে "চীনামাটির" (porcelain) দ্রব্যাদি প্রস্তুত আরম্ভ করেন। পরে হচ্ছেন—এ. এম্. ঘোষ। ইনি জাপান ও আমেরিকা থেকে শিক্ষালাভ করে সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। দিয়াশলাই-শিল্প-শিক্ষার্থে পি. সি. রায় জাপান, জার্ম্মানী ও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন (১৯০৬ সাল)। এসে, "বন্দে মাতরম্" ও "সুন্দরবন" দিয়াশলাই কারখানার সঙ্গে যুক্ত হন। এ. পি. ঘোষও জাপান প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসে (১৯০৬ সাল), মান্দালয়, রেঙ্গুন এবং কোন্নগরে দিয়াশলাই-কারখানায় পরিচালনার ভার গ্রহণ কবেন।

পরে আরও অনেকে গেছেন এবং এসে, কাঁচ, চামড়া, ছাপার কালি, কাপড়ের কল, বাতি, ছাতার বাঁট ও লাঠি, লোহা (ঢালাই ও পাত প্রস্তুত), রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি নানা শিল্পে ছড়িয়ে পড়েন।

জাতির জাগ্রত চেতনা নানা ভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছে, এর মধ্যে সাময়িক উত্তেজনার একটা বড় অংশ ছিল ; কালের গতিতে সকল ক্ষেত্রেই কিছু ভাঁটা পড়ে যায়। কিন্তু স্ব-প্রতিষ্ঠিত হবার যে বাসনা সেটা কিছু প্রকাশ্যে, কিছু অন্তঃ-সলিলা হয়ে বয়েছিল। সকল দিক থেকে ইংরেজের প্রতি বিরোধ একমুখী হয়ে ওঠে। যখন শাসনের অত্যাচারে বাইরের দিকে প্রকাশ স্তিমিত হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে লিখছে সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা ভাবছে, তখন আন্দোলন কত গভীরে প্রবেশ করছে, সে-দিকটা উপেক্ষিত হয়েছিল। তারই অন্তরালে গড়ে উঠেছে গুপ্ত-সমিতি।

চক্রব্যূহ

এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত অসন্তোষ যেটা ধূমায়িত ছিল, বঙ্গভঙ্গের পর সেটি বহ্নিমান হয়ে উঠলো। চারিদিকে প্রচণ্ড আন্দোলন মাথা তুলে উঠেছে। তার ভঙ্গিমাও নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-যুবকদের খটাখটি, বিদেশী মাল চলাচল বা বিক্রী বন্ধ করার চেষ্টা, নতুন স্বদেশী বাজার সৃষ্টি করা, বিদেশীদের প্রতি বিদ্রূপ পরিহাস, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দ্বারা উত্ত্যক্ত করা প্রভৃতি বিদেশীব বিরুদ্ধে মনোভাবের কয়েকটি বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র।

গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। চণ্ডনীতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনসাধারণের ওপবে। তাদের আশা ছিল বালির-বাঁধ-সাহায্যে বন্যা রোধ করবে। আন্দোলনের ভঙ্গীর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের শাসন বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। তার মধ্যে বেশী আক্রোশটা পড়ে ছাত্রদের ওপর। সহানুভূতিসম্পন্ন অভিভাবকরা পরিত্রাণ পাননি। অপরাপর যে-সকল পন্থা অবলম্বিত হযেছিল, তাব রূপের পরিচয় এই-সঙ্গেই দেওয়া হচ্ছে।

"বন্দে মাতরম্" শব্দ-দুটি যে শাসনকর্ত্তাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গে এর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযান চলেছে।

সব ঘটনা বিবৃত করা সম্ভব নয়; সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ছেলেরা চীৎকার করে উধাও, আব পুলিশ এসে লোকের বাড়ী ঢুকে এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে লোক জখম করে চলে গেছে। পথচারী যারা সেই উদ্দাম আক্রমণের সামনে পড়েছে, তাদের দুর্দ্দশার আর সীমা-পরিসীমা ছিল না।

ইংরেজি প্রবচনে বলে—"লাল ন্যাকড়া দেখলে মহিষ ক্ষেপে যায়"। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, কথাটার সত্যতা কিছু কম। কিন্তু "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের কানে প্রবেশ করে সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

ঢালাও এক হুকুম পূর্ব্ববঙ্গ চীফ্ সেক্রেটারীর অফিস থেকে ১৯০৫ নভেম্বর ৮-ই প্রচারিত হ'ল। তার মূল তাৎপর্য্য: প্রকাশ্য সভা আর "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ-স্বরূপ বলা হ'ল যে, এই ধ্বনিতে শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা,—বিটিশ ভারতে এ-হেন অশুভ ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না। সদর রাস্তায় মিছিল চলবে না; বাদ্যধ্বনি, সঙ্গীত নিষেধ।

ব্যক্তি হিসাবে এই শাসনমন্ত্র কেমন-প্রযুক্ত হয়েছিল তার কিছুটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ১৯০৫ নভেম্বর মাসে এক (অশুভ) দিনে ফরিদপুর জেলা-স্কুলের

ছাত্ররা "বন্দে মাতরম্" বলে বেড়িয়েছে। জেলা-শাসকের কাছে সংবাদ গেলে তিনি স্কুলের কর্তৃপক্ষের ওপর হুকুম জারি করলেন যাতে অপরাধী ছাত্রদের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করা হয়।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'ব ১৯০৬ জানুয়ারী ২৪-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বরিশালে বিধুভূষণ নামে এক ভদ্রলোক তাঁর নিজের বাড়ীর মধ্যে "বন্দে মাতরম্" বলেছিলেন। যখন এই ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তখন তিনি নিশ্চয়ই অপরাধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামে মামলা রুজু করা হ'ল। সেদিনে এ গুরু অপরাধে কারও মুক্তি পাবার কথা শোনা যায় না। হয় জেল, নয় জরিমানা, কখনও কখনও উভয় শাস্তি একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

"বন্দে মাতরম্" অনেক নির্য্যাতন কাটিয়ে উঠেছিল, স্বাধীন ভারতের নায়কদের হাতে তার অপমৃত্যু ঘটবে বলে। জলপাইগুড়িতে সরস্বতী পূজা হ'ল; প্রতিমা-নিরঞ্জন ভক্তদের আনন্দের এক অঙ্গ। তদুপলক্ষে মিছিল হতে পারে এবং আনন্দের আতিশয্যে ছেলেরা "বন্দে মাতরম্" বলতে পারে বলে, পুলিশ মিছিল বন্ধ করার আদেশ জারি করে দিলে। উপায়হীন অবস্থায় দেবী ভক্তগৃহে সে-বছর বাস করলেন। ছাত্র-নিপীড়নের যত ফন্দী সরকারী মস্তিষ্কে গজিয়ে উঠেছিল, তার খানিকটা যদি সমস্যা-সমাধানে নিয়োজিত হ'ত তাহলে বাঙ্গলার বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠতে আরও কিছু সময় লাগতো। ঢাকা বিভাগের অস্থায়ী স্কুল-পরিদর্শক (Inspector of Schools) ষ্টেপ্‌ল্‌টন (H. E. Stapleton) কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঢাকা থেকে ১৯০৬ মে ১৯-এ এক পত্রাঘাত করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে পাঁচশ' বার লিখতে হবে—"বন্দে মাতরম্" বলে অযথা সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় বা অবিবেচনার কাজ। ("To copy out five hundred times, 'It is foolish and rude to waste my time in shouting *Bande Mataram*'.")

এতে গায়ের ঝাল মেটেনি। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই ফাঁকি দিতে পারে। সুতরাং বলা হ'ল যে, লেখা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হবে এবং প্রত্যেক ছাত্র যে অপরের বিনা সাহায্যে নিজে লিখেছে সেই একরার (সার্টিফিকেট)-সহ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পত্র সমাপ্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ এইজাতীয় সমস্ত কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে না পারলে স্কুলের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মাধবপাশা (বাখরগঞ্জ)-য় একজন সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের কর্ম্মচারীর সামনে বিলাসচন্দ্র কুঞ্জবিলায়া (?) "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করায় দু'মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

ঐ জেলারই হবিবপুরে বিপিনচন্দ্র গুহ, ললিতমোহন গুহ ও ইন্দ্রচন্দ্র গুহ

"বন্দে মাতরম্" বলার সঙ্গে একজনের কাছ থেকে কিছু বিদেশী নুন ফেলে দেন। বিচারে প্রত্যেকের এক মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

টাঙ্গাইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছেলে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত বক্সী আর জিতেন্দ্রকান্ত বসু উৎসাহভরে "বন্দে মাতরম্" বলেছিল। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা মতে (মন্দস্বভাব ও দুর্ব্বৃত্তপ্রকৃতি) তাদের সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকারে জামিন মুচলেখা দিতে হয়েছিল।

রংপুরে জেলা-স্কুলের তিন ছাত্র "বন্দে মাতরম্" বলায় প্রত্যেকের (১৯০৫ নভেম্বর ১০-ই) তিন টাকা হিসাবে দণ্ড ধার্য্য করা হয়।

বনকাঠিতে যথাক্রমে সাত ও আট বছরের দুই কিশোরকে "বন্দে মাতরম্" বলার অপরাধে পুলিশ টানতে টানতে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে। মামলা দায়ের করা হয়নি বটে, পুনরায় এরূপ "গুরু" অপরাধ করলে দুর্দ্দশা কি হতে পারে সেটা বেশ করে বুঝিয়ে তাদের তখনকার মত মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯০৫ নভেম্বর, বরিশাল বানরীপাড়ার অঞ্চল যেন শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হ'ল। কতগুলি ছেলে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিলে, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। উপরন্তু স্থানীয় লোকদের ওপর চারশ' টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হয়। "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করায় ছেলেদের ধরে বেত মারবার জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টের সামনে তে-কাঠা (whipping triangle) খাড়া করা হয়।

ফকনার (Faulkner) হলেন বরিশাল পুলিশের এ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট। ছোট ছোট ছেলেদের হাত-পায়ের গাঁটের ওপর লাঠি মারবার এক বিশেষ হুকুম তাঁর জারি করা ছিল। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, বাখরগঞ্জের লালবিহারী সেন ঐ সাহেবের নামে নালিশ করলে আসামীর পাঁচ টাকা জরিমানা হয়। আপীলে অবশ্য সে-সাজা মকুব করা হয়েছিল। লালবিহারী 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে মিথ্যা নাম দেওয়ায় আদালতে অভিযুক্ত হন। 'ধমক' দিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

বরিশালে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ীর মধ্যে থেকে "বন্দে মাতরম্" বলাতে গুর্খারা ভিতরে ঢুকে বেদম প্রহার করে প্রস্থান করে।

১৯০৬ এপ্রিল মাসে ঐ জেলার শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের হাতে নির্ম্মম-ভাবে প্রহৃত হন ; ফলে, তাঁর চিবুকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তাঁর অপরাধের মধ্যে, জানা ছিল, তিনি এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটির একজন সভ্য।

ঐ মাসের ১৪-ই বরিশালের ব্রজেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী পুলিশের আক্রমণে মাথায় গুরুতর আঘাত পান।

এরকমভাবে কত নিরীহ লোক প্রহৃত হয়েছেন, তার হিসাব কেউ রাখেনি ;

রাখা সম্ভবও নয়। পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে মানুষের দুর্দ্দশা একেবারে চরম পর্য্যায়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"বন্দে মাতরম্" নিয়ে বরিশাল কন্‌ফারেন্সে যে কাণ্ড হয়, পরে তা বিবৃত হয়েছে।

স্বদেশী পণ্যেব প্রসার রোধ করার নানা পন্থা গৃহীত হয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গে। তার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া হচ্ছে ঃ

ঢাকার চীফ্ সেক্রেটারী লায়ন (P. C. Lyon) ১৯০৫ নভেম্বর ৪-ঠা দেশী-বিদেশী দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়-বিধি নিয়ে এক ইস্তাহার জারি করেন ঃ "তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছেচে যে, 'জনসাধারণ যেন দেশী দ্রব্য ক্রয় কবে এইটা সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা' —এ সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। যার যেমন খুশি দেশী-বিদেশী নির্ব্বিশেষে পণ্য ক্রয় করতে পারবে। যদি কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশী মাল কিনতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে। যদিও এ অপরাধ সদ্য-পুলিশ-গ্রাহ্য (cognisable) নয়, তথাপি শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকায় পুলিশ এ-কাজে বাধা দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট মহলের গোচরীভূত করবে।"

বাখরগঞ্জে কয়েকজন নেতা ১৯০৫ নভেম্বর (১৩১২ কার্ত্তিক ২১-এ) দেশী দ্রব্য কেনবার জন্য এক আবেদন প্রচার করেন। সরকারপক্ষ থেকে হুকুম জারি হ'ল যে, এ আবেদন প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারী মতে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর পণ্য কেনবার নির্দ্দেশ দিতে পারে, অপর কারও এ-বিষয়ে কোনও এক্তিয়ার নেই। আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলবে না ; যা বলা হয়েছে তা পালন করতেই হবে।

মেহেরপুর (নদীয়া)-এ এক ছাত্র একজন বিদেশী বস্ত্র-ক্রেতাকে অনুরোধ করে যেন সে ঐ কাপড় দোকানে ফেরত দিয়ে দেশী কাপড় নিয়ে আসে। সরকারী মতে এটা অপরাধ বলে পরিগণিত হয় এবং মামলায় তার শাস্তির ব্যবস্থা হয়।

মাদারিপুরের মহকুমা-হাকিম (S.D.O.) ব্রিস্কো (Briscoe) ইস্তাহার জারি করলেন যে, পিকেটিং একটা গুরুতর অপরাধ। যদি সরকারী কর্ম্মচারী কাকেও বিলাতী মাল ক্রয় করতে বাধ্য করে, সেটা কিন্তু অপরাধ নয়। ব্রিস্কো-শাসিত এলাকায় দেখা গেল শ্বেতাঙ্গরা বাজারে বাজারে ঘুরে লোককে বিলাতী কাপড়, নুন, চিনি কিনতে বাধ্য করছে। সঙ্গে পুলিশ ঘুরছে এবং এ কাজে খুব উৎসাহ প্রকাশ করছে।

ভোলা (বরিশাল)-য় দুই উকিল মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ও নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত বিলাতী লবণ বিক্রয়ে বাধা দেন। ১৮-ই ডিসেম্বর মামলা রুজু হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। ১৯০৬ জানুয়ারী ৯-ই বিচারের রায়ে প্রথম জনের এক হাজার ও দ্বিতীয়র চারশ' টাকা অর্থদণ্ড হয়।

বিলাতী লবণের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর দেশের ছেলেদের খুব তীক্ষ্ণ নজর পড়ে। ১৯০৬ জুলাই ৭-ই বরিশালের খবর যে, সেখানে পিয়ারীমোহন বসু নামে এক যুবককে বিলাতী নুন ফেলে দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জে ক্রেতা বিলাতী কাপড় কেনবার জন্যে প্রস্তুত। এমন সময় দুর্গাচরণ চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র গুহ আর প্রসন্নকুমার বসু তাতে বাদী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৬ সেপ্টেম্বর ২৪-এ তাঁদের নামে মামলা রুজু হয়েছিল।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ কুড়িগ্রাম (রংপুর) বাজার থেকে ১৯০৬ জুলাই ৮-ই বিলাতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে জীবনকৃষ্ণ দত্ত (মোক্তার), পরেশনাথ রায় ও তাঁর ওড়িয়া পাচক ঈশানের সম্মতিক্রমে কাপড়খানি নিয়ে পুড়িয়ে দেন। সরকারী শাসন এ-অনাচার সহ্য করতে পারে না। বিচার আরম্ভ হ'ল ; জীবনকৃষ্ণর দু'সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস, পরেশের পঞ্চাশ এবং পাচকের ত্রিশ টাকা জরিমানা হয়।

মাত্র ষোলো বছরের ছেলে রাজেন্দ্রলাল সাহা বল্লা (ময়মনসিংহ)-তে এক দোকানে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ে আপত্তি করে। সেখানে দোকানের মালিক ও অপর কয়েকজন রাজেন্দ্রকে ভীষণ প্রহার করে এবং তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। বিচারে ১৯০৬ অক্টোবর ৩০-এ অপরাধীর দু'সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীলে নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল থাকে।

রাজবাড়ী (ফরিদপুর)-তে মোহর মোল্লা তাঁর বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয় বন্ধ করায় পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে বাধ্য হন।

নরসিংদি (ঢাকা)-তে লালু বাদ্যকর ও রাজকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁদের ইজারা-নেওয়া বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয়ে বাধা দেওয়ায় প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা হিসাবে দণ্ড দিতে বাধ্য হন।

নলচিটি (বাখরগঞ্জ)-তে মন্তাজ আলি ও ইয়াকুব আলি বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয়ে আপত্তি করায় প্রত্যেকে এক মাস হিসাবে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

এরকম ঘটনা সংখ্যাতীত হয়েছে। প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দেবার জন্য সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।

ছাত্রদলন

ছাত্রদলন কার্য্যের পরিচয় দেবার আগে—স্কুল, ছাত্র, অভিভাবক, জনসাধারণের ওপর কি পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী কি-ভাবে তা গ্রহণ করেছে, আজ সে-কথা মনে হলে গর্ব্বে প্রাণ ভরে ওঠে। কিছু নমুনা বইয়ের মধ্যে গ্রথিত হয়ে থাক্।

মাদারিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (সভাপতি) এবং পালঙ, তুলাসার, চিকন্দি, লোনসিঙ, কার্ত্তিকপুর, পণ্ডিতসর, গোপালপুর, খালিয়া, বাজিৎপুর, বিঘারি এবং মাদারিপুর—প্রত্যেক স্কুলের নির্ব্বাচিত এক এক জন শিক্ষক-প্রতিনিধি

১৯০৫ নভেম্বর ৫-ই সভায় মিলিত হয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাতে বলা হয় ঃ "যেহেতু আমাদের বিদ্যালয়েব ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে কোনও অশালীন আচরণ করেনি এবং যেহেতু আমরা সর্ব্বসময়ে তাদের বে-আইনী কার্য্যকলাপ বা উচ্ছৃঙ্খলতা শাস্তি দ্বারা রোধ করতে প্রস্তুত, সে-কারণে আমরা ১৯০৫ অক্টোবর ১০-ই তারিখের ১৬৭৯-নং পি.ডি. (ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান ও শাস্তি-ব্যবস্থা) আদেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি এবং আমাদের বিবেকানুযায়ী তা পালন করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।"

দ্বিতীয় এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, শিক্ষকদের স্বার্থ (সম্মান ইত্যাদি) সংরক্ষণের জন্য একটি শিক্ষক-সমিতি গঠিত হউক।

গৃহীত সিদ্ধান্তের বয়ান হতে, ১৬৭৯-নং পি.ডি. আদেশ শিক্ষকদের যে পুলিশী কাজ করবাব নির্দ্দেশ দিচ্ছে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। তখনকার দিনে শিক্ষকদিগের এ মনোভাব যে কত বড় সাহসেব পরিচয়, সে বিষয় আজ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না।

ময়মনসিংহের এক স্কুলের ওপর ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের সরকারী আদেশ জারি করা হয়। সেক্রেটারী অনাথবন্ধু গুহ ১৯০৫ নভেম্বর ১৭-ই লিখিতভাবে জানালেন যে, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ দেবার স্বাধীনতা প্রত্যেক ছাত্রেরই আছে, সে কাজে বাধা দেওয়ার কোনও কারণ তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি।

ছাত্রদলনেব একটা সামান্য অংশেরও পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু কি পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া অযৌক্তিক হবে না। এই ব্যাপার নিয়ে দুর্দ্দান্ত মহাভিমানী ফুলার-এর পদত্যাগ ঘটেছিল। তিনি চাইছিলেন তাঁর এলাকার সমস্ত ছাত্রকে 'ঢিট্' করে রাখবেন। চলছিলও মন্দ নয়। গোল বাধলো সিরাজগঞ্জের বনোয়ারী হাই স্কুল ও ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল নিয়ে। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেননি। ফুলার চাইলেন স্কুলের ছাত্রদের দুর্ব্বৃত্তপনার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় তাদের মনোনয়ন বাতিল করে দিক। সিণ্ডিকেট ঠিক এতটা বশম্বদ হতে পারেনি। অভিমানে তিনি কর্ম্মত্যাগ করলেন। গভর্ণমেণ্ট পদত্যাগ গ্রহণ করে পূর্ব্ববাঙ্গলার উৎপাত সামান্য পরিমাণে হ্রাস করেছিল।

স্পেশ্যাল কন্‌ষ্টেবল

সফল না হলেও, নানাপ্রকার চেষ্টা হয়েছে লোককে নাজেহাল করতে। যেখানে গভর্ণমেণ্টের মনোমত কাজ করতে কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, আইনের প্যাঁচে ফেলতে না-পেরে মানী লোককে অপদস্থ করবার জন্যে "স্পেশ্যাল কন্‌ষ্টেবল" করে হয়রান করতে কোনও কুণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়নি। একটা নমুনা দেওয়া যাক্ ঃ

রংপুরে লাটবাহাদুর আসবেন খবর হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারী আর রাজভক্তমহলে সোরগোল পড়ে গেল—রাজপ্রতিনিধিকে মানপত্র-দানে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটি হ'ল এ-কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র। আবহাওয়া আলোচনা করে বোঝা গেল, ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না।

রংপুর থেকে ১৯০৫ নভেম্বর ১৫-ই কলিকাতায় খবর আসে যে, তথাকার জেলা-শাসক এমার্সন (Emerson) ক্ষেপে গেছেন, কারণ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ছোটলাটকে যে মানপত্র দেবার কথা হচ্ছিল তাতে কোনও কোনও লোক আপত্তি করেছেন। তাঁরা তো বটেই, যাঁরা তাঁদের সহকর্ম্মী ও "স্বদেশী" ভাবধারার সমর্থক নানা বয়সের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত এইরকম পঁচিশজনকে স্পেশ্যাল কন্‌ষ্টেবল করে দেওয়া হয়েছে।

এঁদের কার্য্যতালিকার মধ্যে, কোমরে পুলিশ-বেল্ট (belt) এঁটে খাটো লাঠি হাতে নিয়ে দীর্ঘ প্যারেড করা, পুলিশ-কর্ত্তাদের হুকুমে যেখানে-সেখানে হাজিরা দেওয়া, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা. পুলিশের অনভিপ্রেত কাজ রোধ করা (তার মধ্যে বিদেশী বর্জ্জন ও 'স্বদেশীর' পক্ষে বলা) হ'ল তাঁদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

এমার্সন এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁদের কার্য্যকলাপ সর্ব্বরকমেই অশোভন ("their conduct was unseemly") ; এঁদের মধ্যে কারও কারও বক্তৃতায় আলোচ্য বিষয় (সম্ভবতঃ 'স্বদেশী') তাঁর কানের পীড়া উৎপাদন করেছে। যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মানপত্র-প্রদানের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন তাঁদের "অপরাধ" বুঝতে কষ্ট হয় না। রাজদ্রোহ বলে আদালতে টেনে নিয়ে গেলেও চলে যেত।

প্রবীণ ও প্রখ্যাত উকিল, রাজানুগত্যের তক্‌মা (Coronation certificate)-ধারী, মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান উমেশচন্দ্র গুপ্ত, কমিশনার ও উকিল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং সতীশচন্দ্র রায়, ভাইস-চেয়ারম্যান ও উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এষ্টেটের ম্যানেজার, ধর্ম্মশালার সভাপতি ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বরদাপ্রসাদ বাগচি, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার রাধারমণ মজুমদার, উকিল ও মহোমেডান এসো-সিয়েশন (Mahomedan Association)-এর যুগ্ম-সম্পাদক মৌলভী আসফ খাঁ মিলে সকলেই মানপত্রের বিরোধিতা করেছিলেন।

এঁদের সঙ্গে "দণ্ড"-ভোগে বাধ্য হন—ব্যারিষ্টার ও রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, উকিল ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, 'রংপুর বার্ত্তাবহ'-সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার, মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, "দেশী দোকান"-

পরিচালক ও উকিল উমাকান্ত দাস, মোক্তার বার এ্যাসোসিয়েশন (Muktear Bar Association)-এর সভাপতি হরিশচন্দ্র রায়, লোন্ অফিসের সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ রাজীবলোচন সোম, ইঞ্জিনীয়ার অফিসের ড্রাফ্ট্‌স্‌ম্যান হরিনাথ অধিকারী, উকিল কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী শরৎচন্দ্র মজুমদার ও কেশ্‌রাজ চোপরা, তাজহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র ঘোষ, জমিদার মন্মথনাথ দাস, রাজা আশুতোষ নাথ এষ্টেটের ম্যানেজার ও মাহিগঞ্জের 'স্বদেশী ভাণ্ডার'-এর সেক্রেটারী সতীশচন্দ্র শিরোমণি এবং আরও কিছু ভদ্রলোক।

এঁদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশের কোমরবন্ধ (belt) ও খাটো লাঠি (baton) ব্যবহার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, ১৬-ই নভেম্বর তাঁদের বিরুদ্ধে হাকিম-সাহেবের আদেশ অমান্য করার জন্যে নালিশ রুজু করা হয়। যাঁরা "পাহারাওয়ালা" নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা ১৯০৫ নভেম্বর ২০-এ সেই আদেশের কবল হতে মুক্তি পান। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তাঁরা হুকুমটা হাকিমের এক্তিয়ার-বহির্ভূত মনে করে হাইকোর্টের মতামতের জন্য আবেদন করেন। ১৯০৬ ফেব্রুয়ারী ২-রা হাইকোর্ট আবেদনকারীদের আপত্তিকে পূর্ণ সমর্থন জানান। যাঁদের কপাল নিতান্ত মন্দ তাঁরা পুলিশ-বেশে পথে পথে চৌকিদারী করে বেড়িয়েছেন এমার্সনের বে-আইনী আদেশ-বলে।

রাজসাহী সহরে জনসাধারণের একটি সভা-আয়োজন-চেষ্টায় রাজসাহীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ও জমিদার কিশোরীমোহন চৌধুরী এম.এ., বি.এল্. ১৯০৫ ডিসেম্বর ১৮-ই জেলা-পুলিশ-সুপারের বাঙ্গলোয় দেখা করতে যান। দু'চার কথার পর পুলিশসাহেব বলে উঠলেন—"চোপ্ রও (ইংরেজী "Hold your tongue")—যদি কোনও সভা অনুষ্ঠিত হয়, গুর্খারা সে সভা ছত্রভঙ্গ করবে।" বলা বাহুল্য, সে সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

প্রকাশ্য স্থানে "স্বদেশী" সভা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯০৫ ডিসেম্বর ১৭-ই রাজসাহীতে একটু বড় রকমের ঘরোয়া বৈঠক চলছে। পুলিশ সন্ধান পেয়ে সেখানে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পুলিশ প্রস্থান করে।

যথেচ্ছভাবে নিদারুণ প্রহার-করা তখনকার পুলিশের কাজ হয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জেলাতেই। সাধারণ লোক বা সম্মানিত ব্যক্তি, কিশোর-যুবকরা, প্রাপ্তবয়স্ক, এমন-কি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এ নির্য্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। গুর্খা আর আসাম থেকে আমদানি-করা সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে সায়েস্তা করার চেষ্টা হয়েছে।

চাঁদপুরে সজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও চিকিৎসক (এল্.এম্.এস্.) ডাঃ শশধর নিয়োগী, বেলকুঠির বসন্ত বণিক প্রভৃতি

বহু সম্ভ্রান্ত লোক আসাম পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। বরিশালে পিকেটিং করার অপরাধে কুলচন্দ্র দে, এবং সুরেশচন্দ্র গুহ সাব্-ইন্সপেক্টরকে গালি দেওয়ায় আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন।

ববিশালের শ্যামাচরণ দত্ত জানুয়ারী ১৯০৬-তে গুর্খা কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হবার পর তাদের বিরুদ্ধে এক নালিশ করেন। মামলার ব্যাপার মাথায় উঠে গেল, নালিশ করবার এক সপ্তাহের মধ্যে সদর রাস্তায় গুর্খারা শ্যামাচরণকে বেদম প্রহার করে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফেলে বেখে চলে যায়। ঐসব ব্যাপারে কোনও প্রতিকার ছিল না।

রংপুর ও বরিশালেব জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণমাত্রার নিজেদের ক্ষমতাব পরিচয় দিয়েছিলেন। বে-আইনী হলেও, তাঁরা ভীতিপ্রদর্শন, শাস্তিদান নিজেদের ইচ্ছামত করে যাচ্ছিলেন। বরিশালের জেলা-হাকিম জ্যাক্ (Jack), স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আছে এই সন্দেহে, ১৯০৫ নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তলব করলেন উঁকিল রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীচরণ সেন, মোক্তার ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনাব কৈলাসচন্দ্র সেন, ব্রাহ্ম মিশনের মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আর 'বিকাশ'-সম্পাদক প্রিয়নাথ গুহকে।

সকলে হাজির হলেন। সাহেব এক জনকে বললেন যে, তাঁর অপরাধ, তিনি উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তাঁর নামধাম গুর্খাদের কাছে দেওয়া হয়ে গেছে। অতএব অন্ততঃ পক্ষকালেব জন্য যেন তিনি সহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কারণ, গুর্খারা তাদের খুশিমত হামলা করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, গুর্খাদের সেই আচরণ উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সকলেরই বিরক্তিকর লাগবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব তার জন্য দায়ী হবেন না, বা তা বন্ধ করতে চেষ্টা করবেন না। অন্য সকলকেও অনুরূপ সুপরামর্শ দান করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, প্রায় সওয়া-শ' গুর্খা বরিশাল সহরে তখন এসে উপস্থিত হয়েছে। দশ-বারোজন করে এক এক দলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, দোকান থেকে যথেচ্ছা মালপত্র তুলে নিচ্ছে ; দাম-দেওয়া তাদের রীতি-বিরুদ্ধ। "বন্দে মাতরম্" বা অন্য কোনও আপত্তিকর লেখা কাগজ যেখানে-সেখানে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সিরাজগঞ্জে পুলিশের অত্যাচার বরিশালের ঘটনার প্রতিচ্ছবি মাত্র। স্বেচ্ছা-সেবকদের বেপরোয়া মার দিয়েছে পুলিশ, প্রতিকার হয়নি কোথাও।

ক্রমশঃ বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে সরকার-বাহাদুর হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কোনও মিছিল চলবে না, এই হ'ল সাধারণ নিষেধাজ্ঞা। বিবাহের বর ও বরযাত্রী দল বেঁধে যায়, অতএব এটা "প্রোশেসন্" বা মিছিল। ঢাকায় একটি সম্পন্ন ঘরে বিবাহ। একদলে কতক লোক যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। অনুমতি

চাইতে গেলে, পুলিশ-সুপার এক ছাড়পত্র দিলেন—১৯০৫ ডিসেম্বর ১১-ই বিবাহের দল যেতে পারে বটে, তবে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হ'ল ঐ মিছিল চলবার সময় "স্বদেশী"-সংক্রান্ত কোনও কথা বা কাজ করা চলবে না ("No acts or words having connection with the *Swadeshi* agitation will be employed while the procession is in progress".)।

ময়মনসিংহের জেলা-হাকিম ক্লার্ক (L. O. Clarke) প্রায় ক্ষিপ্ত। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ রায়ের কাছে ১৯০৫ ডিসেম্বর ১-লা কৈফিয়ত তলব করা হ'ল—লালবাজার রোড থেকে কেন তিনি কতকগুলি দোকান সরিয়ে নেবার আদেশ জারি করেছেন। জেলা-হাকিমের উৎসাহ দেখে মনে করা যেতে পারে যে দোকানগুলি বিলাতী কাপড়, নুন, চিনি বিক্রয়ের জন্য পুলিশ খাড়া করেছিল। শ্যামাচরণ তেড়ে উত্তর দিলেন যে, সদর সড়কের উপর নতুন দোকান স্থাপিত হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতাপ্রয়োগে সেগুলি অপসারিত করা হয়েছে। তাঁর এ ক্ষমতা আছে এবং কমিশনাররা এ কাজ সমর্থন করেছেন। বক্তব্য বোধ হয় ছিল এই—জেলা-শাসকের আরও অনেক কাজ আছে, এ ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

ঐ ক্লার্ক-সাহেব-ই ১-লা ডিসেম্বর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারানাথ বলকে জানাতে চাইলেন যে, ২৪-শে নভেম্বর ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারিপুর ও রংপুরে সরকার-বিদ্বেষী কাজে সমর্থন জানিয়ে যে সভা হয় তাতে তারানাথ বক্তৃতা করেছেন কিনা। উত্তর দিতে হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। উত্তর না পাওয়ায়, অস্থায়িভাবে তারানাথের হাকিমী ক্ষমতা অপহরণ করা হয়েছে। ৪-ঠা ডিসেম্বর তারানাথ দৃপ্ত ভাষায় জানালেন যে, ওটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা জেলা-হাকিমের নেই।

"ফতোয়া" রাজ

আন্দোলন রোধ করতে এবং জনসাধারণকে জবরদস্তি রাজভক্ত করতে নানা চেষ্টা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, যে-তাণ্ডব সৃষ্টি করা হয়েছিল, বিবৃত দৃষ্টান্তগুলি তাদের খানিকটা অংশ পূরণ করেছে মাত্র।

যত চাপ ছাত্রদের ওপর পড়েছিল, যতটা দণ্ড তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, এতটা আর কোনও শ্রেণীর ওপর পড়েনি। এই ছাত্রদলন যজ্ঞ বাঙ্গলার নানা স্থানে কত রূপ ধারণ করেছিল তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এ-সময় যাঁরা নির্য্যাতন ভোগ করেছেন ছাত্র হিসাবে, তাঁদের কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন,—তাঁদের এগিয়ে এসে, সেকালের ছাত্ররা নিপীড়ন কেমনভাবে গ্রহণ করেছিল, তার কিছু পরিচয় দিলে ভাল হয়।

যতটা আজও সংগ্রহ করতে পারা যায়, সেটা লিপিবদ্ধ করতে গেলে স্বতন্ত্র এক পুস্তক রচনা করতে হয়। এ প্রবন্ধ কেবল ঘটনারই উল্লেখ করছে মাত্র, অতএব বিশদ বিবরণ দেবার অবকাশ নেই। "শ্রাবণের বারিধারা-প্রায়" কত রঙ-বেরঙের সার্কুলার বেরিয়েছিল ছাত্রদের "সচ্চরিত্র" রাখবার জন্য, তাদের স্বার্থরক্ষা কল্যাণের জন্য সেটা প্রকাশ করলেই উৎপাতের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারবে।

পূর্ব্ব-বাঙ্গলার বহু স্কুল সরকারী প্রতাপে উপদ্রুত হয়েছিল। তার মধ্যে রংপুর, মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি স্কুলের ওপর জেলা-শাসক ও শিক্ষা-অধিকর্ত্তাদের 'নেকনজর' পড়েছিল। যেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষক মহোদয় যত আত্মসম্মানসমৃদ্ধ, দেশপ্রেমিক, ছাত্রবৎসল ও সাহসী সেখানেই 'খটাখটি' তত বেশী হয়েছে। মাত্র "সার্কুলার"গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ঃ

কার্লাইল (Robert Warrand Carlyle) সার্কুলার

ছাত্রদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। গভর্ণমেণ্ট মনে করলো তাদের সায়েস্তা করতে পারলে তারা আন্দোলনের গতিরোধ করতে পারবে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আর বিশেষ গোলমাল হবে না। বাঙ্গলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী কার্লাইল দার্জিলিঙ থেকে ১৯০৫ অক্টোবর ১০-ই এক গোপন সার্কুলার (No. 1679 P.D.) জারি করেন। এটি প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টরের কাছে পাঠানো হয়।

ছাত্রদের স্বার্থহানি, অর্থাৎ পড়াশোনায় ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনায় খোদ গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হয়ে ওঠে। কথায় বলে—"মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী"।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যেভাবে অংশগ্রহণ করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হচ্ছে সেটা ছাত্রদের স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী। সুতরাং যে-সকল স্কুল সরকারী অর্থসাহায্য পায় সেগুলি সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

অতএব যে-সকল স্কুলের ছাত্ররা যখনই পিকেটিং, বয়কট প্রভৃতি কোনও কাজে লিপ্ত হয় তদ্দণ্ডে সেইসকল স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ বা কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে যে তারা সর্ব্বপ্রকার সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হয়—ছাত্ররা যোগ্যতা প্রমাণ করলেও সরকারী বৃত্তি (scholarship)-তে তাদের কোনো দাবী থাকবে না এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন নাকচ করা হবে। যদি কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করেও বিফল হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকে (ম্যাজিষ্ট্রেট) জানাবে, আর, শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী ছাত্রদের নাম জানিয়ে দেবে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত বিধি গ্রহণ করবে।

আরও চমৎকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের স্পেশাল কনৃষ্টেবল-এর (Special Constable) কাজ দেওয়া হবে। এটা হ'ল ছাত্রদের অপরাধে গুরুর শাস্তি। উদ্দেশ্যটি মহৎ; এঁরা পাহারাওয়ালা হলে "অপকর্ম্ম" করতে ছাত্রদের "চক্ষুলজ্জা" হতে পারে। ছাত্ররা শিক্ষকদের পরিচিত বলে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের সনাক্ত করতে অসুবিধা হবে না।

ফুলার (Bampfylde Fuller) সার্কুলার

কার্লাইল সার্কুলারের নাম-যশ খুব, কিন্তু অপরগুলি বিশেষ কেউই কম যান না। খোদ ফুলার ১৯০৫ অক্টোবর ১৬-ই সার্কুলার দিলেন সমস্ত জেলা-কর্ত্তৃপক্ষকে, তাঁরা যেন স্বদেশী আন্দোলনে যে-সকল নেতৃবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছেন তাঁদের নাম উচ্চমহলে প্রেরণ করেন। ফুলার উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, এসকল আন্দোলন-পরিচালকদের অপরাধ অকঠোর দৃষ্টিতে (lenient) বিবেচিত হবে। কিন্তু দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘৃণ্য প্রচারপত্র ('scandalous vernacular broad-sheets') সম্বন্ধে কোনও অনুকম্পা প্রদর্শিত হবে না। পরিশেষে বলা হ'ল যেন সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ এইসকল দুর্ব্বৃত্তদলকে খুঁজে বার করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি না-রাখেন (spare no pains)।

পেড্‌লার (Alexander Pedler) সার্কুলার

"দুষমন্" ছাত্র ধরার জন্য এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। পেড্‌লার হলেন শিক্ষা-অধিকর্ত্তা (Director of Public Instruction)। দার্জিলিঙ থেকে ১৯১৫ অক্টোবর ২১-এ এক সার্কুলার (No. T. 292) জারি করলেন সকল শিক্ষালয়ের

উদ্দেশ্যে; এটা একটা ছক (form) হিসাবে ধরে নিতে হবে। বাঁ-দিকের সারিতে ছাত্রদের নাম লেখার উপযোগী বেশ খানিকটা সাদা জায়গা। বয়ানে লেখা ছিল " * * * (স্কুলের নাম) তত্ত্বাবধানে পাঠরত * * * ছাত্র ("মার্জিনে, অর্থাৎ বাঁ-কিনারে প্রদত্ত নাম) ইংরেজিতে "As it is apparently established that the marginally noted student in the institution under your control—* * * " ছাত্র—* * * (অমুক) * * * অবাঞ্ছনীয় কাজে লিপ্ত ছিল বলে জানা গেছে, অতএব মহামান্য ছোটলাট বাহাদুরের নামে আমি অনুরোধ করছি, আমাকে অবিলম্বে জানাও, ঐ ছাত্রকে কেন স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হবে না।"

ক্লার্ক (Loftus Otway Clarke) সার্কুলার

কোপটা ময়মনসিংহের সিটি কলিজিয়েট স্কুল, এডওয়ার্ড স্কুল ও মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের ওপর। এডওয়ার্ড স্কুল নিয়ে ঝামেলার কথা অন্যত্র লেখা হয়েছে। ক্লার্ক ময়মনসিংহের জেলা-শাসক। ১৯০৫ নভেম্বর ৫-ই স্কুল তিনটির ওপর ছাত্রদের হাজিরা-বইগুলি পত্রবাহক পুলিশ কর্ম্মচারীদেব পরীক্ষার জন্য পেশ করবার আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ—অনুপস্থিত ছাত্রদের আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না। প্রধান শিক্ষক বিপিনচন্দ্র দাস হাজিরা-খাতা দেখতে দেননি, অতএব তাঁর বিপক্ষে মামলা রুজু করা হ'ল।

উপরি-উক্ত জেলা-শাসক সিটি কলেজের অধ্যক্ষকে ১৯০৫ ডিসেম্বর (২-রা) পত্র (No. 1787)-যোগে জানালেন—যেন বড়বাজার অঞ্চলে কোনও ছাত্র না-যায়। এ আদেশ অমান্য করলে, যোগ্যতা সত্ত্বেও ছাত্ররা যাতে সরকারী বৃত্তি বা চাকুরি লাভে বঞ্চিত হয় সে-ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে বলে ভয় দেখানো হয়।

বড়বাজার অঞ্চলে যে তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হবে সে-কথা ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিশ ভালরকমই জানতো। কারণ পরের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পাওয়া গেল—জেলা-পুলিশ-সুপার (Roddis) আর তার কনেষ্টেবলের দল ঐ অঞ্চলে যাকে পেয়েছে তাকেই নির্ম্মমভাবে প্রহার করেছে; যারা রাস্তার ধারে নিজেদের রোয়াকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল তারাও নিষ্কৃতি পায়নি।

হলওয়ার্ড (Norman Leslie Hallward) সার্কুলার

রংপুর জেলা-স্কুল নিয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বেশ পাকিয়ে উঠলো। ১৯০৫ নভেম্বর (১-লা) এক সভায় আনন্দমোহন বসুর ১৬-ই অক্টোবরে কলিকাতায় প্রদত্ত ঘোষণা পাঠ করা হয়। সেখানে ঐ স্কুলের প্রায় দুই শত ছাত্র উপস্থিত ছিল এবং "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যোগ দিয়েছিল। সরকারী নির্দ্দেশে প্রতি ছাত্রকে পাঁচ টাকা হিসাবে জরিমানা করা হয়। তখন বহু ছাত্র (তন্মধ্যে প্রফুল্ল চাকী

এক জন) জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় স্কুল থেকে বিতাড়নের পরোয়ানা জারি করা হয়।

স্বভাবতঃই সে-সকল ছাত্র অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হবার চেষ্টা করবে। সে-সময় কোনও স্কুলেই ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। যে-কোনও ছাত্র অপর স্কুলে ভর্ত্তি হতে চাইলে ট্রান্সফার-সার্টিফিকেট সঙ্গে আছে কিনা সে-প্রশ্ন উঠতো না। এক্ষেত্রে সতর্ক গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল।

সরকারের দৃষ্টিতে ঐসকল 'দাগী' ছেলেরা পাছে গভর্ণমেণ্ট বা ইউনিভার্সিটি মনোনীত স্কুলে ভর্ত্তি হয় সেজন্য সেটা বন্ধ করতে পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী ডাইরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্সট্রাকশন (শিক্ষা-অধিকর্ত্তা) হলওয়ার্ড ১৯০৫ নভেম্বর ২২-এ শিলঙ থেকে (No. 1519) সার্কুলার জারি করে সকল স্কুল-পরিদর্শকদের জানালেন যেন কঠোর দৃষ্টি রাখা হয় যাতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (স্কুল-পরিত্যাগের ছাড়পত্র) ছাড়া কোনও ছেলে অপর স্কুলে ভর্ত্তি হতে না-পারে। এই আদেশ অমান্য করলে গুরুতর কুফল ভোগ করতে হবে ("they are reminded of the serious consequence that will be entailed upon them")।

সুতরাং বুঝতে হবে, যে-ছেলে একবার সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছে তার শিক্ষার্থী জীবন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, দণ্ডিত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। সকলেই প্রফুল্ল চাকী হননি সত্য, কিন্তু এঁদের অনেকেই যে বিপ্লবী হয়েছিলেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রচণ্ড বর্ষণের পর বন্যার মত "ফতোয়া" নেমে আসতে লাগলো। প্রতিবাদ চারিদিকে মুখর হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ অক্টোবর ২৪-এ দুটি স্বতন্ত্র সভায় রবীন্দ্রনাথ ও আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে ফতোয়া-সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা ধ্বনিত হয়। ফল যে কিছুই হয়নি, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

লায়ন (Percy Comyn Lyon) সার্কুলার

পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের চীফ্ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে ঢাকা বিভাগের কমিশনার ১৯০৫ নভেম্বর ৮-ই সমস্ত স্কুল-কলেজ-পরিদর্শকদের এক আদেশ দিলেন। এর মূল বক্তব্য, যে-সকল ছেলে "মার্কা-মারা" হয়ে গেছে, তারা সরকারী চাকরি কোনও কালেই পাবে না, কারণ শাসনযন্ত্রের ওপর যারা একবার বীতশ্রদ্ধ হয়েছে তারা ভবিষ্যতে কখনও সরকারকে রাজভক্তরূপে সেবা করতে পারে না ("cannot loyally serve the Government")।

মাদারিপুরেও কিছুটা ছাত্র-আন্দোলন যে গড়ে উঠেছিল সে-কথা বলা বাহুল্য। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মাদারিপুরের মহকুমা হাকিম (S.D.O.)-কে ২৯-এ

অক্টোবর এক পত্র লেখেন। তাঁর বক্তব্য যে, তিনি চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট থেকে নির্দেশ পেয়েছেন—মাদারিপুর স্কুলের ছাত্ররা 'ল্যাণ্ডেল এ্যাণ্ড ক্লার্ক'-এর (পাট ও চা ব্যবসায়ী) দ্বারোয়ানকে প্রহার করেছে বলে জানা গেছে। সেই সম্পর্কে চীফ্ সেক্রেটারী স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে, নিম্নলিখিত তিন দফা সর্তের মধ্যে যে-কোনও একটি গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হবে ঃ

প্রথম, যে-ছেলেরা মারধোর করেছে তাদের মধ্যে তিনটি দলপতিকে আবিষ্কার করে সদর মহকুমা হাকিমের সামনে স্কুল-গৃহে বেত মারতে হবে ("flog them in the school in the presence of the S.D.O.") ;

দ্বিতীয়, প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে দেড়শত টাকা জরিমানা আদায় করে গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা দেবেন ;

তৃতীয়, স্কুলের সরকারী সাহায্য (grant-in-aid) বন্ধ করে দেওয়া হবে, যতদিন না স্কুল-কর্তৃপক্ষ স্কুলে নিয়মানুবর্ত্তিতা বা শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

১৯০৫ নভেম্বর ১০-ই জেলা-শাসক (ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) বরিশাল বানরীপাড়া স্কুলে লায়ন সার্কুলারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলতে হাজির হলেন। গ্রামে যখন তাঁর শুভ পদার্পণ হয়েছে সেই সময় জানা গেল যে কয়েকটি ছাত্র এক দোকানদারের সঙ্গে দেশী-বিদেশী কাপড় নিয়ে তক্‌রার করেছে (remonstrated)। ঘটনাটি ঘটে মধ্যরাত্রে ; ইতিমধ্যে সতর্ক হাকিমের কানে সে-সংবাদ পোঁছে গেছে। সকালে যখন প্রধান শিক্ষক হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তখন তাঁকে এ ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। মধ্যরাত্রের ঘটনা, আর শিক্ষক তো পুলিশ ন'ন, তিনি বললেন যে, ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাকিমী মেজাজ রাগে একেবারে ফেটে পড়লো এবং তিনি চীৎকার করে শিক্ষক-মহাশয়কে কেবল মিথ্যাবাদী বলে সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সঙ্গে কতকগুলি অসম্মানকর বাক্য প্রয়োগ করলেন ("the Magistrate called him a liar and used abusive language towards him")।

দ্বিপ্রহরে হাকিমসাহেব স্বয়ং স্কুলে হাজির হয়ে তিনটি ছাত্র এবং একজন শিক্ষককে বিতাড়নের আদেশ দিলেন। উপায়হীন প্রধান শিক্ষক মহাশয় এ আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এবারে রাজসাহীর দিকে যাওয়া যাক্। অস্থায়ী জেলা-হাকিম (উমাপ্রসন্ন গুহ) ঘোড়ামারা থেকে ১৯০৫ নভেম্বর ১৩-ই সমস্ত স্কুলের উদ্দেশ্যে এক সার্কুলার জারি করলেন। তিনি নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তিনি লক্ষ্য করেছেন শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে তিরস্কার বা শাসনবাণী ("admonitions") প্রচার করা হয়েছিল, ছাত্ররা তা থোড়াই পালন করেছে।

তিনি সত্বর জানাতে বললেন, স্কুল খোলার পর ছাত্ররা যাতে অপ্রীতিকর, শান্তিশৃঙ্খলা-ভঙ্গের সম্ভাবনাপূর্ণ এবং তাদের শিক্ষার অন্তরায়মূলক কাজে লিপ্ত না হয়, তা রোধ করবার কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। তার সঙ্গে জানতে চাইলেন, যে-সকল ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনুজ্ঞা পালন করবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করেনি, তাদের নাম তাঁর (হাকিমের) কাছে পাঠাতে কোনও আপত্তি আছে কিনা। পত্রে উদ্দিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের আবও জানালেন যে, ছাত্রদের যদি "সৎপথে" ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যা "ভবিষ্যৎ অনুশোচনা দ্বারা প্রতিকার করার সম্ভাবনা থাকবে না"।

শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ প্রকাশ্যে এর কতকটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু কি-ভাবে আন্দোলন গোপন পথে প্রবেশ করে তার নমুনা এই থেকেই পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহেব এডোযার্ড স্কুলের কথা পূর্ব্বে এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কথায় বলে—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা"। ১৯০৫ নভেম্বর ২৪-এ দুর্গাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থাগ্রহণকারী রংপুর, বরিশাল ও ফরিদপুরের লোকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ক্লার্ক (L. O. Clarke) ডিসেম্বর ১-লা এক পত্র-যোগে বিপিনের গর্হিত কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেন এবং স্কুলের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার কারণ দর্শাইতে আদেশ দেন। তেজের সহিত অভিযুক্ত শিক্ষক বলেছিলেন যে, তিনি যা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্কুলের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

রিজলি (Herbert Hope Risley) সার্কুলার

খোদ ভারত সরকার ছাত্রদের স্বার্থহানিতে বিচলিত হয়ে পড়লেন। সে-কারণে রিজলি ১৯০৭ মে ৬-ই সিমলা শৈল থেকে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন সব আঞ্চলিক রাজ্য-সরকারের উপব। উদ্দেশ্য সাধু, দেশের উচ্চশিক্ষার মান সংরক্ষণ ও প্রসার। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার-বৃদ্ধি একটা বিশেষ দুর্লক্ষণ। বিশেষ করে তারা এতে অংশগ্রহণ করায় জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এটা নিতান্ত সাম্প্রতিক লক্ষণ। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন উপেক্ষা করেই চলেছিল। বিশেষ আশা ছিল যে, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, ছাত্রদের সম্ভাবনাপূর্ণ বিরাট ভবিষ্যতের ক্ষতি এবং পারিবারিক জীবনের মূলোচ্ছেদকারী কার্য্য থেকে তারা বিরত হবে। সার্কুলারের নিজস্ব ভাষায়ঃ "The Government of India have hitherto refrained from adopting

specific measures to counteract its (the tendency of the teachers and pupils to associate themselves with political movements) effects in the belief that parents, teachers and the more sensible, or less impressionable students could not fail to realise that the spirit of lawlessness and resistance to authority thus engendered among the young is bound, in the long run, to set back the advance of genuine education, to injure the material prospects of the students and to subvert the traditional foundations of the Indian family life."

রিজলীর মতে, ভারতের চিন্তাশীল অভিভাবকদের মধ্যে একটা খুব বড় অংশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একমত যে, এই ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক আচরিত শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী আন্দোলনের কুফল, বিশেষতঃ, শিক্ষাক্ষেত্রে, সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত।

বর্ত্তমান আন্দোলনের কুফল শিক্ষার সকল স্তরে অনুভূত হতে বাধ্য। কিন্তু স্কুল ও কলেজগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সব এক ছাঁচে ঢালা না হলেও, মূল কথা, যেন ছাত্ররা বেয়াড়া রাজনীতির মধ্যে গিয়ে না পড়ে। এই সার্কুলার বুঝিয়ে দিল যে, স্কুল-কলেজের অমনোনয়ন, সরকারী সাহায্য বন্ধ, ছাত্রদের বৃত্তি-লোপ প্রভৃতি শাস্তি গভর্ণমেণ্ট প্রয়োগ করবে প্রয়োজন বোধ হলেই। প্রাদেশিক সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করেই নিশ্চেষ্ট থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে তার শক্তিমত যথাযোগ্য বিধি অবলম্বন করাবে।

অনুমোদিত কলেজগুলি সহজে আয়ত্তে আনা যাবে এই ধারণা তখন গভর্ণমেণ্টের মগজে গজিয়ে উঠেছে। ছাত্ররা কেবল সভা-সমিতিতে যোগ দিলে তত দোষাবহ মনে করবার কথা নয়, যত গণ্ডগোল অংশগ্রহণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, কলেজ কখনও স্বদেশী আন্দোলন, পিকেটিং, গরম বক্তৃতা বা দাঙ্গাহাঙ্গামার উৎসাহ দেবার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে দেওয়া যায় না। উন্মুক্ত খড়্গ মাথার ওপর ঝুলছে—মুহূর্ত্তে পড়ে খণ্ড খণ্ড করে ছাড়বে!

স্কুল-কলেজের ছাত্র-পর্য্যায় ছেড়ে, শিক্ষক-অধ্যাপক নিয়ে বিলি-ব্যবস্থার ত্রুটি হয়নি। কতটা কড় (ছিপের সুতো) দিলে এদের খেলানো যাবে তার একটা নিরিখ ঠিক করা হয়েছিল। শিক্ষকরা যে ছাত্র-পর্য্যায়ে পড়তে পারে না, তাঁরা বয়স্ক এবং শিক্ষিত সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে একটু উদারতা প্রকাশ করা হয়। তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁরা ছাত্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দায়িত্ব কিছুতেই এড়াতে পারেন না। ছাত্ররা যে ভালরকম রাজভক্ত প্রজা হয়ে উঠবে, অর্থাৎ শাসনযন্ত্রের ওপর কোনও বিরূপ ভাব পোষণ করবে না, দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে গড়ে উঠবে, শৃঙ্খলাবোধ বেশ টন্‌টনে হবে—এসকল

গুণ ছাত্রদের অন্তরে গজিয়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কাজ। ব্যত্যয় ঘটলে শিক্ষকরা অযোগ্য, দেশের মঙ্গল ও রাজভক্তির মান রক্ষায় অসমর্থ এবং ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষণের অনুপযোগী বলে পরিগণিত হবে। প্রমাণিত হবে যে, তাঁদের মধ্যে কর্ত্তব্যপালনেব ত্রুটি জাজ্বল্যমান। সুতরাং তাঁদের মধ্যে শৃঙ্খলা-পালনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। এর ওপর যদি কোনও শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কোনও রাজনৈতিক সভায় নিযে যান, যেতে উৎসাহ (বা সুযোগ) দেন বা নিজ অভিসন্ধি-পূবণে ছাত্রদের নিযুক্ত কবেন, তাহলে সেটা গুরুতর অপরাধ-তালিকায় স্থানলাভ করবে।

কলেজের অধ্যাপকদের আরও কিছু স্বাধীনতা দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের সর্ব্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে দায়িত্বেব বোঝা এখানে অনেক বেশী। কলেজের কোনও অধ্যাপককে রাজানুগত্য-বিরোধী কোনও কাজ করতে দেখলে, কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, বাকী সাজা-শাস্তির বহর পূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এসে পূর্ণ হস্তক্ষেপ করতে পারবে, অর্থাৎ কলেজ বন্ধ করে দেওয়া বা নিজস্ব পরিচালনায গ্রহণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় রিজলী সার্কুলারঃ সিমলা থেকে ১৯০৭ জুন ৩-রা রিজলী আর-এক ফতোবা জাবি করেন। এটি ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, স্কুল-কলেজের আর্থিক সাহায্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন নাকচ নিয়ে নয়; এটি আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করবার প্রচেষ্টা।

ছাত্রদলন নীতি কি রূপ ধারণ করেছিল তার কিছুটা এখানে প্রকাশ করা হ'ল। এর সঙ্গে পিকেটিং, বয়কট প্রভৃতি রোধ করার যে-সকল প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হযেছে।

জাগ্রত বাঙ্গলা এ অনাচার একেবারে মাথা পেতে নেয়নি। তখনকার বাঙ্গলা একেবারে নেতৃশূন্য ছিল না; প্রচণ্ড নির্য্যাতনে বিমূঢ় হয়ে পড়েনি।

যাই হোক্, বঙ্গ-বিভাগের আগে ও পরে প্রতিবাদে যে-সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরু। ছাত্রদলন ও সাধারণের ওপর নির্য্যাতন উপলক্ষ করে দেখা দেয় রাখীবন্ধন, এ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসায়েটি, 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায়, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি।

"প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স"

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশী জুলুমের নমুনা কিছুটা দেওয়া হয়েছে। এটা যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। কেবল "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনি পূর্ব্ব-বাঙ্গলা সরকারকে কত বে-সামাল করেছিল, তার নগ্ন উদাহরণ পাওয়া যায় বরিশাল কন্‌ফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে। ছেলে-ছোকরার দল নয়, বে-আইনী কোনও কার্য্যপদ্ধতি নেই, বাঙ্গলার সর্ব্বজনবরেণ্য বয়স্ক নেতৃবৃন্দ যেখানে উপস্থিত এবং কন্‌ফারেন্সের উদ্যোক্তা ও অংশভাগী, পুলিশকর্ত্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট সেখানেও কতটা অবিবেকিতার পরিচয় দিয়েছেন, বরিশাল কন্‌ফারেন্স সে-স্মৃতি বহন করে আছে।

"মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া"র জন্যে গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর। তারা "দক্ষযজ্ঞ"-ভঙ্গের পথ গ্রহণ করেছিল। ব্যাপক ক্ষেত্রে শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিরোধের পথ নেতৃবর্গ গ্রহণ করলেন; তার পিছনে উগ্র মতবাদও গড়ে উঠেছে। মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স

বিক্ষোভ যখন নানারকমে প্রকাশ পেয়ে চলেছে তখন এসে পড়লো বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন-কাল। ১৯০৬ সালের ১৪-ই ও ১৫-ই এপ্রিল (১-লা ও ২-রা বৈশাখ, ১৩১৩) দিন স্থির করে বরিশাল সহর নির্দিষ্ট হয়, কারণ ইতিমধ্যে সকল জেলার ভিতর বরিশাল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার সহ্য করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার এ. রসুল সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

কলিকাতা থেকে দেড়শতাধিক প্রতিনিধি রওনা হন এবং খুলনাতে ষ্টীমার ধরে বরিশাল অভিমুখে চলতে থাকেন। এই দলে প্রায় কুড়িজন এ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসায়েটির সভ্যও ছিলেন।

বেলা প্রায় আড়াইটায় তাঁরা জলাবাড়ী পৌঁছুলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস প্রতিনিধিদের স্নানাহারের ব্যবস্থা করে রাখেন। ষ্টীমার-কোম্পানী কোনও সময়-সুযোগ দিতে রাজী না হওয়ায়, অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে তিনি সমস্ত আহার্য্য ষ্টীমারে তুলে দিতে বাধ্য হন। ষ্টীমার বরিশালে পৌঁছায় রাত্রি সাড়ে আটটায়। জলাবাড়ীতেই বোঝা গেল সুসভ্য ইংরেজ-শাসন মুখোশ খুলছে। পুলিশের তৎপরতা এবং থমথমে আবহাওয়া একটা অজানা হাঙ্গামার সঙ্কেত বয়ে নিয়ে আসছিল।

সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা থেকে ঢাকা যান। সেখানকার কাজ সেরে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ প্রতিনিধি নিয়ে ষ্টীমারে এসে পৌঁছুলেন, আরও কিছু বিলম্বে। তিনি এসে দেখলেন যেন সকলেই তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন।

বহিরাগত আগন্তুক সকলেই ষ্টীমার থেকে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিচ্ছেন কিন্তু তীরে একটি অশান্ত নীরবতা লক্ষ্য করে সকলে বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে জানা গেল যে, জেলা-হাকিম "বন্দে মাতরম্"-ধ্বনি-সম্বলিত শোভাযাত্রার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছেন এবং পাছে কোনও হাঙ্গামা হয় সেজন্য অভ্যর্থনা-সমিতি সেটা মেনে নিয়েছেন।

বহিরাগত অধিকাংশ প্রতিনিধি এ-ব্যবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুন্ন হন। অনেক বিতণ্ডার পর, গুরুতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অভ্যর্থনা-সমিতির মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধচিত্তে ষ্টীমার থেকে সবাই নেমে আসেন। সুরেশচন্দ্র গুপ্ত ("অশ্বিনীকুমার", পৃঃ ৪৩৫) লিখেছেন—"কিন্তু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটির সভ্যবর্গ অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের বাড়ীতে গেলেন এবং অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন।"

ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠলো। পরদিনই প্রকাশ্য অধিবেশন, সুতরাং রাত্রেই ইতিকর্ত্তব্য স্থির করতে হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা রাত্রেই 'রাজা-বাহাদুরের হাবেলী'তে সমবেত হলেন। সেখানে স্থির হয়, পরদিন (১৪-ই) পূর্ব্বাহ্ণে সকলে 'হাবেলী'তে জমায়েত হবেন এবং সেখান থেকে সকলে বেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠলে, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দেওয়া হবে ; তার আগে নয়।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাপতি ঘোড়ার গাড়ীতে রওনা হলেন। ঠিক পিছনে প্রথম সারিতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ও ভূপেন্দ্রনাথ (বসু), আর তার পিছনে মাননীয় অতিথি ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ।

সভাপতির গাড়ী লোন্ (loan) অফিসের সামনে পৌঁছেচে ; সেই সময় হাবেলীও প্রায় খালি হয়ে আসছে। এই শেষদিকের মধ্যে বেশীর ভাগই এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটির সভ্য ও ব্যাজ-পরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক স্বেচ্ছাসেবক-দল। মাত্র কয়েকজনের তখনও হাবেলী থেকে বাইরে আসতে বাকী।

সেই সময় দীর্ঘ-লাঠি-ধারী পুলিশ বে-পরোয়া মার আরম্ভ করে দেয়। তখনও কেউ "বন্দে মাতরম্" শব্দ উচ্চারণও করেনি। সুরেন্দ্রনাথ বলছেন ঃ

"These young men had done nothing ; they had not even before the assault uttered what to the Government of East Bengal was an obnoxious cry, that of *Bande Mataram.*" (Surendra Nath Banerjea : *A Nation in Making*, p. 266)

প্রথম চোটটা পড়লো এ্যান্টি-সার্কুলার সোসায়েটির সভ্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর। এতে আহত হন ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁর বাঁ-দিকের চোয়ালে আঘাত লাগে এবং তাই থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাথায় নিদারুণ আঘাত পান। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর চোয়ালে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ডান হাতে, বেচারাম লাহিড়ীর ডান কাঁধে আঘাত লাগে। জে. (যোগেশচন্দ্র) চৌধুরীর টুপি কোনও রকমে তাঁর মাথাটা বাঁচিয়ে দেয়।

এর মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনের আঘাতটা নানা কারণে খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। মিছিলের মাঝামাঝি যুবক চিত্তরঞ্জন চলছিল। লম্বা লাঠি দারুণ ভাবে মাথায় এসে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে সে "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করে উঠলো। যত বাড়ি পড়ছে---সে সঙ্গে-সঙ্গে ততবারই "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার দিয়ে উঠছে। এবার কাছারির সামনে যখন এসে পড়েছে তখন এক ঘা লাঠি খেয়ে চিত্তরঞ্জন পাশের পুকুরের জলে পড়ে যায়। তখনও মার যেমন থামেনি, তেমনি থামেনি তার "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করা। জল রক্তে লাল হয়ে উঠলো। তখনও মারের বিরাম নেই। যখন তার জীবন্ত সলিল-সমাধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, তখন পুলিশেরই একজন তাকে টেনে ওপরে তোলে। প্রায় অচৈতন্য অবস্থা।

নেতা ললিতমোহন ঘোষাল সব ঘটনা লক্ষ্য করে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ও অপরাপর দু'তিনজনকে অবস্থা জানালে, তাঁরা ফিরে ঘটনাস্থলের দিকে আসতে লাগলেন। পুলিশসাহেব সামনে এসে পড়াতে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, সমস্ত ব্যাপারের জন্য তিনি দায়ী। ঐরকম যথেচ্ছভাবে মারাত্মক আঘাত না-করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে অপরাধের বিচার করা হোক্। অম্লানবদনে পুলিশসাহেব তাঁকে বলে দিলেন যে, তিনি বন্দী এবং তাঁকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সনের কাছে বিচারের জন্য তখনই হাজির হতে হবে। মতিলাল বললেন যে, তিনি সমপরিমাণ অপরাধী, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হোক্। তার জবাব হ'ল যে, কেবল সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বলে দিলেন সম্মেলনের কাজ যেন যথারীতি চলতে থাকে। এদিকে তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। একখানা ঠিকা-গাড়ী করে নিয়ে যাবেন পুলিশসাহেব কেম্প। সঙ্গে রইলেন অভ্যর্থনা-সমিতির অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বিহারীলাল রায়, আর প্রতিনিধিদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। আসামী ছাড়া যেতে পারবে না বলে, কেম্প গাড়ীর মধ্যে উঠে পড়ে সুরেন্দ্রনাথের পাশেই স্থান করে নিলেন। তাঁদের সামনে বসলেন আর দু'জন। বাকী রয়ে গেলেন কাব্য-বিশারদ। গাড়ীর মধ্যে তাঁর স্থান সঙ্কুলান হয়নি। তাই তিনি গাড়ীর পিছনে

সহিসের পা-দানীতে দাঁড়িয়ে চললেন (*A Nation in Making*, p. 207)। মান-অপমানের বিচার তাঁকে ঐ স্থান গ্রহণে বাধা দেয়নি।

হাকিম-সাহেবের বাড়ীতেই এজলাস হ'ল। আসামী হাজির, বিচারকের মেজাজ তখন কড়া পর্দ্দায় উঠে গেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আর তাঁর সঙ্গীরা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন—এমন সময় এমার্সনের চীৎকার—"Get out", "নিকালো"—শব্দে ঘর ফেটে গেল। কালীপ্রসন্নর পরনে থান ধুতি। অনাবৃত দেহের ওপর এক উড়ানি ও একগোছা পৈতা, পায়ে চটি। নগ্নগাত্র সেই অ-সভ্য পোশাকে সজ্জিত ব্রাহ্মণ প্রবেশ করে তাঁর কামরা কলুষিত করে দেবে—"নেভার"—সে কখনও হতে দেওয়া যায় না। সুতরাং কাব্যবিশারদ বাইরে চলে গেলেন।

প্রথম দফা কাটিয়ে উঠতেই আবহাওয়া থম্‌থমে হয়ে উঠলো। অশ্বিনীকুমার ও বিহারীলাল দু'খানা চেয়ারে বসলেন, সসঙ্কোচে। সুরেন্দ্রনাথ একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছেন এমন সময় দ্বিতীয় হুঙ্কার। একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হাকিমের এজলাসে চেয়ারে বসবে, বিচারালয়ের অবমাননা হবে, এ অনাচার বরদাস্ত করতে পারা যায় না। রূঢ় ভাষায় আসামীকে জানিয়ে দিলেন—"খাড়া রহো!" সুরেন্দ্রনাথ বললেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক এবং একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে সেই ব্যবহারই প্রত্যাশা করেন। সাহেব চটে লাল ; তাঁর এজলাসের প্রতি যথোপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হয়নি। বে-আইনী মিছিল পরিচালনা করার জন্য দু'শ', আর কাছারি অবমাননার জন্য আরও দু'শ' টাকা জরিমানা কাজীর বিচারে নির্দ্দিষ্ট হ'ল। সুরেন্দ্রনাথের কাছে অত টাকা নেই। কেম্প-সাহেব সঙ্গ নিলেন এবং সেই টাকা আদায় করে নিয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন। এইবার সকলে সভাস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

মন-ভাঙ্গা অবস্থায় সভার কাজ চলছিল। যখন সুরেন্দ্রনাথ ও সঙ্গীরা প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন তখন সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনিতে সভামণ্ডপ ভরিয়ে ফেললেন ; সাত-আট মিনিট সমানে হর্ষধ্বনি, বিরাম ছেদ নেই। সভাপতিকে ঘিরে তখন বসে ছিলেন—মতিলাল ঘোষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল হালিম গজনবী, অনাথবন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন, আনন্দচন্দ্র রায়, দীন মহম্মদ, কামিনীকুমার চন্দ, হাজি মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় (ফরিদপুর), মৌলভী মোতাহার হোসেন, নিবারণচন্দ্র দাশ, রজনীকান্ত নন্দী (ত্রিপুরা), মৌলভী হেদায়েত বক্স, শচীন্দ্রনাথ সিংহ (শ্রীহট্ট), গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মৌলভী গোলাম মওলা চৌধুরী, ইন্দুভূষণ মজুমদার (খুলনা) প্রভৃতি বরিশালের ও বহিরাগত নেতৃবর্গ।

কিছুক্ষণ স্থগিত থেকে সভার কাজ যথানিয়মে চলতে লাগলো। এমন সময়

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মঞ্চের ওপর উঠে রক্তধারা-রঞ্জিত পুত্র চিত্তরঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে এক আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। সকলে নিঃশব্দে সে-তাণ্ডবের বিবরণ শুনে 'ছিঃ ছিঃ' করে উঠলেন। মনোরঞ্জন বললেন যে, এ ঘটনায় তিনি মোটেই দুঃখিত ন'ন। রামায়ণের রাবণ ও বীরবাহুর উল্লেখ করে স্বয়ং তিনি যে গর্ব্ব অনুভব করছেন, এ কথা বললেন। উপস্থিত জনতা বেদনা ও ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়ে। শান্ত-ধীর ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"বহু বৎসর ধরে ইংরেজ রাজত্বের যে দৃঢ় ভিত গড়ে উঠেছিল, আজ তা টলে উঠলো।"

সভার কাজ সংক্ষিপ্ত করা হ'ল। একটি সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হ'ল যে, বরিশালে বিধিসম্মত শাসনের অবসান হয়েছে এবং আজকার ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করে মনে হচ্ছে সাধারণ নিয়মে সভা চলা সম্ভব নয়, অতএব যে-সকল বিষয়—বাঙ্গলা-বিভাগ, "স্বদেশী" এবং জাতীয় কল্যাণকর ব্যবস্থা সরকারের বিনা সাহায্যে দেশের লোকের পক্ষে সুসম্পন্ন করার সম্ভাবনা আছে, বর্ত্তমানে কেবল সেই-সকল বিষয় আলোচিত হবে।

পরদিন (১৫-ই এপ্রিল ঃ ২-রা বৈশাখ) বেলা সাড়ে এগারোটার সময় সভা আরম্ভ হয় ; এখানে সমস্ত বঙ্গভাষী অঞ্চলকে এক-শাসনাধীনে রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অপর একটি প্রস্তাবে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী সম্বন্ধে শপথ-গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এর পর জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে স্বাগত জ্ঞাপন করা হলে, সভায় ময়মনসিংহের মহিলা-জমিদার বিশ্বেশ্বরী দেবী কর্ত্তৃক এক লক্ষ টাকা দানের সংবাদ প্রচারিত হয়। অপরাপর দানের পরিমাণ সাড়ে সাত হাজার টাকা।

সভার কাজ চলছে—আন্দাজ বেলা দু'টার সময় পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জেলা-হাকিম এমার্সনের স্বাক্ষরিত (১৯০৬ এপ্রিল ১৫-ই) এক বিজ্ঞপ্তি সভাপতির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তার মর্ম্মার্থ এই যে, সভা ভেঙ্গে যাবার পর রাস্তায় হৈ-হুল্লোড়, অর্থাৎ অসংযত কার্য্য এবং গোলযোগের সম্ভাবনাপূর্ণ মিছিল চলার আশঙ্কা আছে। এসকল বে-আইনী কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে মণ্ডপে বা বাইরে মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ করা হ'ল। সভাভঙ্গে 'রাজা-বাহাদুরের হাবেলী'তে বহু লোক জমায়েত হতে পারে, অতএব সেটা বন্ধ করার হুকুম হ'ল।

বলা বাহুল্য, মঞ্চোপরি নেতাদের সম্মুখে এই আদেশ উপস্থাপিত হলে, প্রথম কথাই উঠলো, জোর করে ভেঙ্গে না দিলে তাঁরা সভাস্থল পরিত্যাগ করবেন না। চূড়ান্ত মতামত প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে দেখে স্বয়ং কেম্প সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, নেতৃবর্গকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সভাশেষে কেউ "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করতে পারবে না। তাতে যদি সকলের মত না হয়, তাহলে দুটি উপায়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রথম, সমবেত জনতা স্বেচ্ছায় চলে যেতে পারে ; দ্বিতীয়, পুলিশ বলপ্রয়োগে সকলকে বিতাড়িত করবে।

কেম্প এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল রাগে একেবারে ফেটে পড়লো। সমস্ত কণ্ঠ থেকে একসঙ্গে বারে বারে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিত হতে লাগলো। অবশেষে অধিকাংশের মতে সভা ভেঙ্গে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'ল। কৃষ্ণকুমার ও ব্যারিষ্টার বি. (বিজয়) সি. (চন্দ্র) চট্টোপাধ্যায় এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। পুলিশ গুলি চালিয়ে সভা ভেঙ্গে না দিলে কৃষ্ণকুমার মঞ্চ পরিত্যাগ করায় আপত্তি জ্ঞাপন করলেন। সকলে চলে গেলেও কৃষ্ণকুমারকে বহু অনুনয়-বিনয়, সাধ্য-সাধনা, যুক্তি-তর্ক প্রয়োগে মণ্ডপ পরিত্যাগ করানো সম্ভব হয়েছিল।

ঐ দিন আরও অনেক প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী বরিশালে উপস্থিত ছিলেন। দেবকুমার চৌধুরীর আহ্বানে এক সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হয়। সাহিত্যের আহ্বানও বটে এবং সময় ও সুযোগ হলে রাজনৈতিক সম্মেলনে অন্ততঃ কিছু সময় উপস্থিত থাকার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কন্‌ফারেন্স অধিবেশনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৪-ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বরিশাল পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। যখন তাঁরা বরিশালে পদার্পণ করলেন তখন কন্‌ফারেন্স বাতিল করা হয়েছে। সাহিত্য-সম্মেলনের উপর অনুরূপ বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গের সাহিত্যিকরা পরদিনই বরিশাল ত্যাগ করেন। কন্‌ফারেন্সে তাঁদের আর যাওয়া ঘটেনি।

কন্‌ফারেন্স ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, সুবোধচন্দ্র ঢাকা ও অন্যান্য কয়েকটি সহর ঘুরে কলিকাতায় ফেরেন। সেখানে রাজনীতিক্ষেত্রে পরবর্ত্তী কার্য্যপদ্ধতি নিয়ে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার ফলে সাধারণের মনে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স সংক্ষিপ্ত ঘটনা, কিন্তু বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাইরে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। প্রতিহিংসা নেবার জন্য পত্র-পত্রিকায় ও সভা-সমিতিতে যে ভাষা প্রযুক্ত হতে থাকে সেটা অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী শক্তির সঙ্গে "বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি"র জন্য যে প্রস্তুতি তার ইঙ্গিত দিতে থাকে। তার কিছু পরিচয় এখানে রেখে দেওয়া সমীচীন বলেই মনে হয়।

বরিশালে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি বন্ধ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে যে ব্যাপক চেষ্টা চলছিল, তাতে সেখানে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে যাওয়া খুবই সাহসের পরিচয় বলে মনে করা যেতে পারে। বরিশালে সরকারী ব্যবস্থা নিয়ে কেন যে সঙ্ঘর্ষ হচ্ছে না, এ নিয়ে কলিকাতার পত্রিকায় অনেকেই প্রশ্নটা তুলেছিল। ১৯০৬ এপ্রিল ১০-ই 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' পত্রিকা লিখেছিল যে, ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেশবাসী তার দৃঢ় (দক্ষিণ) বাহুর শক্তি দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ব্রতী হবে কিনা, সে-পরীক্ষার কাল সমুপস্থিত। কাঁদুনি গেয়ে তাচ্ছিল্য-লাভ ঘটতে পারে, সম্মান পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

কন্‌ফারেন্স তো ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল, 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রশ্ন করলে, মার খেয়ে ছাগল-গরুর মত নীরবে তা সহ্য করা ভাল, না, লাঠির বদলে লাঠির যোগ্য-ব্যবহারই পুরুষোচিত কাজ। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকা'র বক্তব্য ঃ আগে থাকতেই শত্রুপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া ভাল যে, লোক এইবার মৃত্যুভয় পরিহার করতে শিখছে।

বাঙ্গলা-গভর্ণমেণ্ট-রূপী কুম্ভকর্ণের নিদ্রার কাল চলেছে। তা না হলে দেশের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, লোকের মন অত্যাচারের প্রতি বে-পরোয়া হয়ে উঠছে, তাতে গভর্ণমেণ্টের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে ঠিক উল্টো পথ ধরেছে বলে মনে হয়। এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাঙ্গলার অন্য কোনও জেলায় 'বরিশাল ঘটনা'র পুনরাবৃত্তি হলে, লোকে জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বেরিয়ে পড়বে।

চিন্তাশীল লোক মনে করছেন যে, বাঙ্গলাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় আয়ার্ল্যাণ্ড তৈরী হয়ে উঠছে। আইনানুগ আন্দোলন যখন এরকম প্রচণ্ড বাধা পাচ্ছে তখন ভিন্ন পথের সন্ধান করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়ে উঠবে। বরিশালের আঘাত ভোলবার মত নয়। এটা নিছক কাপুরুষতা, অকারণ আক্রমণপ্রবণতা এবং চরম হৃদয়হীনতার লক্ষণ। এ আচরণ স্বভাব-শান্ত বাঙ্গালীকে অশান্তির চরম স্তরে নিয়ে গিয়ে হাজির করছে। এর যে কি বিষময় ফল হতে পারে, সে কথা ভাল করে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

'যুগান্তর' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকা বরিশাল কন্‌ফারেন্স নিয়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখেছিল, তাতে লোককে পূর্ব্বাপর বিবেচনা ভুলে গিয়ে যেন আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। 'যুগান্তর' (১৯০৬ এপ্রিল ২২-এ) বলেছিল—বরিশালের দুঃসহ অত্যাচার-পরম্পরা রোধ করতে ভারতের ত্রিশ কোটি লোক বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে। 'সন্ধ্যা' (এপ্রিল ২৮-এ) এই সুরে সুর মিলিয়েছে ঃ স্ত্রীলোকের মত কাঁদলে কি হবে ? কেবল ক্ষমাই মানুষের ধর্ম্ম নয় ; প্রতিহিংসা জীবন-ধারণের অঙ্গ। জাতীয় অপমান প্রতিহিংসার দ্বারা চরিতার্থ হতে পারে। বিষের ওষুধ যে বিষ, সে-কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলা উচিত নয়।

'হিতবার্ত্তা'র (১৯০৬ এপ্রিল ২৯-এ) বক্তব্য আরও পরিস্ফুট ঃ "পৃথিবীর অন্য যে-কোনও অংশে বরিশালের অনাচার ঘটলে হাকিম এমার্সনের মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেত। আর, বহু সম্মানিত ব্যক্তি যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন তাতে সেই নির্লজ্জ বেহায়ার হাড় গুঁড়ো করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়াই ঠিক কাজ ছিল। ফলে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে 'খড্গে খড্গে ভীম পরিচয়' হবে। নিরীহ কিশোর ও যুবকদের রক্তপাত অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ-রক্তে শোধন করতে হবে। বিপন্ন হলে কীট-পতঙ্গ ফিরিয়ে দংশন করতে চেষ্টা করে। এ দেশের লোকের ধৈর্য্যের শেষ সীমা নেই ; কতদিনে তার বাঁধ ভাঙ্গবে সেইটা লক্ষ্য করার বিষয়।

"আরও গুরুতর দুর্দ্দৈবের আশঙ্কা করা যাচ্ছে। লিখিত 'বন্দে মাতরম্' রাস্তায় টাঙ্গানো বন্ধ করা হয়েছে। তার পরিবর্ত্তে এমার্সনের মুণ্ডটা সড়কের ওপর উঁচু লগির মাথায় ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যদি অত্যাচারীর যথাযোগ্য শাসন না হয়, তাহলে যে আগুন জ্বলবে সেটা সমস্ত দেশকে গ্রাস করে বসবে। হয়তো সেদিনের আর বেশী বিলম্ব নেই।"

নরমপন্থী 'বেঙ্গলী'—'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার সমপর্য্যায়ে উঠেছিল। ১৯০৬ এপ্রিল ১৮-ই পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল—আসামের জঙ্গলের এই নীচমনা স্বেচ্ছাচারী লোকটার ("the low-minded despot of the wilds of Assam") উদ্ধত আচরণ মুখ বুজে সবাই সহ্য করবে? ...... দারুণ উত্তেজনায় যখন সমস্ত দেশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। .... সে-কারণে আমরা হঠাৎ কিছু করতে চাইছি না, কিন্তু তাই বলে এই অবিরাম অপমানের বোঝা মাথা পেতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকা চলে না।

বিস্ফোরণের জন্য দেশ প্রস্তুত হতে চলেছে। এর পরে মেদিনীপুর এবং হুগলী প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স নিয়ে নরম ও গরম দলে যে বিরোধ হ'ল, তাকে তাণ্ডবের সূচনা বলে মনে করা যেতে পারে।

মেদিনীপুর প্রদর্শনী

প্রথম ঘটনা বরিশাল কন্‌ফারেন্সের আগে। যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেদিন আবির্ভূত হতে দেখা যায়, সংক্ষেপে তার পরিচয় রেখে দেওয়া যাক্। ১৯০৬ ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে মেদিনীপুরে একটি 'কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৮-এ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পঞ্চদশ-বয়স্ক এক যুবক একখণ্ড পত্রিকা বিতরণ করছিল; শিরোনামা ছিল—"এরাই কি আমাদের রাজা?" রাজদ্রোহাত্মক বলে পুলিশ এসে তাকে পাকড়াও করে। ক্ষীণ দেহে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে তারই সাহায্যে সে পুলিশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে পড়ে। নামটা পরে জানা গেল—ক্ষুদিরাম বসু। মার্চ ২৯-এ তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুলো। ক্ষুদিরাম তখন 'বন্দে মাতরম্' তাঁতশালায় বাস করে। ৩১-এ ডজন-দুই পুলিশ দিয়ে চালাটা ঘিরে ফেলে রাত্রি একটায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এপ্রিল ২-রা সে পাঁচশত টাকার জামিনে মুক্তিলাভ করে। একটা সামান্য ছোকরার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা চালাতে হয়তো মহাপ্রতাপশালী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরও চক্ষুলজ্জা হয়ে থাকবে। দু'তিনদিন সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে টানাটানি করবার পর মে ১৬-ই তারিখে আসামী মুক্তিলাভ করে।

যেদিন ক্ষুদিরামের নামে ওয়ারেণ্ট জারি হয়, অর্থাৎ ১৯০৬ মার্চ ২৯-এ, সেই দিন ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন বিভাগের কেরানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন বাঙ্গলোতে ডেকে পাঠান এবং পরদিনই তাঁর ওপর চাকরী-বরখাস্তর নোটীশ দেওয়া হয়।

এই দুইজনই বাঙ্গলায় বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের প্রথমদিকের বলি হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছেন।

মেদিনীপুর সম্মেলন

পরের বছর সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন হবে—ডিসেম্বরের শেষে, ২৬ তারিখে। তার অব্যবহিত আগে, ১৯০৭ ডিসেম্বর ৭-ই, মেদিনীপুরে রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের দিন ধার্য্য হয়। কলিকাতা থেকে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা উপস্থিত হয়েছেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রঘুনাথ দাস ও মূল সভার সভাপতি ব্যারিষ্টার কে. (কুঞ্জ) বি. (বিহারী) দত্ত। সভার অধিবেশন শুরু হয় বেলা তিনটায়। সঙ্গে সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েষ্টন স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর সাত দফা বাধা-নিষেধ জারি করেন।

সভা আরম্ভ হবার আগেই গুজব রটে গিয়েছিল, ঐ সভায় "স্বদেশী", বয়কট প্রভৃতি কোনও বিষয় উত্থাপিত হবে না। বহু চেষ্টায় কোনও পাকা খবর পাওয়া গেল না; সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো। সে-দিনের মত অধিবেশন স্থগিত রইল।

উগ্রপন্থীরা ৮-ই আলাদা কন্‌ফারেন্স করা স্থির করলেন। সভাপতি হলেন *মৌলভী আবদুল হক্ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

৮-ই (রবিবার) দুই বিভিন্ন স্থানে সকাল আটটায় সভা আরম্ভ হ'ল। দ্বিতীয় সভায় যোগদান করেন অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, ললিতমোহন (ঘোষাল) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। এখানে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন, "স্বরাজ", দেশ-প্রতিরক্ষা, "একঘরে" করা (social ostracism), জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আদি (মডারেট) কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হলেন সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার, জে. চৌধুরী প্রভৃতি। এখানে হাকিমী বাধা প্রধান অন্তরায় বলে পরিগণিত হ'ল।

উগ্রপন্থীদের সভা আরম্ভ হলে পুলিশ তা বন্ধ করে দেয়। তখন থিয়েটারের মাঠে পাঁচ হাজার লোক নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুর-ই ভবিষ্যৎ সুরাট-অভিনয়ের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেছিল।

হুগলী কন্‌ফারেন্স

যখন বৈপ্লবিক ঘটনার সাহায্যে হাওয়া অত্যন্ত গরম তখন কংগ্রেসের মধ্যে উগ্রপন্থীদের স্থান বিলুপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে। নানা ক্ষেত্রে দু'দলের রাজনৈতিক আলোচনার সম্ভাবনায় বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯০৯ সেপ্টেম্বর ৫ থেকে ৭-ই হুগলী-চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দর দলে তীব্র বিতণ্ডায় অরবিন্দর প্রস্তাব—পূর্ণ বয়কট (absolute boycott) সুরেন্দ্রনাথের বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। যতই দিন গেছে, এ বিরোধ উত্তরোত্তর বেড়েই উঠেছে। পরে গান্ধীজির আবির্ভাবে ধীরপন্থীরা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সমুদ্রমন্থন

'সন্ধ্যা'

কার্জ্জনের বঙ্গশাসন কীর্ত্তি যখন চরমে উঠেছে তখন যে-কয়টি পত্রিকা 'উগ্রপন্থী' বলে চলছিল, তারা আন্দোলনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না-পেরে পিছিয়ে পড়তে থাকে। সাধারণ মানুষের প্রকাণ্ড এক অংশ কার্জ্জনী অনাচারের একটা জবাব খুঁজছিল। এমন সময় ব্রহ্মবান্ধবেব কলম দিয়ে 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব সেটা সম্ভব করে তুলেছিল।

বাঙ্গলার রাজনীতির আকাশে যাঁরা বিপ্লবের রক্তটীকা এঁকে দেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। এটা বাঙ্গলার পক্ষে অগৌরবের কিছুই নয়; কারণ সব মানুষ একই ধাতুতে গড়া নয়। অতি সাহসী আর অতি ভীরু— এই দু'য়ের মাঝে নানা স্তর দেখতে পাওয়া যায়। এখানে মানুষের মনের সঙ্গে লড়াই করা চলে না, আর তাতে লাভও বিশেষ নেই।

জনসাধারণ কখনও খুব বেশী বিপদের কাজে এগিয়ে যায় না। কিন্তু প্রকৃত নেতার পরিচালনায় তাদের দ্বারাই আবার অসাধ্যসাধনও সম্ভব। এই বীর পরিচালকদের সংখ্যা চিরদিনই অতি অল্প; আঙ্গুলের ডগার পাঁচটিও লাগে না, তার মধ্যেই গুনে এ-সংখ্যা শেষ করা যায়। ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা ল্যালি (T. A. Lally) অতি মূল্যবান কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে—সমগ্র স্কটল্যাণ্ড নয়, ওয়ালেসের বুদ্ধি আর বিক্রমে এডোয়ার্ড হতভম্ব এবং বিফল হন। ইংল্যাণ্ড নয়, ক্রমওয়েল-ই একা সম্রাটকে গদিচ্যুত করেন। আর জন-পাঁচ-ছয় আমেরিকান মিলে যে কূটনীতি ও রণকৌশল প্রকাশ করেন, ইংরেজ সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে পরাভূত করতে পারেনি।

বাঙ্গলায় বিপ্লবের প্রথম যুগে ইতিহাসের সেই চিত্রই দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম ঝাঁকের মধ্যে ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মন থেকে বিদেশী মোহ সম্পূর্ণ দূর করে সেই স্থান দেশের অতীত গৌরব ও আত্মসচেতনায় পূর্ণ করতে। অপরে যখন স্বাধীনতার কল্পনা-বিলাসে মুগ্ধ, সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, তখন তিনি বলেছেন—"আমি চন্দ্র-দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবন-স্পর্শে যেমন শীতার্ত্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়, প্রিয়জনের সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দলহরী উথলিয়া উঠে, রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ

শুনিয়া আমার প্রাণে কি নূতন সাড়া পড়িয়া গেল !” (বলাই দেবশর্ম্মা ঃ “ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়”, পৃঃ ২৭)

তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—“আমরা নিজেদের তন্ত্র গড়িব আর ঐ স্বদেশী তন্ত্রের অধীনে মুক্তভাবে বিচরণ করিব।” সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সকল আচরণে দেশের কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর হবার নির্দ্দেশ তিনি দিতেন।

যখন অন্য পত্রিকা আবেদন, নিবেদন, স্তুতি, তোষামোদ, সতর্ক আলোচনার সাহায্যে বাঙ্গালীর অবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যস্ত, তখন সে-ধারার গতি অন্য পথে পরিচালিত করতে এগিয়ে আসে ‘সন্ধ্যা’। প্রতি বিকালে পত্রিকা প্রকাশিত হ’ত। শুরু থেকেই ব্রহ্মবান্ধবের সম্পাদনায় ‘সন্ধ্যা’ যে হৃদয়গ্রাহী, কৌতুকভরা, শ্লেষপূর্ণ, তেজোব্যঞ্জক, ভাবগম্ভীর ভাষায় সাধারণের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলতো, তা’তে প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই পত্রিকাখানি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

শুভ ১৯০৪ নভেম্বর ২৬-এ ‘সন্ধ্যা’ আবির্ভূত হয়। প্রথমদিকে রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব থাকলেও আলোচ্য বিষয় গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করতে পারেনি। তবে ইংরেজ-মাত্রেই তার কাছে ‘ফিরিঙ্গি’ নামে অভিহিত হয়েছে। ইংরেজ বলতেই এক উচ্চশ্রেণীর সভ্য মানব, শক্তিমান, সাহসী, রাজার জাতি বলে জনসাধারণের মনে যে ধারণা গজিয়ে উঠেছিল, তার পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা নিম্নমানের এক জীব বলে বাঙ্গালীর মনে তাদের সম্বন্ধে চিত্র গড়ে তোলা হয়। প্রতিপক্ষ আমার চেয়ে কোনও রকমে ‘বড়’ নয়, এই বোধ ক্রমে জাতীয় সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে। আমরা যে কারও অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নই, এটাই ছিল ‘সন্ধ্যা’র প্রচারমন্ত্র। ১৯০৫ জানুয়ারী ১১-ই ‘সন্ধ্যা’ প্রশ্ন করে বসলো—“ইংরেজরা আমাদের ভাবে কি ?” উদ্দেশ্য, আমাদের আসল রূপ ফিরিঙ্গিরা চিনতে পারেনি। পরের দিনই অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে বলে যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেয়ে ‘কালা ফিরিঙ্গি’র হাতের অস্ত্র বেশী মারাত্মক, অঘটন ঘটাবার পক্ষে তাদের সুযোগ ও প্রবৃত্তি অনেক বেশী। উপহাস করে ‘সন্ধ্যা’ বললে যে, “ফিরিঙ্গিরা দুঃখকষ্ট-জর্জ্জরিত বাঙ্গালীকে ঐ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করলে তাদের পুরস্কৃত করা হবেনা কেন !”

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে যখন তিব্বত-অভিযান নিয়ে লর্ড কার্জ্জন হাওয়াটা বেশ ঘুলিয়ে তুলেছেন তখন থেকে ‘সন্ধ্যা’ যুক্তিপূর্ণ কটু সমালোচনার দ্বারা নিজ শক্তি প্রকাশ করে। তারপরে ‘কাবুল মিশন’—কাবুলের ব্যাপারে গূঢ় হস্তক্ষেপ। ভারতের খরচে ইংরেজের বিলাস ও শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে ; ভারতের কোন লাভের লক্ষণ এসব ব্যাপারে দৃষ্ট হয় না।

এর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কার্জ্জনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-বক্তৃতা। তার তিক্ত আক্রমণে প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকা একযোগে কার্জ্জনকে নিন্দাবাদ বা গালিবর্ষণ করতে থাকে। তখন ‘সন্ধ্যা’র ভাষা আর এক ধাপ উঁচুতে ওঠে এবং

পাঠকের মন কার্জ্জন তথা ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ করে তুলতে সক্ষম হয়। ঐ বক্তৃতার প্রতিবাদে টাউন হল্-এর সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেটা ব্রহ্মবান্ধবের কাছে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য, বিফল। তিনি বলেন, এই সভায় ফিরিঙ্গিকে সর্ব্বরকমে বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল। ১৯০৫ এপ্রিল ৫-ই 'সন্ধ্যা' বলে—"এতদিন যে ইংরেজি বইপত্রে আমাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধোঁকা দেওয়া হচ্ছিল, কার্জ্জনের বক্তৃতা সে-মোহ সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছে।" এ-সময় জাতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে 'সন্ধ্যা' লেখে (১৯০৫ এপ্রিল ২৩-এ)—"এখন আমাদের বিলুপ্ত আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বিদেশী শৃঙ্খল আমাদের কায়িক বন্ধন ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু তাই দিয়ে আমাদের মনের দাসত্ব ঘটতে দেব না। ইংরেজ শাসন সমগ্র ভারতবাসীকে একটা দাস জাতিতে পরিণত করেছে" (১-৭-০৫)।

এইবার আসছে বঙ্গ-ভঙ্গের গুজব। সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা গর্জ্জে উঠেছিল একযোগে। 'সন্ধ্যা'র ভাষা সকলকে ছাপিয়ে গেল এবারও। দিনাজপুরে বক্তৃতা-কালে লালমোহন ঘোষ ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগের রব তোলেন। 'সন্ধ্যা' (২৪-৭-০৫) তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে দেশবাসীকে কর্ম্মপন্থা-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন সমর্থন করার জন্য বড় বড় কথার পরিবর্ত্তে 'সন্ধ্যা' কাজ করার নির্দ্দেশ দিয়েছে (২৪-৭-০৫)।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স সমাপ্তির পর লাঠির বদলে লাঠির পরামর্শ (১৯-৪-০৬) এসেছে। এখন "অত্যাচার সহ্য করা সমস্ত জাতির অপমানের নামান্তর। প্রতিহিংসা সকল সময়েই পাপ নয়; জীবন-সংগ্রামে এরও যথেষ্ট মূল্য আছে। বরিশাল তাণ্ডবের পর আর বাজে বক্তৃতা শোভা পায় না; 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা এখন ভাবতে হবে। আর ফিরিঙ্গির কাছে দরবার না করে প্রতিবিধানের জন্য গোপনে যে প্রস্তুতি হচ্ছে এটাই বর্ত্তমানে প্রধান লাভ" (২১-৪-০৬)।

খোঁচা দেবার সুযোগ পেলে, 'সন্ধ্যা' ছাড়তো না। কার্জ্জন-পত্নীর মৃত্যু ঘটে—জুলাই ১৯-এ। 'সন্ধ্যা' মন্তব্য করলো (২১-৭-০৬)—"গতবছর ঐ তারিখে ভারত সরকার বিলাতের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বঙ্গ-বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মহিলার মৃত্যুর আগের দিন যে-হাতী আরোহণে তিনি আর তাঁর পতি দিল্লী দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেটি মারা যায়।" মনে হতে পারে 'সন্ধ্যা'র মতে এই ঘটনা-পরম্পরা কার্জ্জনের প্রতি বাঙ্গালীর অভিশাপের ফল।

ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে আর কোনও অবগুণ্ঠন রইল না। "পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে এ-সময় যদিই বা কোন বাধা থাকে, তবু আমাদের লক্ষ্য যে অন্য কিছু নয়, সে সম্বন্ধে সামান্য ভ্রান্ত ধারণা যেন মনের কোণেও স্থান না পায়" (২০-৯-০৬)। স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করে মায়ের পূজায় যদি কারাবাস ঘটে তা'তে দেহে শক্তি সঞ্চারিত হবে।

'সন্ধ্যা'র প্রবন্ধ বলছে (১৬-২-০৬)—"এইবার জেলে যাবার সময় হয়েছে ; বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে দেশসেবার যোগ্য পুরস্কার মিলবে।" পত্রিকার মতে যে-নেতারা কেবল ভারত-শাসনের কঠোরতা দূর করতে চান (২৩-২-০৬) তাঁরা আর স্বাধীনতার কথা চিন্তা করছেন না।

"ইংরেজ শক্তের ভক্ত, দুর্ব্বলের যম। সে একমাত্র কামান-গোলাগুলির গর্জ্জন, তরবারির ঝন্‌ঝনা বুঝতে পারে। বাঙ্গালী শক্তি সঞ্চয় করে মারের বদলে ফিরিয়ে মার দিলেই ইংরেজ বন্ধুত্ব-স্থাপনে চেষ্টা করবে" (২৫-১০-০৬)।

"বিদেশীর অনুকরণে আমাদের চলবে না ; আমরা নিজেদের আদর্শে শাসন-ব্যবস্থা ঠিক করবো এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাইতে বাস করবো। যদি ইংরেজ তার বিরুদ্ধাচরণ করে আমাদের সমস্ত সুপ্ত শক্তি সঞ্জীবিত করে তার বিরুদ্ধাচরণ করবো। ফিরিঙ্গির সহায়তা বা শত্রুতার প্রতি দৃক্‌পাত না করে আমরা সর্ব্বস্ব-পণে অগ্রসর হ'ব। তাই দেখে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলবে। ফিরিঙ্গির প্রতি মোহ আমাদের দূর করতেই হবে। ফিরিঙ্গির এই কুহকে অভিভূত হয়ে ভুলে গেছ, তুমি অন্তর্নিহিত কত বিরাট শক্তির অধিকারী। সিংহশিশু ক্ষণমাত্রও তার 'সিংহত্ব' বিস্মৃত হয় না" (৬-১১-০৬)।

"রান্নাঘরে কুকুর প্রবেশ করলে গৃহস্থ হাঁড়ি ফেলে দেয়, আর কুকুরটাকে মেরে তাড়ায়। সদর দরজায় চোর-ডাকাত বা আগন্তুকের আগমন-সঙ্কেত দেবার জন্য কুকুর পোষা ; তাকে ঠাকুরঘরে কেউ স্থান দেয় না। যারা সে কাজ করে তাদের ভর্ৎসনার যোগ্য ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না" (৮-১-০৭)।

"যেমন পারবে সরাসরি মার ফেরত দেবে। যদি কপালে একটা ঘুষি জোটে সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে সে ঋণ পরিশোধ করতে ভুল যেন না হয়। মরণের আবার ভয় কি ? যে গান প্রকাশ্যে সকলে গায়, সেটা হচ্ছে—

'যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে—'

দ্বন্দ্বক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়া শ্রেষ্ঠ নীতি" (১১-১-০৭)।

উদাত্ত কণ্ঠে 'সন্ধ্যা' বলছে (২৭-৪-০৭)—"শক্তি সঞ্চয় কর, স্বদেশী যাত্রার পত্তন কর, স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যাবার এবং ফিরিঙ্গির অপপ্রচেষ্টা প্রতিরোধের সঙ্কল্প গ্রহণ কর।" লুণ্ঠনের আভাস দেওয়া হচ্ছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়—"আজ যে লাঠি স্বদেশী দমন কার্য্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, একদিন সেই লাঠির সাহায্যে সরকারী তোষাখানা লুণ্ঠিত হবে।"

এইবার যুদ্ধারম্ভের প্রস্তুতিপর্ব্ব। লোকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে : 'লড়াইয়ের হাতিয়ার কোথায় ?' উত্তর : চিন্তার কোন কারণ নেই—"মারণাস্ত্র সংগ্রহের

সুবিধা আছে নানা রকমের। যে বোমা তৈরী হচ্ছে তাতে আমাদের সংগ্রামের ধারা ফিরে যাবে। এ বোমা কেবল সস্তা নয়, হাতের মুঠোয়, না হয় পকেটে করে নিয়ে বেড়ানো যাবে। অস্ত্রশস্ত্রই বড় কথা নয়। একদল যুবক চাই যারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বাস করবে যে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন এবং সেটা না দেখে তারা মরতে চাইবে না। নাস্তিক ক্লীবের দল দেশের বিরাট শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দেশের নিভৃত অঞ্চলে যে শক্তি নিহিত আছে তার দ্বারা মহাবিপ্লব সংসাধিত হবে। জাগ্রত যুবশক্তি ধীর স্থির ভাবে তাদের কাজ করে চলেছে যাতে মহাশক্তি দেশমাতৃকা আনন্দমঠের সিংহাসনারূঢ়া হয়ে আবির্ভূতা হবেন। হতাশ হয়ো না" (১৩-৫-০৭)।

"প্রত্যেক গ্রাম, অঞ্চল, হাট, বাট, আবাস দুর্গে পরিণত করতে হবে। লাঠি, সড়াকি, গুপ্তি, ছোবা প্রভৃতি অস্ত্র প্রতি হাতের শোভাবর্দ্ধন করবে। তীর-ধনুক এবং 'কালীমায়ির বোমা' প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে হবে। এই বোমা আগুন দিয়ে ধরাতে হবে না। গুণ্ডাদের মধ্যে সামান্য জোরে ফেলে দিলেই প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশ জন ধরাশায়ী হবে। অতি সস্তায় এই শস্ত্র প্রচুর তৈরী হবে, সাবধানে রাখতে বেশী জায়গা নেবে না। দরকার হলেই এ বোমা তৈরী করে নেওয়া যাবে।" (১৪-৫-০৭)। "অতএব সাহসে ভর কর; আকাঙ্ক্ষিত দিন আগতপ্রায়।" এই বোমার ওপর 'সন্ধ্যা' খুব আস্থা স্থাপন করেছিল। দীর্ঘ প্রবন্ধে (৪-৫-০৮) ব্রহ্মবান্ধব এর সমর্থন জানিয়েছেন—প্রবন্ধের শিরোনামাই ছিল : "কালীমায়ির বোমা"।

শত্রুর প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারিত হয়েছে (২২-৭-০৭)। রাজদ্রোহের মামলায় সাজা হয়ে চলেছে। "সংগ্রামের প্রহসনে পলাশীর আমবাগানের অন্তরালে থেকে বাঙ্গলা জয় করা হয়নি ; হয়েছে জাল-জালিয়াতি-জুয়াচুরির সাহায্যে। বাঙ্গালী এ সাজা-শাস্তিতে ভয় পাবে না। উপরন্তু সে কত শক্তির অধিকারী তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যাবে। কেউটের ল্যাজে পা দিয়ে যারা নিজেদের শৌর্য্য জাহির করতে চায়, তারা যেন তার বিষদাঁত আর ছোবলের কথা মনে রাখে।"

" 'মা ভৈঃ !' সন্তান সব জেগেছে। চারিদিকে তার সাড়া পড়ে গেছে।" ··· "এক প্রশ্ন, স্বাধীনতার সৈকতে পৌঁছুতে আর কত দেরী ? মনে হতে পারে ফিরিঙ্গি তার সর্ব্বশক্তি-প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করবে। সে ভূতের ভয় আমাদের আর বিব্রত করবার কথা নয়। প্রহারের চোটে ভূত পালাবে। মায়ের দেউলের পশ্চাতে নানা প্রহরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে ; সংগ্রহ করবার বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। সঙ্কল্প যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন সিদ্ধিলাভের আর বিশেষ বিলম্ব নেই" (৬-৮-০৭)।

"আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিকট হিমালয়ের উচ্চতা খর্ব্ব বলে মনে হবে ; আমাদের অন্তরে আগ্নেয়গিরির রুদ্ধ বেদনা। আমরা ভারতের মুক্তি চাই। আমাদের অঙ্গন থেকে কি-ভাবে ফিরিঙ্গি বিতাড়ন সম্ভব হবে, আমাদের শিক্ষার ধারা কেমন করে

রক্ষিত হবে এবং ঋষি-আচরিত বিধি কি-ভাবে পালিত হবে, এই আমাদের একমাত্র চিন্তা।

"অন্তরে চিন্তার আগুন জ্বলে উঠেছে ; তার মূল আমরা খুঁজে পাইনি। স্বর্গ আমরা চাই না ; মুক্তি আমাদের কাম্য নহে। যতদিন না মায়ের বন্ধন-মুক্তি ঘটছে, ততদিন আমরা বারে বারে ভারতে জন্মগ্রহণ করবো। তারপর আসবে সংসার-বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি।

"আমরা অতীত গৌরবের অধিকারী ; আমরা নিত্য, শাশ্বত, অমর। সমর-ক্ষেত্রে এসে তোমরা সকলে সমবেত হও। তখন দেশের নানা স্থানে প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে যাবে। মায়ের সন্তান সব আগ্নেয়, বারুণি ও বায়ব্য অস্ত্র শাণিত করে রণক্ষেত্রে ছুটে আসছে। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও ; মুক্তি আসন্ন ; মৃত্যুর পূর্ব্বে আমরা শৃঙ্খলমুক্ত মাতৃদর্শন করে যাবো। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ" (১৩-৮-০৭)।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড-এর ওপর 'সন্ধ্যা' অসম্ভব বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করতেও ছাড়তো না। একদিন দেখা গেল, পত্রিকার বৈশিষ্ট্য রেখে ছাপা হয়েছে—

"My name is কিংস্-ফর্দ্দ
I am a great মর্দ্দ।
আমি জন্মেছি in England
My father mother you understand" ··· ইত্যাদি, ইত্যাদি

১৯০৮ সেপ্টেম্বর ৬-ই প্রকাশিত হয়েছিল—"কসাই কাজী কিংস্‌ফোর্ড বলেছে যে, এক মাসেই সিডিসন বন্ধ করা যেতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, যে কাজী এখন এক ভাঙ্গা ঢাক ; আর তার আনন্দ হচ্ছে ভূপেন, সুশীল ও বসন্তকে সাজা দিয়ে। 'কত হাতী ঘোড়া গেল তল, এখন মশা (ভেড়া) বলে এক হাঁটু জল।' যত পার গলা ফাটাও, কিন্তু মনে রেখ কাজী, তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।"

যখন দেখা গেল 'সন্ধ্যা' আগুন ছড়াচ্ছে, তখন সম্পাদককে আইনের প্যাঁচে ফেলবার সব বন্দোবস্ত আরম্ভ হ'ল। অন্যদিকে, রাজসাহীর এক পত্রপ্রেরকের সংবাদ 'সন্ধ্যা'য় ছাপা হয়। অতে ছিল যে, কাজলা সিল্ক-ফ্যাক্টরির (রামপুর-বোয়ালিয়া) ম্যানেজার রবার্ট ম্যালকম (Malcolm) একটি বালক-কর্ম্মীকে প্রহার করে আর তার ফলে অন্য কর্ম্মীরা এসে সাহেবের সঙ্গে খুব হটিচটি করে। এর বিরুদ্ধে ম্যালকম রাজসাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নালিশ করাতে ১৯০৬ সেপ্টেম্বর ৫-ই সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা জারি করা হয়। পুলিশ সেপ্টেম্বর ৭-ই রাত ৯-টায় ১৯৩-নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে হানা দিয়ে ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করে। পরে পাঁচশত টাকার মুচলেকা নিয়ে জামিন দেয়। সেপ্টেম্বর ১৪-ই রাজসাহীতে হাজির হবার কথা। শেষ পর্য্যন্ত এর একটা রফা হয়েছিল।

এবার অভিযান অন্যক্ষেত্রে। ১৯০৭ আগষ্ট ৩০-এ তারিখে ২৩-নং শিবনারায়ণ দাস লেনে হানা দিয়ে মুদ্রাকর সারদাচরণ সেনকে গ্রেপ্তার করে জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় দুই ভদ্রলোক জামিন হয়ে তাঁকে তখনকার মত মুক্ত করে আনেন। পরে ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ৩-রা 'সন্ধ্যা' অফিসে সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করলে, তিনি আদালতে হাজির হন। কোর্ট থেকে মামলার দিন স্থির করে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। আগষ্ট ১৩-ই তারিখের প্রবন্ধ 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ বলে জানা যায়।

তখন 'সন্ধ্যা' বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। অনেকগুলি প্রবন্ধ পত্রিকার রাজদ্রোহসূচক মনোভাব প্রকাশ কবে বলে উল্লেখ করা হয়। আগষ্ট ৮-ই (১৯০৭): 'যুগান্তরে রক্তারক্তি ফিরিঙ্গিদের ফাটলো পিত্তি'; আগষ্ট ৯-ই: 'ঢিলের বদলে পাটকেল'; আগষ্ট ১২-ই: 'কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা, একটা কালো একটা সাদা'; আগষ্ট ২০-এ: 'সিডিসনের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গিদের আক্কেল গুড়ুম'; আগষ্ট ২১-এ: 'ফিরিঙ্গি পরম দয়ালু, ফিরিঙ্গির কৃপায় দাড়ি গজায় শীতকালে খাই শাঁকালু'; ইত্যাদি, ইত্যাদি। আগষ্ট ৯-ই তারিখে 'সন্ধ্যা' লেখে: "কালীমায়ের চরণে ফিরিঙ্গির সমস্ত দোষ ও গুণ বলি দিতে হবে। বিরামবিহীন অত্যাচারই ফিরিঙ্গির মহাপাপ, এর যথোপযুক্ত প্রতিফল তাকে পেতেই হবে।"

মামলার আসামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সারদাচরণ সেন ও হরিচরণ দাস। হরিচরণ মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। সেপ্টেম্বর ২৩, মামলা ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পাদক তাঁর এজাহারে বলেন:

"'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রচার ও পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। আমি বলছি অন্যান্য 'আপত্তিকর' প্রবন্ধের সঙ্গে এই মামলার বিষয়ীভূত এবং ১৩-ই আগষ্ট প্রকাশিত 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধের লেখক আমি। এই মামলায় আমি আর কোন অংশগ্রহণ করতে চাই না, কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে বিধিনির্দ্দিষ্ট স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টায় অকিঞ্চিৎকর অংশগ্রহণের জন্য আমাদের বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাছে আমি কোন জবাবদিহি করতে বাধ্য। আমাদের জাতীয় উন্নতি ও তাদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী।"

আসামী বয়স্ক, বিদ্বান, পত্রিকার সম্পাদক। সুতরাং আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে না রেখে, একটু বসবার ব্যবস্থা করলে হাকিমের এজলাসের কোনও অসম্মান হ'ত না। তা'ছাড়া তিনি এ-সময়ে অসুস্থও ছিলেন। আসামী পক্ষের উকিল এ প্রসঙ্গ তুললে, আসামী বলেন যে, তিনি বিদেশীর আদালতের কাছে কোনও কৃপার ভিখারী ন'ন। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন সারাক্ষণ, ফলে তাঁকে হার্নিয়ার ব্যথায় কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে-কথা তিনি কাউকে জানতে দিলেন না।

মামলার পরের তারিখ হ'ল ১৯০৭ অক্টোবর ২৩-এ। আসামী পক্ষের উকিল

ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন যে আসামী গুরুতর পীড়িত অবস্থায় ক্যাম্পবেল (বর্তমান 'নীলরতন সরকার') হাসপাতালে পড়ে আছেন। হাকিম তো খাপ্পা, কিছুতেই আসামীর অনুপস্থিতি ক্ষমা করতে চান না। তলব পাঠানো হ'ল। হাসপাতালের শল্য-চিকিৎসক লিখে জানালেন যে, আসামীর পক্ষে অন্ততঃ এক মাস আদালতে হাজির হওয়া অসম্ভব। সরকারী উকিল এই লিখিত মতামতের কোনও মূল্য দিতে চাইলেন না। তাঁর আবেদন যে, চিকিৎসক নিজে আদালতে হাজির হয়ে শপথ নিয়ে এ-কথা বলুন। হাকিম অবশ্য সে-আবেদন না মঞ্জুর করেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে 'সন্ধ্যা'র দ্বিতীয় মামলা রুজু করা হয়। একটা মামলার নিষ্পত্তি নেই, আরও মামলা জমা হতে লাগলো। তাই হাকিম আসামীর বিচার ত্বরান্বিত করতে লেগে যান। কে জানে, জেলের বাইরে থাকলে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হয়তো আরও বিদ্বেষ ছড়াবার সুযোগ থেকে যাবে।

রোগের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে। যন্ত্রণার সীমা নেই, কিন্তু রোগীর কাছে তার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। সার্জ্জনরা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড (strangulated) হার্নিয়ার জন্য অস্ত্রোপচার করলেন। অস্ত্রোপচারের আগে রোগী বললেন যেন ওষুধ-প্রয়োগে তাঁকে অচেতন করা না হয়—তিনি সজ্ঞানে সমগ্র যন্ত্রণা (উপ)ভোগ করবেন। অস্ত্রোপচারের পর তিনি পূর্ণজ্ঞান ফিরে পেয়েই সারদার কথা ছেড়ে দিয়ে হরিচরণের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সে নিতান্ত 'বালক', তার যেন কোনও শাস্তি না হয়, সে অনুরোধ করেন তাঁর উকিলকে।

হাসপাতালে আশেপাশের লোকজন তাঁর রোগ ও আদালতে শাস্তি-সম্ভাবনার কথা যখন আলোচনা করছিলেন (অক্টোবর ২৬-এ) তখন তিনি বলেন যে, কয়েদীরূপে তিনি কখনই ফিরিঙ্গির জেল খাটবেন না। জীবনে তিনি খেয়ালখুশির হুকুম মানেননি ; জীবনসায়াহ্নে আইনের দোহাই পেড়ে তারা তাঁকে জেলে পাঠাবে আর তিনি অহেতুক বাজে খেটে মরবেন, এ ঘটনা তিনি ঘটতে দেবেন না। তিনি বলেছিলেন—"আমার ডাক এসে গেছে"।

অস্ত্রোপচারের পর অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ক্ষত দূষিত হয়ে তাঁর ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায় ১৯০৭ অক্টোবর ২৬-এ। পরদিন সকালেই উদ্বেগের কারণ দেখা দেয় এবং তাঁর জীবনের আশা পরিত্যাগ করতে হয়। মধ্যরাত্রে (অক্টোবর ২৭-এ) দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক, অমিততেজা বীর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত এই বীরের তিরোধানে ইংরেজ সরকার স্বস্তি পেয়েছিল।

ব্রহ্মবান্ধবের অকৃত্রিম দেশপ্রীতি এবং দেশের অকুণ্ঠ সেবা ও আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে প্রকাণ্ড জীবনী লেখা যায়। যে কয়খানি আছে, তা'তে 'ভরিল না চিত্ত'।

ব্রহ্মবান্ধবের তিরোধানের পর 'সন্ধ্যা' তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেয় (২৯-১০-০৭)। তাঁর মতে, যারা দেহ ও আত্মাকে অভিন্নরূপে দেখেছে তাদের কাছে অত্যাচার বা কঠোর নির্য্যাতনের কোনও মূল্যই নেই। দেহটাকে যে ছেঁড়া নেকড়ার মত ঘৃণার চোখে দেখে, তাকে অত্যাচার দমন করে রাখতে পারে না। তিনি বলেছেন—"আমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, জীবনে আমার কোনও ভয় নেই। যদি ফিরিঙ্গি আমাকে যন্ত্রণার যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করে, আমি দেহটাকে ঠন্‌ঠনের চটির মত তার মুখের উপর ফেলে দেব।"

তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্যদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করেছিল। তিনি বলতেন—"আমি কালা ফিরিঙ্গিকে বেশী ভয় করি, তারা ফিরিঙ্গিব আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দার মোহে অন্ধ হয়ে পড়েছে। ফিরিঙ্গির বিলাসের তাপে আমাদের দেশ-জাত, অনবদ্য সামাজিক রীতিনীতি সব শুকিয়ে যেতে বসেছে। দেশকে রক্ষা করতে হলে ফিরিঙ্গির ম্লেচ্ছ আচার-ব্যবহারের স্রোত রুদ্ধ করতে হবে এবং দেশবাসীকে বোঝাতে হবে যে, ঐগুলো আমাদের জাতীয় চরিত্রের পক্ষে হানিকর; তাদের মূলোচ্ছেদ করে দেশান্তরিত করতে না পারলে দেশের মঙ্গল নেই। ফিরিঙ্গির আচার-ব্যবহারের প্রতি অস্বাভাবিক প্রেমই এদেশে তাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছে। আজ আমাদের সে-সকলকে ঘৃণা করতে শেখাতে হবে।"

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা (১৯০৭ অক্টোবর ২৮-এ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছিল—"ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু প্রমাণ করেছে যে, যখন অশালীন জিঘাংসা তাঁকে নির্য্যাতিত করছিল আর বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ তার হাতকড়া ও বন্দুকের গুলি নিয়ে যখন জয়ের আশায় উৎফুল্ল, তখন শমন তার অপ্রমেয় শক্তিতে আক্রান্তকে সকল শাসনের বাইরে নিয়ে চলে গেল এবং স্বাধীনতা-লাভ সম্বন্ধে লোকের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো। মনের মধ্যে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তা এই অদম্য ও অজেয় জাতীয়তাবাদীর মৃত্যুতে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে সপ্রমাণিত হ'ল যে, শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জয় অবশ্যম্ভাবী।"

পূর্ব্ব হতেই ব্রহ্মবান্ধবের নামে মামলা যখন ঝুলছে, সে-সময়ও 'সন্ধ্যা'র প্রবন্ধের তীব্রতা মোটেই হ্রাস পায়নি। "ঝড়ের আগে থমথমে (lull) ভাব" আখ্যায় ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ২৭-এ এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল—"গীতার শিক্ষা আমাদের বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। স্বয়ং ভগবান যাদের পূর্ব্ব হতেই নিহত করেছেন আমরা তাদের বিনাশ সাধন করব। সকল দেশই যাতে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, জয়যাত্রায় একটা উদ্বোধন করতে পারে তার জন্য ভগবান মানসিক জড়তা দূর করেন এবং শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেন।"

এই ভাবের লেখা সমানে চলতে থাকে এবং মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে ১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ২৯-এ তাঁর

দু'বৎসর কারাবাস ও এক হাজার টাকার জরিমানা করা হয়। সে-সময় 'বন্দে মাতরম্' লেখে (১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ১৩-ই)—"মানবেন্দ্র তাঁর গুরুর সুনাম রক্ষা করে চলেছেন, এবং তাঁরই মত সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন। জেলের বিভীষিকা নেই ; স্বাধীনতার স্পৃহা আর দমিত হতে চাইছে না ; কর্ত্তৃপক্ষকে তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নূতন অস্ত্রের আবিষ্কার করতে হবে।"

মাঝে মাঝে টানাটানি চললেও 'যুগান্তর'-এর মত 'সন্ধ্যা' সংবাদ-দলন-আইনে বন্ধ হয়ে যায়নি। সতর্কতার সঙ্গে জাতীয় ভাব প্রচার করে গেছে। পূর্ণ ১৯০৮ সাল ধরে প্রকাশিত হবার পর, ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। 'যুগান্তর' পত্রিকার পূর্ব্বে 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব। জাতীয়তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল 'সন্ধ্যা'। তারপর এসেছে অন্যান্য পত্রিকা। বাঙ্গলার বিপ্লবে 'সন্ধ্যা'র অবদান যে কতখানি আজ তার হিসাব করা কঠিন। তবে বাঙ্গলার বিপ্লবের ইতিহাসে 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে 'সন্ধ্যা'র নাম গৌরবের সঙ্গে লেখা থাকবে।

'যুগান্তর'

'সন্ধ্যা' যে সুরে সাধারণেব মন গড়ে তুলছিল, বঙ্গভঙ্গের পর সে-কাজের জন্য আরও চড়া পর্দ্দা দরকার হয়ে পড়ে, আর সেই অভাব মেটাবার জন্যই 'যুগান্তর'-এর আবির্ভাব। অবশ্য 'সন্ধ্যা'র মর্য্যাদা এতে ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয় ; সে তার নিজের বৈশিষ্ট্যে পরিচয় লাভ করেছে। অর্দ্ধশিক্ষিত, এমন-কি অশিক্ষিত লোকের কাছে 'সন্ধ্যা' ছিল 'যুগান্তর' অপেক্ষা অনেক বেশী প্রিয়।

আলিপুরের হাকিম বার্লি বলেছিলেন যে, 'যুগান্তর'-এর চেয়ে প্রকাশ্যভাবে 'সন্ধ্যা' খুন ও বিপ্লবের কথা লিখছে ঃ "This paper was advocating murder and revolution in plainer language than the *Yugantar*."

যুগদেবতা কোথা দিয়ে কি ঘটান, সেটা সকল হিসাবের বাইরে। এর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে বার করা কঠিন। "এইরকমই হয়" কথাটা মেনে নেওয়াই সহজ পথ ও বুদ্ধিমানের কাজ। যখন যুবকদের বিপ্লবী সত্তা যথোচিত ভাষার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছে, যখন মরণের ডাক ছড়িয়ে দেবার জন্যে আত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন রূপ নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল 'যুগান্তর'। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসের অনুকরণে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পত্রিকার এই নামটি দিয়েছিলেন। সমকালীন যত পত্রিকা মারমুখী জাতীয়তা প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল, তার মধ্যে 'যুগান্তর'কে শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিতে হয়। অপর সাধারণের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, যাঁরা ঘর ছেড়ে হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে বেরিয়েছিলেন এবং বড় বড় রাজদ্রোহের মামলার প্রধান আসামী হয়েছিলেন, তাঁরাও বলেছেন—চঞ্চল চিত্তে উৎকর্ণ হয়ে যে বাণী শোনার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, 'যুগান্তর' এসে সেই অভীঃ-মন্ত্র শুনিয়েছে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা

করার সময় দেয়নি, অজানার ডাকে কেবল সামনেই টেনে নিয়ে গেছে, কোথাও-বা অনির্দ্দিষ্ট কাল কারাবাস ঘটিয়েছে, নির্ব্বাসন, নির্য্যাতনের চরম ক্লেশ নীরবে সহ্য করতে শিখিয়েছে, আর না-হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে পরজন্মে আবার দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য রণাঙ্গনে এনে উপস্থিত করেছে। কানাইলাল দত্ত বলেছিলেন—"আপীল করে বৃথা সময় নষ্ট করে কি হবে? যে-ক'দিন আগে মরতে পারি, সে-ক'দিন আগে আবার মায়ের কোলে ফিরতে সুযোগ পাব, আমার বয়স সে-ক'দিন বেড়ে যাবে।"

'যুগান্তর' পত্রিকার আবির্ভাব ১৯০৬ সালের মার্চ ৩-রা। পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মে চেদীরাজের অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, নব নব অশুভ লক্ষণ তাঁর রাজ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, ১৯০৬ সালে বাঙ্গলা সরকারের মনে সে-অবস্থা হয়ে থাকবে। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠেনি; 'সূচনায়' হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল—"ভারতবাসীর একটা নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই।" 'যুগান্তর'-এর ভাষা পাওয়া যাবে না। ইংরেজের গুপ্ততথ্য-রক্ষণাগারে যে ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, পর পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা তারস্বরে বলছে—"কোষমুক্ত তরবারি অত্যাচারীর হাতে শক্তিহীন, কিন্তু তারাই আবার ন্যায্য অধিকার বা ধর্ম্মরক্ষায় দুর্দ্দম দুর্ব্বার অপরিমিত শক্তির আধার।"

"রাজার ভয় কোথায়?"—প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধ বলছে—"অত্যাচারজর্জ্জরিত লোক যদি একবার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, জীবন উৎসর্গ না করলে শত বৎসরের দাসত্ব মোচন হয় না, সেই মনোভাবই শাসক-গোষ্ঠীর বিপদের কারণ।"

আবার বলছে—"পাঠকের মনে হতে পারে যে, তারা অতি দুর্ব্বল অথচ প্রবল-পরাক্রান্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি তাদের কোথায়?" উত্তর: "মা ভৈঃ! ইটালী রক্তস্রোতে আপনার মসী-রেখা মুছে ফেলেছে।··· আজ কি দশ হাজার বাঙ্গলার সন্তান পাওয়া যাবে না, যারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচন করতে বদ্ধপরিকর।"

"অর্থের প্রয়োজন?": "এসে যাবে; লুঠ ও ট্যাক্স আদায় করে অভাব মেটাতে পারা যাবে।"

কষ্টে সংগৃহীত মাত্র দু'শ'টি টাকার ওপর নির্ভর করে পত্রিকা-প্রচারের দুঃসাহস জেগেছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও দু'-একটি সমচিন্তাশীল সঙ্গীর মাথায়। এঁরা ছিলেন—দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন ৪১-এ-নং চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনে অফিস অবস্থিত, এবং ৩৬-নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস'-এ 'যুগান্তর' মুদ্রিত হ'ত। বলা বাহুল্য, একটা নির্দ্দিষ্ট ছাপাখানা থেকে রূপ নিয়ে বেরুবার সৌভাগ্য তার হয়নি। মে মাস থেকে 'সাধনা প্রেস' থেকে ছাপা আরম্ভ হয়; প্রেসের মালিক হরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

বড় মজার অফিস। পত্রিকা-পরিচালনা-সংক্রান্ত জন-পাঁচ-ছয় যুবক ছাড়া আর দু'-চারজন কখনও আসে কখনও যায়, তাদের নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কাগজ বেরুচ্ছে, সপ্তাহে মাত্র একদিন। মূল্য এক পয়সা, বাৎসরিক চাঁদা দেড় টাকা মাত্র।

কাগজ-বিক্রি থেকে যা আসে আর তার থেকে যা যায়, তার পরিমাণ হিসাব করার প্রয়োজন হ'ত না। একটা কাঠের বাক্স ছিল কর্ম্মকর্ত্তাদের ব্যাঙ্ক। প্রায়ই ফাজিল জমা থাকত, তখন বাইরে থেকে কিছু সংগ্রহ করার প্রয়োজনই স্বাভাবিক। 'যুগান্তর'-পরিচালনা-সম্পর্কিত আর্থিক ব্যাপারটা জোঁদা কমিউনিষ্টকে হার মানিয়ে দেবে। সেখানে নির্দ্দিষ্ট অংশ, অধিকার, লাভ-বণ্টন, কর্ত্তৃত্ব সবই ন্যস্ত ছিল একই সময়ে সবার ওপর। রাজদণ্ড-ভোগটা উপরন্তু লাভ।

'যুগান্তর' পত্রিকা যখন বাইরে আসর গরম করে তুলছে, তার অন্দরমহলের চিত্রটা জানায় আনন্দ আছে। অন্যতম সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন ('নির্ব্বাসিতের আত্মকথা')—

" 'যুগান্তর' বাহির হবার পর লোকে কানাকানি করে যে যুগান্তরের আড্ডাটা না কি বিপ্লবের কেন্দ্র। ...

"দুই চারিদিন আনাগোনা করিতে করিতে ক্রমে যুগান্তরের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। দেখিলাম সকলেই জাতকাট ভবঘুরে বটে। দেবব্রত (ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বি.এ. পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিলেন। হঠাৎ ভারত উদ্ধার হয়-হয় দেখিয়া, আইন ছাড়িয়া 'যুগান্তরে'র সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এই পাগলাদের সংসারে গৃহিণী। বিশেষ 'যুগান্তরে'র ম্যানেজারি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর-সংসারের অনেক কাজেরই ভার তাহার উপর। এই 'আড্ডা'টি ছিল ২৭-নং কানাই ধর লেনে।"

ইংরেজ-বিতাড়নে যারা বদ্ধপরিকর, তাদের কারখানা, অস্ত্রাগার, তোপ, কামান, বন্দুক, গোলাগুলির বহরের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন ঃ "৩।৪ জন যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।" প্রকৃতপক্ষে এইখান থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে তাতেই বিপ্লবের দাবাগ্নি সৃষ্টি হয়ে ভারতকে গ্রাস করেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

সম্পাদকদের মধ্যে প্রথমদিকে দেবব্রত ছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি

'নবশক্তি' অফিসে চলে যান। ভূপেন, বারীন আর উপেন্দ্রের ওপর সম্পাদনার সমস্ত ভার পড়ে যায়। ছেঁড়া মাদুর আর ভাঙ্গা একটা বাক্স হ'ল আসবাব। হাতিয়ার হ'ল গোটা দু'তিন ভাঙ্গা ষ্টীল-পেন। টানা-হেঁচড়ার মধ্যে কাগজ বেরোয়, পুলিশ আনাগোনা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এর ভেতর অনলবর্ষী লেখা চলেছে। উত্তেজনা-বশে মাথামুণ্ড কি লেখা হ'ল বোঝবার সময় নেই, কিন্তু ছাপার অক্ষরে দেখা গেল: "যেন দেশের প্রাণপুরুষ ঐ দু'-তিনটি যুবকের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।"

বলা বাহুল্য, পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বেশ বোঝা গেল বারুদের গন্ধ বাঙ্গলার ছেলেদের নাকে খুব ভালই লাগছে। যত লোকে পড়ে, তাব একটা বড় অংশ যে এর মতবাদ সমর্থন করে, উদ্যোক্তারা সেটা বেশ অনুভব করতে লাগলেন। পাঠক জুটবে কিনা, সঙ্গতিরও অভাব, তাই পত্রিকা এক হাজারের মত প্রথমটা ছাপা হ'ল। কিন্তু অসম্ভব চাহিদা। "এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে একবৎসরে বিশ হাজারে ঠেকিল।" হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন "the crowds seeking to purchase it formed an obstruction on the street".

গভর্ণমেণ্ট নিজেকে বিব্রত মনে করলো। প্রতি সংখ্যার প্রবন্ধ অনুবাদ করে পাঠালে, ওপর-মহলে কর্তারা ইতিকর্তব্য স্থির করতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। তখন ঠিক হ'ল, প্রতি লেখা বিচার করে রাজদ্রোহের মামলায় জড়িয়ে নাস্তানাবুদ করা। ১৯০৭ জুন ২-রা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল "লাঠ্যৌষধি" ও "ভয় ভাঙ্গা"। সম্পাদকের নাম পত্রিকায় থাকতো না; পত্রিকা গোপনে ছাপা হ'ত—৭-নং শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে। গভর্ণমেণ্ট একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। মামলা ঠিক করে পুলিশ সম্পাদকের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। ৪১-নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনের অফিসে পুলিশ বেলা ৫-টায় উপস্থিত। সেদিন ১৯০৭ জুলাই ১-লা। ছোট-বড় সবাই সম্পাদক সাজতে চায়। অবধারিত জেল জেনেও "এ বলে আমি, ও বলে আমি-ই সম্পাদক"। পুলিশের মহা বিপদ। উপেন্দ্রনাথ বলেন—"শেষে ভূপেনই একটু মোটাসোটা ও তাহার মানানসই দাড়ি আছে বলিয়া তাহাকেই সম্পাদক স্থির করা হইল।" কালবিলম্ব না কবেই পুলিশ ভূপেনের নামে মামলা রুজু করে দিলে। ১৯০৭ জুলাই ৫-ই ভূপেন কোর্টে হাজির হলে, ৫০০০ টাকা জামিনে মুক্তি দেওয়া হ'ল।

পরের তারিখটা ১৯০৭ জুলাই ২২-এ। একটা কথা এখানে বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা শুনতে শুনতে প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছি, বা বিশ্বাস করতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে যে, ১৯২১ সালের আগে বিদেশী শক্তির সঙ্গে অসহযোগ, বিশেষতঃ আদালতে, করার কথাই ওঠেনি, বিদেশীর বিচারালয়কে উপেক্ষা

করা তো দূরের কথা। সেটা যে সত্য নয়, তা এই যুগান্তকারী 'যুগান্তর মামলা'য় প্রকাশ পায়।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—"আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক এবং মামলার বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধের জন্য আমি একাই দায়ী। আমার সরল বিশ্বাসে দেশের প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য বলে মনে করছি, তাহাই আমি পালন করছি। আমি আর দ্বিতীয় জবানবন্দি দেবো না এবং বিচারাধীন মামলায় আমি আর কোনও অংশ গ্রহণ করবো না।"

হাকিমসাহেব (জুলাই ২৪-এ) রায়ের মধ্যে বললেন—" 'ভয় ভাঙ্গা' প্রবন্ধের শুরুতেই ব্রিটিশ শাসনকে একটা অবাস্তব বড় প্রহসন এবং সামান্য ঠেলা দিলেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে বলে লেখা হয়েছে। দেশের লোকের বোকামির ওপর ইংরেজ সাম্রাজ্য টিকে আছে ; তার শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয় এবং তার পতনের জন্য মাত্র একটি ধাক্কার প্রয়োজন।

"পরেই 'লাঠ্যৌষধি' প্রবন্ধে লেখকের মনের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে পাঞ্জাবের ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যেই সেখানে জলের ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হ'ল, মাত্র কয়েক দিন বিফল আইনানুগ আন্দোলন চালাবার পর তারা মার আরম্ভ করে দিয়েছিল। লেখক বলেছেন, 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি', অর্থাৎ লগুড়-প্রয়োগে সরকারী লোকের মাথা গুঁড়ো হয়েছে, ঘর-বাড়ী জ্বলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, 'কাবুলি দাওয়াইয়ের' মত সদ্য ফলপ্রসূ হাতিয়ার আর নেই।"

'ভয় ভাঙ্গা' প্রবন্ধর কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে যখন এত রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতেছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় আমাদের মুক্তি অবধারিত। ইংরেজের বিপরীত বুদ্ধি, রাজভক্তদের উন্মত্ত প্রলাপ, অবিশ্বাসীর অর্থহীন পরিহাস হতাশার পরিবর্ত্তে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। যে সকল ঘটনা সাধারণের অন্তরে ভীতি বা নিরাশার উদ্রেক করে, কর্ম্মবীরের নিকট তাহাই আশা উদ্দীপনা বহন করিয়া আনে। আঁধারের শেষে আলোকের প্রকাশ। মৃত্যুর মধ্যেই অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত। আর্ত্তের ব্যাকুল ক্রন্দনের মধ্যে ভবিষ্যতের চিত্তাকর্ষক সঙ্গীতের সুর বর্ত্তমান। আজিকার ঝঞ্ঝা প্রচণ্ডতর হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করিবে আর তাহার অন্তর দিয়া চিরশান্তির পথ উন্মুক্ত হইবে।

"অবিনাশী তত্ত্বের সন্ধানীকে এই বিপদসঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেই হইবে। শেষ পরিণতির অভিযান এইখানে আরম্ভ। সমস্ত দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে, শিবা সারমেয় আনন্দে বিচরণ করিবে, নরকঙ্কাল, নরমুণ্ড মন্ত্র তন্ত্র

বিক্ষিপ্ত দেখা যাইবে। শ্যামল-আস্তরণ-আবৃত ভারতভূমি রুধিরধারায় প্লাবিত হইবে। রণচণ্ডীর তাণ্ডব নৃত্য প্রতি চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব রণন সৃষ্টি করিবে। যে অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় বিশ্বামিত্র চণ্ডালের কুটীরে প্রবেশ করিয়া কুক্কুরের মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বুভুক্ষা প্রতি নরনারীকে বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া তুলিবে; যখন ধন জন প্রাণের নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইবে, গো ব্রাহ্মণ আর অন্তঃপুরিকাদের সম্মান বিপন্ন হইবে, পাশবিক শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সভ্যতা করাল মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখন গোব্রাহ্মণহিতায় ভগবান অমিততেজে আবির্ভূত হইবেন। যতদিন না ধর্ম্মের অবক্ষয় এবং অধর্ম্মের বিস্তার পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হইতেছে ততদিন ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হইবেন না। যেহেতু আজ অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, অধর্ম্মাচরণের সূত্রপাত হইয়াছে—আমরা ভগবানের অনুকম্পা-লাভে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে মানুষ বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বনে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। ····· আমরা কেবল বলিতে পারি, 'মা ভৈঃ! হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার কর।'

> 'যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
> গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
> বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে,
> স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
> তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
> প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
> স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে
> যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।' "

(১৯০৭ জুন ২৩-এ)

সম্পাদকের একবছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত হ'ল। হাইকোর্ট আগষ্ট ৬-ই প্রেসকে মুক্তি দেয়। ভূপেন্দ্রনাথের জবানবন্দির ওপর ১৯০৭ জুলাই ২২-এ 'সন্ধ্যা' লিখলো "কেউটের ফোঁস"; তাতে সরকারকে সতর্ক করা হ'ল যে, এসকল মামলায় দেশে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। সাজা-শাস্তি দিয়ে আর জাতিকে দমন করা যাবে না। এইবার রাজশক্তি কেউটের ল্যাজে পা দিয়েছে, কিন্তু তার ছোবলের কথা স্মরণে রাখা উচিত। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বললে—"এ মামলায় আত্মিক বল পাশবিক বলকে অত্যন্ত হেয় করে দেখিয়েছে। মামলায় নিজ পক্ষ সমর্থন না করায় আসামী প্রমাণ করেছেন, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য কায়িক ক্লেশ অতি সহজে উপেক্ষা করা চলে।"

সম্পাদক বলে পরিচিত ছিলেন ভূপেন, আর ম্যানেজার ছিলেন অবিনাশচন্দ্র। সুতরাং তার পরের মামলায় অবিনাশকে জড়াবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে

হরিশ ঘোষকে মুদ্রাকর করা হয়। সমন বেরুলে হরিশ ফেরার হন। তখন মুদ্রাকর ও প্রকাশক হলেন বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। সেই সময় ৩০-এ জুলাই প্রকাশিত হ'ল "মিথ্যা ভয়", আগষ্ট ৫ ঃ "মিথ্যা পূজা", আর আগষ্ট ১২ ঃ "সিডিশন ও বিদেশী রাজা"। এই প্রবন্ধগুলির জন্য অবিনাশ ও বসন্তকে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ২-রা অবিনাশ মুক্তি পান আর বসন্তর দু'বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। 'সাধনা প্রেস' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ; হাইকোর্ট সে আদেশ রদ করে।

সরকারী রোষবহ্নি যত জ্বলে উঠেছে—'যুগান্তর' সকল উৎপীড়নের জন্য দেশকে তৈরী করে নিয়ে চলেছে। ১৯০৭ ডিসেম্বর ১৪-ই প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল "হিন্দুবীর্য্য পঞ্চনদে"। সঙ্গে সঙ্গে মামলা আরম্ভ হ'ল বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য্যের বিরুদ্ধে। মামলায় দাখিল হ'ল, পত্রিকার মনোভাব প্রমাণের জন্য, আগষ্ট ১৯-এ লেখা "ইংরাজের স্বরূপ", "বসন্তর সাজা", "আমাদের আশা"। ৩০-এ নভেম্বর ঃ "আত্মনির্ভরতা", "বিধির বিধান" (Divine Dispensation) ; আর ডিসেম্বর ৭-ই তারিখে ঃ "স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম"। এসবই আদালতে হাকিমের সামনে পেশ করে দেওয়া হ'ল। সুতরাং আসামীর মতিগতি যে রাজভক্তির অতিশয় প্রতিকূল সেটা প্রমাণিত হতে বিলম্ব হ'ল না। বৈকুণ্ঠ আচার্য্য মুদ্রাকর হবার জন্য আবেদন করেছিলেন ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ১৫-ই ; সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল অক্টোবর ৬-ই। ১৯০৮ জানুয়ারী ১৬-ই তাঁর আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল।

সাজা দিতেই হবে, সুতরাং 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না' বাক্যটি এখানে সপ্রমাণিত হ'ল। রায়ের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা (১৯০৮ জানুয়ারী ২১-এ) লিখলে—"এই অভিযোগ যে, আসামী রাজার শিখ সৈন্য ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু 'যুগান্তর' বাঙ্গলায় লেখা, আর শিখরা এক বর্ণও বাঙ্গলা পড়তে জানে না, সুতরাং এ অজুহাত একান্ত অবাস্তব। অবশ্য তার জন্য দণ্ডদান বন্ধ থাকতে পারে না।"

এর পরই ফণীন্দ্রনাথ মিত্রর পালা। তিনি ছিলেন বাঁকিপুরে 'মাদারল্যাণ্ড' (*Motherland*) পত্রিকার সম্পাদক। এসে জুটলেন যুগান্তরের আস্তানায়, একাধারে মুদ্রাকর ও প্রকাশক রূপে। কলিকাতায় ১৯০৮ এপ্রিল ১৭-ই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হ'ল। একগাদা ব্রিটিশ-বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে। ৭-ই মার্চ্চ ঃ "আমরা শান্তি চাই না", ৪-ঠা এপ্রিল ঃ "ইংরেজের যথেচ্ছাচার", ১৮-ই এপ্রিল ঃ "যুগান্তর-এর নমস্কার" (Salutation), ১১-ই এপ্রিল ঃ "বর্ত্তমান সমস্যা", "বিপ্লবের আবাহন" বা "এস বিপ্লব" (Welcome Unrest), "নূতন রীতি" (New Creed)। ফণীর নামে সমন জারি হ'ল ; আসামী গরহাজির। তখন অফিস হচ্ছে ৬৮-নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে। ২১-এ এপ্রিল আসামী আদালতে হাজির হলে, প্রত্যেকটি আড়াই

হাজার টাকার দু'টি জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। ২৬-এ মে রায় দিলেন হাকিম—২৩ মাসের কারাবাস। ৪-ঠা এপ্রিলের প্রবন্ধটি মামলার বিষয়ীভূত করা হয়। ১৯০৮ এপ্রিল ১৫-ই 'সন্ধ্যা' সংবাদ দিলে যে, পুলিশ 'যুগান্তর' প্রেসে পঞ্চমবারের হানা সমাপ্ত করলে।

১৯০৮ মে ৯-ই তারিখের প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মামলা রুজু হ'ল। ইতিমধ্যে ২-রা মে প্রবন্ধ বেরিয়েছে "কালের ভেরী", "যুগান্তর-এর প্রাণের কথা", "বলিই বা কি, লিখিই বা কি", "বর্ত্তমান সমস্যা"। এর প্রত্যেকটি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল গভর্ণমেণ্টের প্রতি লেখকের বিদ্বেষ প্রমাণ করবার জন্য। অপরাধের গুরুত্ব দেখে মামলা হাইকোর্ট সেসনে পাঠানো হ'ল জুন ২৩-এ। ২২-এ জুলাই রায়ে তাঁর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডর আদেশ হ'ল। তাতে বিশেষ করে বলা হ'ল, পূর্ব্বদণ্ড ভোগ করবার পর এই দণ্ড শুরু হবে। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ৫৯ মাস দণ্ড ভোগ করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যায়, 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকীয় লেখকগোষ্ঠী সদলবলে ধরা পড়েন (১৯০৮ মে ২-রা মাণিকতলা বাগানে)। সুতরাং পরের সপ্তাহে, ৯-ই মে একেবারে গায়ের সমস্ত জ্বালা মিটিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। তাতে ছিল—"উত্তিষ্ঠত !", "আমি এসেছি", "বিদ্রোহী কে", "পায়ে পিষে শত্রু হত্যা", আর ছিল নিম্নলিখিত কবিতাটি ঃ

"না হইতে মা গো বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচণ্ডি ! জাগো মা আমার,—
পূজিব তোমার চরণ তট।
অগুরু চন্দন ধূলায় ধূসর
ভূমিতে লুটায় চামর চাঁচর,
মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিভিয়া
হ'ল না বুঝি মা পূজন তোমার।
ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া,
জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া,
পূজার সময় যায় যে বহিয়া
জাগো মা আমার, সময় নিকট ॥
দৈত্য-তেজ নাহি করি পরাভব।
বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব ?
হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব
অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট।

এস রণচণ্ডি ! এস রণ সাজে,
এস মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে,
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার,
শিখাও জননি ! সমর উৎকট ।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে ;
সর্ব্বাঙ্গ তোমার সাজাব কঙ্কালে,
রক্তাম্বুধি আজ করিরা মন্থন,
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন ॥
জাগো রণচণ্ডি ! জাগো মা আমার
পূজিব তোমার চরণ তট ॥”

—ক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

এরপর ১৯০৮ মে ২৬-এ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশক রূপে পত্রিকার ভার নেন ।

ইতিমধ্যে পুলিশ সন্ধান পেয়েছিল ‘যুগান্তর’ ছাপা হচ্ছে নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের ‘সুমতি প্রেস’ থেকে । ফণীন্দ্রকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের মালপত্র গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । অবরুদ্ধ মাল উদ্ধার করবার জন্য (১৯০৮) জুন মাসে নিখিলেশ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন । বহুদিন বাদে যা ফেরত পেয়েছিলেন, তাতে ছাপার কাজ আর চলে না ; তখন প্রায় পুরাতন লোহার স্তূপে পরিণত হয়েছে । মামলাও চলছে, মাঝে মাঝে প্রেস আটক হচ্ছে । কাগজ আর নিয়মিত বেরোয় না । যদি কোনও ফাঁকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায় ।

হঠাৎ একটা সংখ্যা, ১৯০৮ মে ৩০-এ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হ’ল ঃ “শক্তি পূজা” (বাঙ্গালীর বোমা) । পাঠকের মধ্যে কাড়াকাড়ি যত, পুলিশের ততই তৎপরতা । ধরা পড়লেন বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মুদ্রাকর ও প্রকাশক । ৬-ই জুলাই মামলা আরম্ভ, আর ১৪-ই আগষ্ট রায় । তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়েছিল ।

‘যুগান্তর’ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক পুলিশের সন্দেহভাজন হয়েছে । এই-সূত্রে তারা মহেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল । তাঁর সখ হ’ল, পুলিশকে দিনকয়েক হয়রান করা ; বেশ গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, ধরা পড়ে গেলেন ১৯০৮ জুলাই ২৬-এ । এরকম আরও বহু জনের হয়েছে । দিনকতক টানাটানি করে ছেড়ে দিয়েছে ।

বীরেন্দ্রনাথের কারাগার থেকে মেয়াদ-শেষে মুক্তি পাবার পরও পুলিশের হাতে

তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁকে ১৯১০ অক্টোবর ৫-ই পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন আটক রেখে মুক্তি দেওয়া হয়।

'যুগান্তর মামলা'র প্রথম ফল, একদল যুবকের মন থেকে কারাবাসের ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে এ একটা প্রহসন মাত্র। অনেকে নাম লেখাতে চেয়েছেন, তার মধ্যে ছিলেন দুই আবাল্য সুহৃদ, আমাদের ভাগ্যক্রমে আজও জীবিত, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় আর শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন (আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী)। ১৯০৮ জানুয়ারী ১৮-ই অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করতে গেলেন। হাকিম অতুলের দরখাস্ত নাকচ করে দিলেন; তার বয়স কম।

১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ১৫-ই 'যুগান্তর' এক বিজ্ঞাপন মারফত দরখাস্ত আহ্বান করলেন। যথা,—

"কর্ম্মখালি! কর্ম্মখালি!!

বিশেষ সুসংবাদ

বয়স বিভ্রাট

'অক্সোনিয়ান' কায়দায় গোঁফদাড়ি কামানোটাই না কি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। তাহাতে বয়সের দোষ ধবে না। এখন দেখিতেছি সব উল্টো বুঝিলি রাম হইয়া গেল। বিলাতের কিংসফোর্ড সাহেব গোঁফশূন্য যুবককে নাবালক খাতায় রাখিয়া প্রিণ্টারের ডিক্লেরাসন দিতে চান না। কাজেই আমাদেরও বয়স বিভ্রাট ঘটিয়াছে। মুখুজ্যে মহাশয়ের গোঁফদাড়ি নাই কিন্তু বয়স ৪৫ হইলেও তিনি যুগান্তরের প্রকাশক হইতে পারিবেন না। অতএব যাহাদের গোঁফ আছে, দাড়ি আছে, তাঁহারা তাহার পরিমাণ ও নমুনা সহ সত্বর যুগান্তরের প্রিণ্টারের কাজের জন্য আবেদন করুন। কৃত্রিম গোঁফ হইলে চলিবে না। আমাদের মানস প্রিণ্টারেরা, যাঁহারা যুগান্তর অফিসে এ্যাপ্রেণ্টিস করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও গোঁফ দাড়ি নাই। প্রতি সপ্তাহেই এক একজন প্রিণ্টারের দরকার হইবে। সুতরাং বহু কর্ম্ম খালি আছে। সত্বর আবেদন করুন। apply to A. B. C. D.

C/o কর্ম্মকর্ত্তা, 'যুগান্তর',

৭৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।"

আলিপুর বোমার মামলায় 'যুগান্তর' নিয়ে জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট খুব আলোচনা করেন; হাইকোর্টেও সেই মত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছে। জজসাহেবের মতে, 'যুগান্তর'-এর প্রবন্ধগুলি ইংরেজ জাতের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করছে। তার প্রতি ছত্র বিপ্লব ঘোষণা করছে। 'কেমন করে বিপ্লব সংঘটিত হবে' তার পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিচ্ছে। সাধারণ দেশবাসী এবং সহজে উত্তেজিত যুব-মনকে

ইংরেজ-বিদ্বেষের ভাবধারায় উন্মত্ত করে তুলতে, পত্রিকার কাছে কোনও নিন্দা বা ছলনা পরিত্যাজ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। পত্রিকা যখন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করেছে, সেই-সময়কার প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে, সহস্র সহস্র পাঠকের মধ্যে বিপ্লবের চরম লক্ষ্য পবিস্ফুট করে তুলছে। ১৯০৭ আগষ্টের ১২-ই তারিখের প্রবন্ধের ("অস্ত্র শক্তি") ভূমিকায় কি-ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমা তৈরী হতে পারবে, কতটা গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে, সে-কথার উল্লেখ করে প্রবন্ধকার বলেছেন —"শস্ত্রশক্তি সংগ্রহের আবও একটি উপায় আছে। রুশ-বিদ্রোহে দেখা গেছে যে সৈন্যদের মধ্যে নানা দলের লোক আছে এবং বিপ্লব যখন রূপ গ্রহণ করে, তখন এদের মধ্যে অনেকেই নানাবকম অস্ত্র নিয়ে এসে বিপ্লবে যোগদান করে। ফরাসী-বিপ্লবে এই পন্থা খুব সুফল প্রসব করেছিল। শাসককুল বিদেশী হলে, এসব বিপ্লব-সংঘটনের সুযোগ আরও বেশী, কাবণ তখন শাসিতদের ভিতর থেকে সৈন্য নিযোগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এইসকল দেশীয় সৈন্যের মধ্যে সতর্কতার সহিত গোপনে বিদ্রোহ-সংক্রান্ত গুপ্ত আলোচনা চলতে পাবে। যখন শাসকদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তখন যে কেবল এইসকল সৈন্যদের সাহায্য পাওয়া যায় তা নয়, উপরন্তু তাদের প্রভু কর্ত্তৃক যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হযেছে, তারও সুযোগ পাওয়া যায়। বিশেষ করে এরকম ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর মনে দারুণ ত্রাস উৎপাদন করা সম্ভব হয়।"

ঐ মাসের ২৬-এ তারিখে "উন্মাদ যোগী"-স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে সরকারী ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং লেখক উহার মধ্যে গেরিলা-যুদ্ধের আভাস পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। মামলার রায়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং প্রত্যেকটিতে বিপ্লব-আয়োজন এবং জীবনদান ও গ্রহণেব নির্দ্দেশ সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত বলে জজসাহেবরা মন্তব্য করেন। বলা বাহুল্য, এসকল প্রবন্ধ বিপ্লবের দর্শন, বিজ্ঞান, প্রয়োগ এবং সর্ব্বোপরি যুবকদের আত্মনিবেদনে উদ্‌বুদ্ধ করেছে; লক্ষ্য এক—সূচনায় বলা হয়েছে "ভারতবাসীর নিরঙ্কুশ স্বরাজ চাই"।

'যুগান্তর'-বধ-যজ্ঞের যে নিদারুণ প্রচেষ্টা হয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে। ফলে, পত্রিকা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি। মাঝে মাঝে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আবার, অ-দিনে বেরিয়ে বাজার সরগরম করে তুলেছে। ৯-ই মে থেকে কয়েকদিন বন্ধ থাকবার পর হঠাৎ (১৯০৮) ৩০-এ এক সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। পুলিশ তো ছিলই; সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সংবাদপত্র ('ইংলিশম্যান'-প্রমুখ) এর চেহারা দেখলে আতঙ্কিত হয়ে উঠতো, গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করতো, পত্রিকার পরিচালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য। ১৯০৮ জুন ১-লা 'ইংলিশম্যান' লিখলো—

"On Saturday last (30. 5. 08) *Yugantar* reappeared after a lapse of several weeks. It was a half-page sheet priced two pice and from early morning to afternoon sold in the streets like hot cakes, every Bengali being seen with a copy, which he read with much gusto while passing along and on returning home handed to his wife and mother and thus helped in spreading revolutionary ideas in the *Zenana*."

অর্থাৎ—"মাত্র দু'পয়সায় আধপাতা কাগজ মে ৩০-এ বেরিয়েছে এবং অতি আগ্রহে লোক কিনছে। প্রতি বাঙ্গালীর হাতে একখানা দেখতে পাওয়া গেছে; তারা পথ চলতে-চলতেই উৎসাহভরে পড়ছে। বাড়ী গিযে মহিলাদের কাছে দিচ্ছে এবং এইভাবে অন্দরেও বিপ্লব-ভাবধারা ছড়িয়ে যাচ্ছে।"

বলা হয়েছে, নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হবার নানা বাধা উপস্থিত হয়েছিল। সে-কারণে জুনের (১৯০৮) প্রথম সপ্তাহে শনিবারের বদলে হঠাৎ শুক্রবারে 'যুগান্তর' আবির্ভূত হ'ল, আর পুলিশের টনক নড়ে উঠলো। এলাহাবাদের 'পাওনিয়ার' পত্রিকা (৮. ৬. ১৯০৮)-র মতে, পত্রিকা হাজারে হাজারে বিক্রী হয়েছে। দিনরাত্রি বিরাম নেই। লোকে দামের বিচার করছে না; প্রতি সংখ্যা এক টাকা বা তারও বেশী দিতে ক্রেতার অনিচ্ছা দেখা যায় না।

এ-সময় 'যুগান্তর'-এর পরিচালকরা বলেন—পত্রিকা জনসাধারণের সমর্থনে চলছে, এর অর্থ, লেখক, প্রেস কিছুই অভাব হবে না। কোনও ক্রেতা দামের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, তাঁর দেবার শক্তির ওপব সব নির্ভর করে।

১৯০৮ জুন ৮-ই সংবাদপত্র-দলনের নূতন আইন পাশ হয়েছিল মুখ্যতঃ 'যুগান্তর' বন্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং সে-চেষ্টা সফল হয়েছিল। 'যুগান্তর' পরের নভেম্বর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিরলভাবে মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। ১৯০৮ নভেম্বর ৫-ই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা লিখেছিল—"চন্দননগর থেকে 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয়েছে। এতে শত্রুর রক্তপানেচ্ছু বাঙ্গালীকে প্রতিহিংসা-গ্রহণে উৎসাহ—নির্ব্বিচারে শত্রুর প্রতি রিভলভার ব্যবহার করতে সাহস দেওয়া হয়েছে; রিভলভার অকৃতকার্য্য হলে, বোমা সে-অভাব দূর করবে।"

হঠাৎ ১৯১০ সালে জুলাই মাসে এক সংখ্যা 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশই 'যুগান্তর'-সম্পর্কিত সর্ব্বশেষ সংবাদ।

'বন্দে মাতরম্'

আগে 'সন্ধ্যা', পরে 'যুগান্তর' এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার আবির্ভাব। ইংরেজিতে প্রচারিত পত্রিকা, সুতরাং শুরুতেই এটি বাংলা পত্রিকাগুলির মত জনপ্রিয় হতে পারেনি। তখন ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম,

তার ওপর 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার ভাষা ও ভাব অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দ ও দীর্ঘ বাক্য যে অর্থ বহন করে চলেছে সেটা বুঝতে কোনও কোনও আগ্রহশীল শিক্ষিত পাঠককেও ক্লেশ পেতে হ'ত। যাঁরা পাঠ করে রস গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাঁরা পত্রিকা না পেলে অস্বস্তি বোধ করতেন। চিন্তাশীল পাঠকের কাছেও 'বন্দে মাতরম্' যে জাতীয়তার ভাব প্রচার করেছে, অনেক সময় সেটা বেশ নতুন বলে মনে হয়েছে।

'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' সাধারণ লোকের মনের অবসন্নতা দূর করে ইংরেজকে অতি সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়েছে। তারা যে কোনও-অংশেই বড় নয় এবং কেবল 'সাহেব' বলেই উচ্চস্তরের জীব নয়, সে কথা বাঙ্গালীর অন্তরে গেঁথে দিতে সমর্থ হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' হৃদয়ের ভাবাবেগকে উপেক্ষা করতে বলেনি। কিন্তু তার যুক্তি বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে স্থান গ্রহণের চেষ্টা করেছে। বিচারবুদ্ধি দিয়ে একবার গৃহীত হলে সে-আবেগ শীঘ্র মন থেকে দূর হবে না, কাজে প্রেরণা যোগাবে এবং নিজের চিন্তাধারায় অপরকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে। ইতিহাসের নজির দিয়ে অপর-পক্ষের যুক্তি দ্বিধাগ্রস্ত মনের ওপর যে প্রভাব সেটা দূর করতে 'বন্দে মাতরম্' অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। দৈহিক ও চারিত্রিক বল সঞ্চয় ও মানসিক বলে ইংরেজের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ ঘোষণা করে ('hands off') একদিনে তার শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার মনোভাব গড়ে তোলার মন্ত্র গ্রহণ করেছিল 'বন্দে মাতরম্'। এসকলের ওপরেও পত্রিকাটি জাতিকে শিখিয়েছিল 'স্বরাজ' অর্থে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'—এতে কোনও গোঁজামিল নেই। আর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লেখা চলেছিল এই ধারায়। এ অর্থ ধরে নিতে ভারতীয় নেতাদের বহু বৎসর কেটে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এসকল কাজে পত্রিকা আশাতীত সফলতা লাভ করেছিল, কারণ এর প্রারম্ভিক লেখকদের মধ্যে ছিলেন—অরবিন্দ স্বয়ং, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ। এঁদের অনুচরদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র দেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তখনকার উগ্রপন্থীদের নিজস্ব ভাব প্রকাশ ও মতবাদ প্রচারের জন্য একটি ইংরেজী পত্রিকার প্রয়োজন বোধ হয়। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' আর 'নবশক্তি' কতকাংশে বাঙ্গালীর মনে প্রবল ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করছিল, কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে তা পাঠ করা সম্ভব ছিল না। অরবিন্দ পত্রিকার উদ্ভব সম্বন্ধে বলেছেন—"বিপিন পাল সামান্য পুঁজি নিয়ে 'বন্দে মাতরম্' আরম্ভ করলেন এবং আমায় তার সঙ্গে যোগ দিতে ডাকলেন, আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম……বিপ্লবের জন্য যে প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন তার সুবিধা হ'ল।" (নীরদবরণ ঃ "স্বপ্ন" প্রবন্ধে)। কালীঘাটের হরিদাস হালদারের নিকট হতে সংগৃহীত পাঁচ শত টাকায় 'বন্দে মাতরম্'-এর যাত্রা শুরু হয়।

'বন্দে মাতরম্' দৈনিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হ'ল ১৯০৬ আগষ্ট ৬-ই,

অর্থাৎ 'যুগান্তর'-এর পাঁচ মাস পরে। অফিস—ক্রীক রো, ২।১-নং। পত্রিকার নিজ বিশেষত্ব প্রচার করতে বিশেষ সময় লাগেনি। বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি যে পত্রিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ নির্দেশ করেছেন, পাঠকের তার গূঢ় অর্থ বুঝে নিতে বেশী সময় লাগবার কথাও নয়।

'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় যে-সব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ অরবিন্দর লেখনীমুখে প্রকাশ-কালে (১৮৯৩-৯৪) মহামতি রাণাডের পরামর্শ-মতে মধ্যপথে বন্ধ হয়েছিল, আজ তারা বাধামুক্ত স্রোতের মত 'বন্দে মাতরম্'-এর পৃষ্ঠায় আবির্ভূত হ'ল। ইতিপূর্ব্বে নানা পত্রিকা ভিন্ন মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরম্' উষ্মা ও উত্তেজনাহীন ভাবে লিখেছিল (১৯০৬ আগষ্ট ১২-ই): "ভারতবর্ষ যদি কখনও স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে কংগ্রেসের চিরাচরিত পথ ছেড়ে নিজ উদ্যম প্রয়োগ করতে হবে।" নরমপন্থী মডারেটদের পথকে 'বন্দে মাতরম্' আখ্যা দিয়েছিল "The Pro-petition Plot" (১৯০৬ সেপ্টেম্বর ১১-ই) অর্থাৎ "আবেদনপক্ষীয় চক্রান্ত"। এক কথায় ঐ পদ্ধতিকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করা এবং উদ্যোক্তাদের ওপর একটা অনাস্থার ভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, যেমন "ফিরিঙ্গি" বলে বলে 'সন্ধ্যা' ইংরেজকে জনসমক্ষে হেয় করে তুলেছিল।

উগ্রপন্থী দল গড়ে উঠেছে, আর তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যাঁরা এতদিন কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন, তাঁরা রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনায় চিন্তিত হলেন এবং যাতে সংহতি রক্ষা হয়, তার জন্য পত্র-পত্রিকায় লেখা এবং আলাপ-আলোচনার সাহায্যে বিরোধের নিরসন হয় তার চেষ্টা করতে থাকেন। তখন 'বন্দে মাতরম্' তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে লিখলে (১৯০৬ সেপ্টেম্বর ১৫-ই)— "ইতিহাস এ-ভাবকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে এবং বহু ঘটনার উল্লেখে প্রমাণ করেছে যে ঐ বিরোধিতাই নূতন ইতিহাস সৃষ্টির কারণ।" আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ইটালীর বিপ্লব নজিরস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

পরেই বলেছে: "যখন নরমপন্থী নেতাদের নিকট যাচ্ঞাই একমাত্র মত ও পথ বলে গৃহীত ছিল তখন বাইরে ঐক্যের একটা খোলসের প্রয়োজন ছিল। ভিক্ষুক-গোষ্ঠীর পক্ষে বিরোধ প্রকাশ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কাঁদুনি-গাওয়া স্বার্থের হানিকর। কিন্তু আজ যখন জাতি স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সকল প্রশ্নে একতা-রক্ষা সম্ভব হতেই পারে না।"

'বন্দে মাতরম্'-এর ভাষায়:

"As long as mendicany was their (leaders') method and their ideal, it was necessary to preserve a show of unity, for it would not do for a 'family of beggars' to disagree and whine in different keys, but now that the nation is making for independence it is not possible to be united on every possible question."

ব্রিটিশ-বাঞ্জিত স্বাধীনতা দাবী করার জন্য ইংরেজ মালিকদের পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে জবরদস্ত শাসনের (সু)পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছে। তাই "The Sinful Desire" (পাপগ্রস্ত দুষ্ট-বাসনা) আখ্যায় 'বন্দে মাতরম্' (১৯০৬ সেপ্টেম্বর ১৮-ই) জানালে ঃ

"স্বাধীনতাই মানুষকে প্রকৃতির দান বা এটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা, সুতরাং সকল (বিদেশী) শাসন হতে মুক্তির বাসনা দস্তুরমত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। স্বেচ্ছাচারী চিরকাল এই স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা-স্পৃহা দলন করতে চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু ইতিহাস বারে বারে তার উচ্ছেদ বা পতনের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। এ শিক্ষা আবার উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের চক্ষু আছে, দেখি না,—কান আছে, শুনি না ; ফলস্বরূপ মানুষের এই ভ্রান্তি এবং বিপরীতবুদ্ধি চিরকাল প্রগতির পথকে রুধির-প্লাবনে ভাসিয়ে আসছে। আমরা যদিই বা দৈহিক শক্তির দ্বারা বিপক্ষকে প্রতিহত করতে চেষ্টা না-করি তথাপি আমরা মাত্র একদিন শাসনযন্ত্রের সহিত সহযোগিতা ছিন্ন করার শেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তাকে সম্পূর্ণ বানচাল করে দিতে পারি। যেদিন জনমানস অমলিন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠবে, সেদিন বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারী শাসকশক্তিকে তারা সদর্পে বলতে পারবে যে যতক্ষণ না আমাদের জন্মগত অধিকার অবাধ স্ফুরণের সুযোগ পাচ্ছি, দেবতার সন্তান ও স্বাধীন নাগরিকরূপে আমরা ঐ পীড়নযন্ত্র চালনা করতে আমাদের অসম্মতি জানাচ্ছি ঃ আর সেই দিনই আমাদের অসহযোগিতায় শাসনযন্ত্র ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।"

["..... Eyes have we but see not, ears have we but hear not, so the path of progress, owing to this human folly and perversity, is ever deluged with blood........ We, where true patriotism and love of freedom inspire the masses, some day present an ultimatum to the present despotism in the country that unless they make room for the play of our natural rights, as God's children and free citizens cry 'hands off' and bring it at once to an absolute deadlock."]

দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' মাস-সাতেক চলেছে, তখন একে স্থায়িত্ব দান করার কথা ওঠে, আর সেই সঙ্গে একটি সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ করার বিষয় আলোচিত হয়। (১৯০৬) অক্টোবর মাসে অরবিন্দর পরিচালনায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি যৌথ কোম্পানী সাহায্যে পত্রিকা-প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৬ অক্টোবর ১৩-ই 'বন্দে মাতরম্' যৌথ মূলধনের কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্ট্রি হয়েছিল। তখন শেয়ার বিক্রয়ের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, এবং সাপ্তাহিক সংস্করণে যা প্রচারিত হয়েছিল, তাই থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

"BANDE MATARAM
PRINTERS AND PUBLISHERS LTD.

A limited liability company with a capital of Rs. 50,000 divided into 5,000 shares of Rs. 10 each, has been registered .... (name ... which has taken over the daily journal BANDE MATARAM.

This journal was started as the exponent of a new political ideal and the mouthpiece of a growing school of thought. Established at first by individual and on a small scale it has already in its two months of existence made a great reputation and promise to be a power in the land. ...."

"নূতন রাজনৈতিক আদর্শ এবং নূতন ভাবধারার বাহক হিসাবে এই পত্রিকা (অর্থাৎ সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্') দু'মাস (মে মাস হতে) চলতেই খুব সুনাম অর্জ্জন করেছে এবং একটি প্রবল ভবিষ্যৎ শক্তির আভাস দিচ্ছে।"

"The very opposition it has received in many quarters shows that it is the representative of a force which has been waiting for a daily means of self-expression and once possessed of that necessary weapon can no longer be ignored."

অর্থাৎ, "নানা দিক থেকে পত্রিকা যে বাধা পাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায়, যে-শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য নিত্য চেষ্টা করছিল, এ পত্রিকা সেই ভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এ যদি একবার উপযুক্ত আয়ুধ সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তার শক্তিকে আর উপেক্ষা করা চলবে না।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, নূতন কোম্পানী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করছে।

প্রথমদিকে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদক আর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্' ১৯০৭ জুলাই ৭-ই সংখ্যায় কোদালিয়ার (২৪ পরগণা) এ. কে. বসু (অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ বসু) মুদ্রাকর ছিলেন। প্রবন্ধ-সম্ভারে পত্রিকা অননুকরণীয় ভাষায় আপনার আভিজাত্য প্রকাশ করতে লাগলো।

আইন-শৃঙ্খলার অতি চমৎকার অর্থ দিয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' (১৯০৭ জুন ৫-ই): ইংরেজের বাক্যই হ'ল আইন। ভারতে তার অস্তিত্ব ও অবস্থানই বহু দেশপ্রেমমূলক কার্য্যের অপপ্রয়োগ ও দমনের প্রতীক। বিদেশীর অত্যাচারকে মেনে নেওয়াই হ'ল শৃঙ্খলা-রক্ষা। যাচ্ঞা বা ন্যায্য দাবীর প্রার্থনা করা হ'ল চূড়ান্ত ধৃষ্টতা। আমলাতন্ত্রের কৃতকার্য্যের পরিবর্ত্তনের জন্য জিদ করা প্রচণ্ড অপরাধ। চিরকালের জন্য দাসত্বের বাসনা পোষণই দূরদর্শিতা ; আর সকল বিষয়ে নিজেকে

অনুপযুক্ত মনে করাই সুমতি ও মিতাচার; নিজেদের এক জাতি বলে মনে করা বাতুলতা। দেশকে ভালবাসা এক কুসংস্কার, তার মুক্তির প্রচেষ্টাই মহাদ্রোহ। এই-রকম কোনও চিন্তা অন্তরে পোষণ করা রাজদ্রোহ। অতএব নবপ্রবর্ত্তিত বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি আইন ও শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম ও সুনীতি, ন্যায় ও শুভপথ, বিনয় ও শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতার মূলোচ্ছেদকারী।

'বন্দে মাতরম্'-এর নিজস্ব ভাষায় দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না ঃ

"The Britishers' word is law, his very presence and existence in the land a signal for the suppression and suspension of many patriotic activities. Reconciliation with foreign despotism is perfect order. It is the height of impertinence to be begging and asking. It is criminal to insist on the undoing of bureaucratic actions. To wish for our eternal serfdom is prudence and peacefulness. To think ourselves irremediably unfit is wisdom and moderation. To imagine ourselves a nation is madness. To love our country is superstition. To work for its emancipation is treason. To harbour any such sentiment is sedition. Thus the new nationalism with its boycott and *Swadeshi*, national education and *Swaraj*, is subversive of law and order, religion and morality, justice and fairplay, obedience and discipline."

এই মনোভাব আর কয়েকমাস পরে 'বন্দে মাতরম্' (১৯০৭ জুন ৮-ই) আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে, তখন প্রবন্ধের শিরোনামা হ'ল—"চিন্তার শক্তি" ("The Strength of the Idea")। ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, সর্ব্বকালের স্বেচ্ছাচারীরা দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার সাহায্যে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এই আশ্বাস নিয়ে কাটিয়েছে এবং সেই পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তারপরে লিখছে—"জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-লাভের প্রবল স্পৃহার প্রারম্ভ অতি ক্ষীণ, আর পরিণতি অতি কঠোর। অপরপক্ষে স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচার রুদ্ররূপে প্রকাশ পায়, আর তার শেষ হয় বিপরীত ভাবে। ইতিহাসেরই সাক্ষ্য—যথেচ্ছাচারী শাসকের পরিণাম অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছে। এ শিক্ষা চিরকালই বিফল হয়েছে, প্রত্যেক যথেচ্ছাচারী অনুগামী মনে করেছে, কোনও দিন তার কোনও ক্ষতি হবে না। বৃটিশ রাজশক্তি বিশ্ব-শাসনের প্রতাপ এবং সীমাহীন সম্পদের অধিকারী হয়েও আজ সেই ঐতিহাসিক প্রগল্ভতার মাঝে ডুবেছে,—মিশর, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতে নব ভাব, নব শক্তির প্রবাহ ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে যে উঠছে, সেটা সে উপেক্ষা করে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। যতদিন না বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণতি ঘটছে, ভাগ্য

তাকে নিজ পথে ঠেলে নিয়ে যাবেই। আজ রুদ্ধনিঃশ্বাসে জগৎ লক্ষ্য করছে, ইংরেজ এইসকল ভাবকে দমনমূলক আইন বা খেয়ালপ্রসূত আজ্ঞা অথবা 'ম্যাক্সিম' ও অবরোধকারী কামান দিয়ে রুদ্ধ বা ধ্বংস করতে কি সক্ষম হবে ?"

("···· Nationalism, democracy, the aspiration towards liberty have feeble beginnings but a mighty end while with despotic repressions the beginnings are mighty and the end feeble. History shows that despotic rulers have always ended disastrously but inspite of that each succeeding despot deludes himself with the belief that he will never come to harm ...... Destiny will take its appointed course until the fated end, and it is left to be seen if England will crush these ideas with ukases and coercion laws, or kill them with maxim and seige guns.")

অপরের (বিশেষতঃ আমাদের শত্রু ইংরেজ) সাহায্যে বিপদ হতে যে উদ্ধার পাওয়া, সেটা যে-কোনও আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন জাতির নিকট মৃত্যুর নামান্তর। বলতে ইচ্ছা হবে—"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা" ; আমরা নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হব, সকল আপদ আমরা নিজ চেষ্টায় কাটিয়ে উঠবো। 'বন্দে মাতরম্' এই বাণী শোনালে, ১৯০৬ নভেম্বর ২০-এ—"The Guardianship of the British Bayonets" প্রবন্ধে। এসকল কঠিন সিদ্ধান্ত একটা জড়প্রায় জাতিকে গ্রহণ করতে হলে বারে বারে ঘা মেরে যেতে হবে, এ কথা 'বন্দে মাতরম্' ভালরকমেই জানতো। তাই ১৯০৭ মার্চ ১৮-ই লিখলো "British Protection or Self-protection" (ইংরেজ কর্ত্তৃক রক্ষা বা আত্মরক্ষা)। প্রবন্ধের মুখবন্ধেই বলা হ'ল যে, যে ইংরেজ আমাদের জন্মগত শত্রু, তার কাছে সাহায্য আশা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সেইহেতু শাসকদের নিকট দরবার না করে দৈহিক শক্তিচর্চ্চা ও মনে সাহস সঞ্চয় করতে হবে, যার সাহায্যে যে-কোনও অবস্থায়, এমন-কি চরম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে নিমেষমাত্রে সকল শক্তি দিয়ে বিপদ হতে উদ্ধার-লাভে সমর্থ হবে। এটা সম্ভব হলে ব্যক্তিগত অপমান-নির্য্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে ; প্রয়োজনবোধে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হবে। ··· বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করে প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয়ের মত দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

দেখা যাচ্ছে এসময় ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দে মাতরম্', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সমস্বরে এবং এক সুরে উৎসাহ দান করছে। ১৯০৭ জুলাই ৬-ই 'বন্দে মাতরম্' মন্তব্য করে যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের মূল শক্তির আধার হচ্ছে ছাত্রদল, সুতরাং ভীরুতার সংস্পর্শ থেকে তাদের রক্ষা করা বর্ত্তমানের প্রধান কাজ।

একই সংখ্যায় অন্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের ভারতের মালিক বলে মনে করে এবং ভারতের জনগণের মন সর্ব্বপ্রকারে দমন করে রাখতে চায়, তারাই দেশের মধ্যে বল-বিনিময় প্রবৃত্তি ও বিশৃঙ্খলা-মূলক সংগ্রামের মূল। যতদিন না জাতীয় সত্তা বা জাতি-প্রকৃতি আপন শক্তিতে অধিষ্ঠিত হচ্ছে এবং দেশীয় স্বার্থের ন্যায্য দাবী ও প্রাধান্য মেনে নিচ্ছে ততদিন সংঘর্ষ, অশান্তি, নির্য্যাতন, প্রতিহিংসাসম্ভূত বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। মূল ইংরেজী ঃ

"Those who consider themselves the lords of India and are bent upon stamping down the children of the soil, are the true promoters of violence and disorder. Strife, disturbance, repressive cruelty, retaliatory violence are inevitable until nature reasserts itself and restores to the indigenous interests their rights and just predominance."

তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহাবিষ্ট জাতিকে জাগাতে গেলে অতীব নিষ্ঠুর কশাঘাত প্রয়োজন। " 'নির্য্যাতন, আরও নির্য্যাতন'-এর (জুলাই ১৮-ই) যুগ এখন এসে দেশকে গ্রাস করেছে। এখন দেখতে হবে যাতে এটা সর্ব্বব্যাপী বিধিবদ্ধ ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। নির্য্যাতনের মধ্যে তার মুক্তি, অত্যাচারের পথে সে শক্তি সঞ্চয় করবে। আমলাতন্ত্রের এই রূপ সকলকে এক গোষ্ঠীতে পরিণত করবে, তখন আসবে ঐক্য ও দৃঢ়তা এবং সেই আত্মবোধ যার অভাবে দেশপ্রেমিকরা সাহস হারিয়ে বসে। নির্য্যাতন প্রতিনিয়ত বৃহৎ হতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হোক্ এবং ক্রমেই আকারে এবং প্রয়োগে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করুক। ধনী দরিদ্র, নারী শিশু নির্ব্বিশেষে সকলের ওপর সমানভাবে নেমে আসুক বিরামহীন অত্যাচার, আর তখনই ভারতের জাগরণ পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিহাস স্বাধীনতা-সংগ্রামের মাত্র একটি পথই নির্দ্দেশ করে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রের, বন্দুক-বারুদের সম্ভার অপেক্ষা জাতির মঙ্গলের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করা এবং মৃত্যুবরণ করবার জন্য মনকে গড়ে তোলার মূল্য অনেক বেশী। এই দৃঢ়চিত্ততা গড়ে তোলাই জাতীয় কল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ প্রত্যেক জাতীয় নেতার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

ইতিমধ্যে 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও সহস্র-মুদ্রা জরিমানার আদেশ হয়ে গেছে। 'বন্দে মাতরম্' (সাপ্তাহিক) ২৬-এ জুলাই এক প্রবন্ধে লিখলে—"ভূপেন্দ্র দত্ত মামলার অংশ গ্রহণ না করায় ইংরেজের আদালতের গৌরব ক্ষুণ্ণ ও তার বিভীষিকা দূর হয়ে গেল। দুইয়ের দ্বন্দ্বে ইংরেজ আজ হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। ইংরেজের কাছে নতি স্বীকার না করার এই মূক প্রতিবাদে স্বরাজ-সংগ্রামের মর্য্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ অন্ততঃ একজন লোক পাওয়া গেছে যিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে বলতে পেরেছেন যে তার সমস্ত জাঁকজমক, কামান-বন্দুক, আইন-কানুন, বিস্তীর্ণ রাজত্ব, বিজয়গর্ব্ব, অত্যাচার করার

শক্তি থাকা সত্ত্বেও অজেয়, অদম্য মনোবলের কাছে এ সবই তুচ্ছ। তুমি মরীচিকা-মাত্র ; অভ্রান্ত সত্য হ'ল আমার দেশমাতৃকা এবং আমার স্বাধীনতা।"

মূল ইংরেজী ঃ

"For the first time a man has been found who can say to the power of alien imperialism, 'With all thy pomp of empire and splendour and dominion, with all thy boast of invincibility and mastery irresistible, with all thy wealth of men and money and guns and cannon, with all thy strength of law and strength of the sword, with all thy power to confine, to torture or to slay the body, yet for me, for the spirit the real man in me thou art not. Thou art only a phase, a phantom, passing illusion and the only lasting realities are my Mother and my Freedom."

"সাজা-শাস্তির বিচারের মধ্যে না গিয়ে একটা প্রশ্ন জোর করে উঠছে—'আমরা (বর্তমানেই) স্বাধীন কি না ?' 'ভবিষ্যতে স্বাধীন হতে পাববো কি না ?'—সে প্রশ্নও উঠছে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হয়, আমরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলবার অধিকার রাখি, না,—অপরের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ? অপরের দাক্ষিণ্যে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হবে না, আমরা ক্রমশঃ আঁধারে পড়ে পথ হারিয়ে মরবো।"

দীর্ঘ প্রবন্ধে জাতীয়তার প্রায় সকল দাবী উত্থাপিত হয়েছে ; অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগে সে-দাবীকে শক্তিমান কবা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে—"জাতীয়তাবাদী আমরা মনে করি মানুষের জন্ম ও স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং আমরাও ব্যষ্টি ও সমগ্র জাতি হিসাবে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারও নির্দেশ মানতে আমরা বাধ্য নই, আমরা প্রাণ খুলে মনের কথা বলবো।"

মূল প্রবন্ধ ঃ

"We nationalists declare that man is for ever and inalienably free and that we too are both individually as Indian men and collectively as Indian nation for ever and inalienably free. As free men we will speak the thing that seems right to us without caring what others may do to our bodies to finish us as being free men. ....'

এই পর্য্যন্ত যখন চলেছে তখন 'বন্দে মাতরম্' সরকারী রোষ-বহ্নিতে পড়ে গেল। "যুগান্তর মামলা" ("The Yugantar Case") শিরোনামায় জুলাই ২৮-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সরকারী আপত্তি উঠলো। এর কিছু অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার আগের প্রবন্ধ, "ভারতীয়ের রাজনীতি" ("The Politics for

Indians") প্রকাশিত হয় ১৯০৭ জুন ২৭-এ। এই দুই প্রবন্ধকে মূল করে মামলা আরম্ভ হ'ল। প্রধান আসামী অরবিন্দকে আগষ্ট ১৬-ই ধবার সঙ্গে সঙ্গে জামিন দেওয়া হয়। ম্যানেজার হেমেন্দ্রনাথ বাগচিকে আগষ্ট ১৭-ই ও মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুকে ১৯০৭ আগষ্ট ২১-এ গ্রেপ্তার করা হয়। আগষ্ট ২৬-এ তিনজনই আদালতে হাজির হন।

বিপিনচন্দ্র এই সময় (সেপ্টেম্বর ১৭-ই) 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছিল ঃ

"All correspondence intended for the Editor should be addressed to the Editor, *Bande Mataram* and not to Babu Bepin Chandra Pal as his editorial connection with the paper has ceased."

সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় পত্রাদি তাঁর ব্যক্তিগত নামে পাঠাতে নিষেধ করা হচ্ছে।

সেপ্টেম্বর ২৩-এ অরবিন্দ ও হেমেন্দ্র মুক্তি পান, আর অপূর্ব্বর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁর হাইকোর্টে আপীল না-মঞ্জুর হয়েছিল ১৯০৭ অক্টোবর ৮-ই।

"বন্দে মাতরম্ মামলা"-য় আরও দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করা হলে, তিনি ১৯০৭ আগষ্ট ২৬-এ হাকিমের মুখের ওপব বলেন, তাঁব বিবেকগত আপত্তি থাকায় তিনি এ-মামলায় শপথ গ্রহণ করতে অক্ষম। সমাজেব শৃঙ্খলা ও মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মাবতারের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু বর্ত্তমান মামলায় কোনও অংশ গ্রহণ করবেন না। ভূপেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব পথ দেখিযে গেছেন, বিপিনচন্দ্র আদালতের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করে সেই মতকে শক্তিমান করলেন। বিচারালয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রকাশ! এ অসমসাহসিকতা ক্ষমার্হ নয়। ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ১৯-এ তাঁর ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

দ্বিতীয় ঘটনার জের বাঙ্গালার বৈপ্লবিক ইতিহাসে অনেক দূর গড়িয়েছিল; বর্ত্তমানে তার পূর্ণ বিবরণ অবান্তর বলে মনে হবে। সংক্ষেপে একাংশের উল্লেখ করা যাক্। বিপিনচন্দ্রর মামলা চলবার কালে বহু বাঙ্গালী যুবকের ভিড় হয়েছে লালবাজারের কাছারিগৃহে ও প্রাঙ্গণে। বড় হট্টগোল। হাকিম সব ছোকরাদের মেরে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। বেপরোয়া মেরে চলেছে ফিরিঙ্গি সার্জ্জেণ্টরা। সেইক্ষেত্রে 'সন্ধ্যা'-প্রচারিত "মারের বদলে মার" নীতির সাক্ষাৎ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়ে গেল। সার্জ্জেণ্টের নাকের ওপর ঘুষি লাগিয়ে দিলেন একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক, সুশীলচন্দ্র সেন। মারপিট দাঙ্গা খানিকটা চলবার পর আক্রোশে সার্জ্জেণ্ট-সাহেব আদালতে নালিশ

করলো। ১৯০৭ আগষ্ট ২৭-এ আসামী হুজুরকে বললেন ঃ 'সার্জ্জেণ্ট-সাহেব বেপরোয়া সবাইকে মারছে এবং তার মধ্যে আমাকেও, তাইতে আমি ঘুরিয়ে মেরেছি। যখন লড়াই বেশ জমে উঠেছে তখন আরও কয়েকটা পুলিশ এসে আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়।"

হাকিম রায় দেবার আগেই বলে ফেললেন—"আজকাল বাঙ্গালী ছোঁড়াগুলো মনে করে, ইচ্ছে করলেই তারা পুলিশ ঠ্যাঙাতে পারে।" রায়ে বালক সুশীলের প্রতি পনেরো-ঘা বেত্রাঘাতের আদেশ হ'ল। প্রেসিডেন্সী জেলে সুশীল এক-এক-ঘা করে বেত খেয়েছেন আর "বন্দে মাতরম্" বলে চেঁচিয়েছেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অমর গান বেঁধেছিলেন ঃ

"যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে—
'বন্দে মাতরম্' বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবি
আমরা কি মার সেই ছেলে?
হবে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?" ··· ইত্যাদি

আরও কয়েকটি বেত্রদণ্ডের কথা ভিন্ন পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

এই পুলিশকে প্রহারের ব্যাপারে আরও তিনটি যুবক গণ্ডগোলে পড়ে। সেপ্টেম্বর ১৬-ই তারিখের ঘটনা। আসব—পুলিশ কোর্ট; বাদী ও সাক্ষী—পুলিশ সার্জ্জেণ্টরা এবং হাকিম ডি. এইচ. কিংস্‌ফোর্ড,—ঠিক যেন সুশীল সেনের মামলা, ছোকরারা পুলিশকে মেরেছে। ১৭-ই তারিখে বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হ'ল। হাইকোর্টের দুই ব্যারিষ্টারের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করে রায় বেরুলো—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাণিকলাল দে এবং প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ দিন সশ্রম কারাবাস।

মুদ্রাকর অপূর্ব্বর কারাবাস ঘটলেও গভর্ণমেণ্ট 'বন্দে মাতরম্'-এর সুর নরম করতে পারেনি। সেই তেজস্বী অনবদ্য ভাষায় যুক্তিজাল বিস্তার করে লেখা সমানে চলেছিল। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। "দুর্ব্বলতার মধ্যে শক্তি বা দুর্ব্বলের ক্ষমতা" ("Strength out of Weakness") প্রবন্ধ ১৯০৭ আগষ্ট ১-লা লেখা ঃ "চিরকালই সবলের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে না। যথেচ্ছাচারীর ভ্রূকুটি কোনও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেনি। অষ্ট্রিয়ানদের আস্ফালন সত্ত্বেও ইটালীয়রা স্বাধীন হয়েছিল; ইংরেজের দম্ভোক্তি সত্ত্বেও, আমেরিকা এবং স্পেনীয়দের তর্জ্জন-গর্জ্জন সত্ত্বেও কিউবা স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-স্পৃহার উন্মাদনায় চির-দুর্ব্বল জাতির মনে অদম্য শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রবল নির্য্যাতন যদিও সাময়িক দুর্ব্বলতা (মানসিক অবসাদ)

সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তথাপি হৃদয়দৌর্ব্বল্য আমাদের আচ্ছন্ন করতে দেব না। জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হ'ব।"

নানারকম নিগ্রহ আরম্ভ হযে গিয়েছে; দেশের লোকও যে অকুণ্ঠ সমর্থন করছে তা নয়, তবে ক্রমেই সমমতাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এরকম সময় কর্ম্মীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাঁদের তো সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, আপনার নেশায় আপনি মেতে তাঁরা চলেছেন। তাঁদেব কেবল বলা যায় (১৯০৮ জানুযারী ১৪-ই): "অগ্নিপবীক্ষাই সুবর্ণ-সুযোগ আব দুঃখই তাঁদের কপালের লিখন—যাঁরা মৃত্যুকালে দেখে যেতে চান যে, জন্মকালে যেমন দেখেছিলেন, তাব চেয়ে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হযেছে। দুর্দ্দশা থেকে আনন্দে, অন্ধকাব থেকে আলোকে, দুর্ব্বলতা হতে শক্তিতে এবং লজ্জা থেকে সম্মানে অধিষ্ঠিত হবার অন্য পথ নাই। আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি, তা ছাড়া বিচার ও ধীঃ, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা, অন্য পথের সন্ধান দেয় না। যা আমাদের শ্রেযঃ, পেতে হলে তার উপযুক্ত মূল্য দিতেই হবে।"

"Bengal on Trial" শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধঃ "We feel no doubt very strongly for those who are bearing the brunt in the struggle. But we have no other consolation to offer to them than that sorrow is at once the lot, the trial and privilege for those who work for leaving the country better than they found it. There is no royal road, no safe path from misery to happiness, from darkness to light, from weakness to strength, from shame to glory. Reason and intellect, wisdom and experience cannot suggest any other course than what we have adopted. We must pay for things worth having."

"মায়ের সম্মান রক্ষা করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ বা ট্রান্সভাল যেখানেই সন্তানরা নিগ্রহ ও অপমান সহ্য করছে, প্রত্যেকে পরস্পরেব প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারলে একত্ববোধ জন্মাবে" (১৯০৮ জানুযারী ১৮-ই)।

"ময়মনসিংহে অস্ত্রধারী পুলিশের অত্যাচারের দাপটেও ক্লৈব্য আর অসহায় ভাব আমাদের অভিভূত করতে দেওয়া হবে না, প্রতিবিধানের জন্য অবশ্যই আমাদের একটা পথ আবিষ্কার করতেই হবে" (১৯০৮ জানুয়ারী ২৪-এ)। "প্রতিরক্ষা-প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে কালবিলম্ব না করে" (১৯০৮ জানুয়ারী ২৫-এ)।

" 'নিজেদের মহত্ত্ব, অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করা আমাদের পক্ষে না-কি প্রগল্‌ভতা বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ অপরাধ। উচ্চ আদর্শ পোষণ করা আমাদের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে অবান্তর'—এই বাণী শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু একটা মৃতপ্রায় জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে হলে, উচ্চ আদর্শ ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না" (১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ২৮-এ)।

"যতই নির্য্যাতন চলুক, ভারতবাসীকে সর্ব্বরকম বড় কাজ হতে নিবৃত্ত করার যত চেষ্টা হোক্, আমাদের দাবী এবং তা পূরণের জন্য যে প্রবল আলোড়নের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তা'তে মনে হয়, ভারতবর্ষকে বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার কবল হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। শান্তিপ্রিয় জড় জাতি আজ মৃত্যুকল্প নিষ্ক্রিয়তা থেকে জেগে উঠেছে এবং বিশ্বব্যাপী ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে সে নবকলেবরে শক্তিমান ও পূত হয়ে বেরিয়ে আসবে। দেশেব যুবসম্প্রদায় কি-ভাবে নিজেদের গড়ে তুলে, কোন্ বিশেষ গুণে তারা বিভূষিত হবে, সে নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়েছিল ১৯০৮ মার্চ ২৮-এ। বর্ত্তমানে মনে হচ্ছে, আমাদেব সে উপদেশ পালন করা হয়নি, তাই এই লালসার দ্বন্দ্ব। দেশের কাজ যাঁরা করতে চান তাঁরা হবেন সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য, নেতৃত্ব বা নাম বাজাবার লোভহীন, দেশের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ, আজ্ঞাপালনে তৎপর ও কর্ম্মানুরক্তিতে ভবপূব। স্বার্থশূন্য আত্মবিশ্বাসসঞ্জাত আত্মিক শক্তি এবং প্রতিষ্ঠান-সম্ভূত জ্ঞান-সমৃদ্ধ নির্দ্দেশনিয়ন্ত্রিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনের সম্বল হবে।"

সাধারণেব বোধগম্য অনুবাদ আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি, সুতরাং মূল ইংবেজী উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম ঃ

"These workers must be selfless, free from the desire to lead or shine, devoted to the work of country's sake, absolutely obedient and full of energy. They must breathe the spirit of the selfless faith and aspiration derived from the spiritual guidance of the institution."

দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদান করতে হবে। স্বাধীনতা-সৌধ-গঠনের প্রতি প্রস্তরখানি সন্নিবেশের জন্য একটি করে জীবন বলি দিতে হবে। কেবল বাগাড়ম্বরে স্ববাজ আসবে না। প্রতি লোকটি যখন অন্তরেব গভীরে বাস করবে, তখন স্বরাজকে বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিতেই হবে।...... দেশমাতৃকা আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন চাইছেন, এর কিছু কম, কিছু বেশী হলে চলবে না। স্বরাজ্য লাভের জন্য স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, শিল্প সম্পর্কে যাহাই কিছু করা যাক্, সে কেবল সাধনার পথ।...... পরিবর্ত্তে মা দেখতে চাইবেন, আমরা নিজেদের কতটা উৎসর্গ করেছি। আমাদের প্রিয় সম্পদ ও আমাদের কায়িক শ্রম, কতটা আরাম, কতটা নিরাপত্তা, জীবনের কতখানি দান করেছি। পুনর্গঠন আর পুনর্জন্ম সমার্থক। আর, মানুষের পুনর্জন্ম বিচার দিয়ে নয়, অর্থের প্রাচুর্য্যে নয়, পরিকল্পনায় নয়, শাসন-সংস্কারে নয় ; পরিবর্ত্তে চাই নতুন হৃদয় আর তাকে উদ্ধার করতে হলে আমরা যা ছিলাম তার সবটাই ত্যাগের আগুনে উৎসর্গ করে মাতৃক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাঁর প্রশ্ন,—'আমার জন্যে তোরা ক'জন বাঁচবি ? ক'জন মরবি ?' তার উত্তরের অপেক্ষায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন" (১৯০৮ এপ্রিল ১১-ই)।

কয়েকটি অংশের মূল ইংরেজী দেওয়া গেল ঃ

"For every stone that is added to the national edifice a life must be given ...... She asks for our hearts, our lives nothing less nothing more ...... She will look to see how much of ourselves we have given, how much of our substance, how much of our labour, how much of our ease, how much of our safety, how much of our lives. Regeneration is literally rebirth—rebirth comes not by the intellect, not by the fulness of the purse, not by policy, not by change of machinery but by getting of a new heart, by throwing away all that we were into the fire of sacrifice and being reborn in the mother ..."

"দৈহিক ও অস্ত্র শক্তি না হলে, যত কূটবুদ্ধিই থাকুক, তাকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। সাধারণতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারীর রাজ্যে জনমত বিফল, যদি বিপক্ষকে প্রত্যাঘাত করবার শক্তি না থাকে। যদি ক্ষতি করবার শক্তি থাকে তবে সে-মতের কিছু মূল্য আছে। বিপক্ষের অন্তরে যদি ভয় সৃষ্টি করা না যায়, তার যথেচ্ছাচারিতা বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই" (১৯০৮ এপ্রিল ২৪-এ)।

রোগের সংক্রামতা আছে, স্পর্শদোষ আছে, সে কথা অসত্য নয়; কিন্তু মহত্ত্বেরও সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাইতে 'বন্দে মাতরম্' লিখলে (১৯০৮ জুলাই ১৭-ই)—"Create an epidemic of nobleness". "ক্ষুদিরাম প্রভৃতি দেশপ্রেমিক যা করছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাঁদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা যাচ্ছে না, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সব মহৎ কাজ, ছোট অথবা বড়, লক্ষ্য করে থাকেন; সেখানে ভুলভ্রান্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। মহান্ ত্যাগের আদর্শ জাতির জীবনে নূতন উন্মাদনা আনবে, প্রেরণা যোগাবে, মহতের উদাহরণ যথাকালে ব্যাপক মহত্ত্ব সৃষ্টি করবে।"

"ভারতের আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য বড়ই সাধু, তারা আমাদের মঙ্গলের জন্য সব কাজই করে থাকেন। আমাদের লেখকরা তাঁদের স্বাধীনতাকে অপশক্তিতে পরিণত করেছে, বক্তারা লোক ক্ষেপিয়ে ঝামেলা করে আর যুবকরা রাজনীতিতে প্রবেশ করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে; সুতরাং এসকল দেশের অহিতকর কাজের জন্যই ব্যাপক সাজা-শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে" (আগষ্ট ১২-ই)।

"কোনও পদানত জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান কালের প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হলে বাধাবন্ধহীন পথে সম্মুখে ঠেলে নিয়ে যায়। তখন সে আর কোনও বিরূপতা, বিপক্ষতা মানতে চায় না। ন্যায্য দাবী আদায় করতে মরিয়া হয়ে ওঠে, যথানির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান মিলায়, আমাদের কাছে শাশ্বত সত্য প্রেরণার উৎসের সন্ধান নিয়ে আসে। তখন আমাদের মধ্যে জাতীয় সত্তা বা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে এবং আমাদের

স্বপরিপূর্ণতা ঘটাতে সক্ষম হয়। মনের অন্তস্থলে যে উন্মাদনা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে এবং তার বহিঃপ্রকাশের কোনও লক্ষণের অসদ্ভাব নেই, প্রেরণা আমাদের যোগ্য পথে ঠেলে নিয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবে না" (১৯০৮ আগষ্ট ১৫-ই)।

মুক্তির সঙ্গীত গেয়েছে 'বন্দে মাতরম্' (অক্টোবর ২৭-এ) আর সরকারের বিষনজরে পড়েছে।······ পত্রিকার দৃঢ় বিশ্বাস জগতের ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে নতুন মানুষ, কালের আবর্ত্তে উত্থিত মানুষ, নির্দ্দিষ্ট কাজের যোগ্য মানুষ, ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের মহামানব ছিটকে বেরিয়ে আসে। এঁদের আত্মিক-শক্তি অপর মানুষকে চুম্বকের মত টানে, বিচ্ছিন্নকে যুক্ত করে, তাঁদের প্রেরণা যোগায়, সমস্যা-সমাধানের উপযোগী শক্তি ধারণ করে এবং বিস্ফোরণের সম্মুখীন হবার উপযোগী শক্তি সঞ্চার করে। প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে, সমুদ্রমন্থনে অমৃতের মত এঁরা উদ্ভূত হন। একেই অরবিন্দর সহকর্মী, আমার চিরনমস্য শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বলেছেন "যুগধর্ম্ম"।

'বন্দে মাতরম্'-এর নিজস্ব ভাষায়ঃ "There are junctures in the affairs of the world, when new men are produced—the men of the moment, the men of the occasion, the men of destiny whose spirit attracts, unites and inspires, whose capacity is congenial to the crisis, whose power is equal to the convulsion—who are the out-come of storm."

দেশে দেশে স্বাধীনতা-লাভের আরাব উঠেছে, কিন্তু আমাদের দেশে "স্বাধীনতা" সামান্য ভিন্নার্থে আমরা ব্যবহার করেছি। যে স্বাধীনতায় দেশ আত্মহত্যা করে, ভারত সে-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না (১৯০৮ অক্টোবর ২৭-এ)। ভারতের মথিত আত্মা যে স্বাধীনতা চায় সেটা কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা নয়, যদিও এগুলি অত্যাবশ্যকীয় আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার ওপর ভারত যা চায়ঃ

"This freedom is essentially a spiritual fact. It is not politics. It is not democracy as democracy is understood up till now in Europe. It is a religion,—this noble freedom that we desire to possess."

এর অনুবাদ-চেষ্টা আমার পক্ষে বাতুলতা। মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে যে, ভারতের স্বাধীনতা তত জাগতিক নয়, যতটা আধ্যাত্মিক। ইউরোপের গণতন্ত্র আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নয়; তাদের সেটা রাজনীতি, আমাদের কাছে এটা ধর্ম্ম,—পারমার্থিক বিষয়।

পত্রিকা চলছে কোনও রকমে, কিন্তু ক্রমে আর্থিক কষ্ট বেড়ে উঠলো। কর্ম্মকর্ত্তারা মনে করলেন, অর্থাভাবে কাগজ বন্ধ হচ্ছে, এ কথা প্রকাশ পেলে,

গভর্ণমেণ্টের কাছে নিজেদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়বে, আর জাতীয়তাবাদে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। সে-কারণে তাঁরা পরামর্শ করে এক অতি রুক্ষ প্রবন্ধ ছাপিয়ে দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে আশানুরূপ ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করে কোনও রকমে মান রক্ষা করে দেয়। "I was told that Shyam Sundar and Hemendra Prasad had carried on somehow with the paper, but the finances became impossible, so he (Bejoy Chatterjee) deliberately wrote an article which made the Government come down on the paper and stop its publication, so that the *Bande Mataram* might end with some *eclat* and in all honour." (*Sri Aurobindo on Himself*, p. 99)

অক্টোবর ২৮-এ 'বন্দে মাতরম্' সগর্ব্বে প্রকাশ করেছে ঃ পত্রিকা যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করে গেছে, সে কখনও বিলীন হবে না।

ক্রমে দেখা গেল পুলিশ তার জাল গুটিয়ে আনছে ; কোন্ দিন কি হয়। অক্টোবর শেষ (২৯-এ) নাগাদ দেখা গেল সাধারণ-নাগরিক-পোশাকে পুলিশ 'বন্দে মাতরম্' অফিসের আশেপাশে দিবারাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোঝা গেল 'বন্দে মাতরম্'-এর লোপ সন্নিকট।

বেশী সময় লাগলো না। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৯০৮ অক্টোবর ২৩-এ 'বন্দে মাতরম্'-এর ম্যানেজার গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তীর ওপর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল—"কেন প্রেস বাজেয়াপ্ত হবে না, তার কারণ দর্শাও"। এক প্রবন্ধ "ঘরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বা ঘরের শত্রু বিভীষণ"—"Traitor in the Camp" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮ সেপ্টেম্বর ১২-ই ; শুনানী হ'ল নভেম্বর ৪-ঠা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেস বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি হ'ল। আলোচ্য প্রবন্ধ চারটি প্যারাগ্রাফে বিভক্ত ছিল। প্রথমদিকে বিশ্বাসঘাতক সম্বন্ধে মন্তব্য, পরে উমিচাঁদ-কাহিনী, তৃতীয় অংশে আত্মত্যাগীদের কথা এবং বলা হ'ল কানাইলাল দত্ত তার মধ্যমণি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কানাইয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে এবং বিশ্বাসঘাতকদের মুষল হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। পরিশেষে বলা হচ্ছে যে, এই শিক্ষা থেকে ভবিষ্যতে দেশের শত্রুরা সাবধান হবে—জাগ্রত দেশ এ-উদাহরণ স্মরণে রাখবে।

কিংস্‌ফোর্ড-এর মন্তব্য ঃ "In my opinion the article is an encouragement to others to follow the example of Kanai and hence is an incitement to murder or acts of violence. Kanai is to be written of in history ; he is to be written of as the first of the avengers. .... Kanai's life is a splendid one .... no longer shall the betrayer be safe from avenger's hand. Gossain is a hated monster. His death was needed."

প্রেস বাজেয়াপ্তর আদেশ হ'ল ১৯০৮ নভেম্বর ৪-ঠা। হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়েছিল। ডিসেম্বর ১৪-ই হাইকোর্ট সেটা নাকচ করে।

'বর্ম্মে-বর্ম্মে'

পত্রিকা-দলন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পুরাতন কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকার প্রবন্ধ নিয়ে ইংরেজ চিরকালই সজাগ দৃষ্টি রেখে এসেছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া যায়, প্রথম দফায় রাজ-রোষে তিনখানি পত্রিকা হয়তো ভস্মীভূতও হয়েছিল; সঠিক কিছু বলা যায় না। মনে হয়, সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যাপার নিয়ে কিছু লেখা হয়ে থাকবে। নামগুলি ঃ (১) দূরবীণ, (২) সুলতান-উল্-আখ্বার ও (৩) সমাচার সুধাবর্ষণ। হোম (স্বরাষ্ট্র) ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৭ জুন ১২-ই তারিখের আদেশে এইসকল পত্রিকাব বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ জারি হয। আইনের দোহাই পাড়া—ইংরেজের একটা খোলস ছিল। তাই জুন ১৩-ই তাবিখে বড়লাটের আইন-সভায় সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন একদিনেই পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। লাট ক্যানিং (Lord Canning) আইনটি গ্রহণ করবার অনুরোধ (আদেশ) জানিযে, কারণস্বরূপ বলেন যে, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশীয় সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের নামে বে-পরোয়াভাবে কি পরিমাণ রাজদ্রোহ প্রচার চলেছে, সে বিষয়টি অনেকের জানা নেই। অতি চতুরতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তারা দিনের পর দিন এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং জনসাধারণের মন বিষিয়ে তুলছে। ঘটনা বিকৃত করে বলা ছাড়া, গভর্ণমেণ্টের কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে; তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিথ্যা দোষারোপ এবং অবিরামভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা চলেছে।

ইংরেজী এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ (Proceedings of the Legislative Council of India, June 13, 1857) : "I doubt whether it is fully undertsood or known to what an audacious extent sedition is poured into the hearts of the native population of India within the last few weeks under the guise of intelligence supplied to them by the native newspapers. It has been done sedulously, cleverly and artfully. In addition to perversion of facts there are constant villifications of the Government, false assertions of its purposes, and unceasing attempts to sow discontent and hatred between it and its subjects."

[শতবৎসরাধিক কাল পরেও একবার স্মরণ করা যাক্, 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এর প্রচার আরম্ভ হয় ১৮৫৪ সালে, একখানি বাঙ্গলা-হিন্দী পত্রিকা রূপে এবং সম্পাদক বলে পরিচিত ছিলেন শ্যামসুন্দর সেন। এই সালেই আর একটি পত্রিকা ১৮৫৪ আগষ্ট

১৬-ই বেরিয়েছিল—নাম 'মাসিক পত্রিকা', এবং সম্পাদনার ভার নেন তাৎকালিক প্রসিদ্ধ দুই ব্যক্তি—পিয়ারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার। দেশাত্মবোধ-ভাব-প্রচারে এদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়।]

প্রকৃত রাজদ্রোহের মামলা দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-এ ধারা অনুসারে দায়ের হয় ১৮৯১ সালে—'বঙ্গবাসী'র মালিক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ম্মাধ্যক্ষ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণোদয় রায়ের বিপক্ষে। ১৮৯১ সালের ২১-এ মার্চ, ১৬-ই মে, ১৬-ই জুন তারিখের প্রবন্ধে আপত্তি ওঠে। সহবাস-সম্মতি-দান-এর বয়স নিযে যে আইন প্রবর্ত্তিত হতে চলেছিল, তার বিপক্ষে যুক্তির অবতারণাকালে রাজদ্রোহের অপরাধ ঘটে। জুরির বিচার চলেছে হাইকোর্টে—সাতজন ইংরেজ, একজন বাঙ্গালী আর একজন আর্ম্মেনিয়ান নিয়ে। জজ-সাহেব জুরির সঙ্গে একমত না হওয়ায় মামলা শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়।

মামলায় যে-সকল নাম-করা কাগজ—'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দে মাতরম্' নানা-রকম সাজা-শাস্তি পেয়েছিল, জেল জরিমানা ও মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করার ফলে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল, তার কথা কিছুটা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ছোটখাটো পত্রিকা, পুস্তিকা উগ্রজাতীয়তার বাণী বহন করে চলেছে এবং যখনই ইংরেজের খেয়াল হয়েছে, তখন বকের অনুকরণে ছোট্ট মাছ মুখবিবরে ফেলে হজম করে নিয়েছে। তাদের কথা একটু মনে রাখা ভাল। বাঙ্গলার বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস যদি কোনও দিন সত্যিই লেখা হয়, এইসকল লেখক, সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশকদের নাম পুস্তকের পৃষ্ঠার কোণে স্থান পেলেও পেতে পারে।

এদের মধ্যে গোড়াতেই 'নবশক্তি'র কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯০৬ মে ২০-এ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সম্পাদনায় 'নবশক্তি' প্রকাশলাভ করে। তখন দেবব্রত বসু 'যুগান্তর' থেকে এখানে এসে যোগ দেন। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' তখন বাজার গরম করে রেখেছে, তাই 'নবশক্তি'র প্রবন্ধ বেশ বাছাই লোক ছাড়া সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি থেকে তার রক্ষা ছিল না। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯০৭-এর শেষদিকে এবং ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িয়ে পড়ার আগে পর্য্যন্ত তিনি অনেকটা সময় 'নবশক্তি'র পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন।

লেখা বেশ গরম, সুতরাং সরকারী নেকনজর পড়লো ১৯০৭ জুন ১৪-ই তারিখের লেখার উপর। সম্পাদক ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে মামলা, এবং তার নিষ্পত্তি হ'ল ১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ১০-ই, মনোমোহনের চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশে। হাইকোর্টে আপীল হয়েছিল; বলা বাহুল্য, সে মামলা ৪-ঠা আগষ্ট ডিস্‌মিস্ হয়ে যায়।

এলো 'সোনার বাংলা'। লেখার বিশেষ দোষ ধরতে না পেরে, খুঁত বেরুলো—মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ছাপা নেই। গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ দেখাল যে, ১৮৬৭ সালের ২৫-সংখ্যক আইনের (Act XXV) ১৫ ধারা মতে এটা অবশ্য প্রকাশিতব্য। ১৯০৭ জুন ২৫-এ বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের দুইশত টাকা অর্থদণ্ড হয় (সম্ভবতঃ এই নাম সম্পাদক হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকবে)।

এইসঙ্গে লক্ষ্য করা গেল—কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং সেটা 'কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস' থেকে ছাপা হয়েছে। পুলিশ প্রমাণ করে, ছাপাখানাটার গুপ্ত মুদ্রণের দোষ আছে। কারণ, 'যুগান্তর'-এর কয়েক সংখ্যা সেখানে ছাপা হয়েছে। সুতরাং ১৯০৭ জুলাই ৩-রা ছাপাখানার মালিক বলে কেশবের ৪৫০ টাকা ও শ্রীমন্তর ১৫ টাকা জরিমানা হয়।

রাজধানী থেকে দূরে বলে মফঃস্বলের পত্রিকা অব্যাহতি পায়নি। বরিশালের কাগজ: 'বরিশাল হিতৈষী'। মালিক শ্রীদুর্গামোহন সেন এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক আশুতোষ বাগচি। মামলা বাখরগঞ্জ দায়রা-জজের এজলাসে হ'ল। সাজা হয় ১৯০৭ ডিসেম্বর ১২-ই; দুর্গামোহনের এক বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং ১০০০ টাকা জরিমানা, আর আশুতোষের চার মাস সশ্রম কারাবাস আর ২০০ টাকা জরিমানা।

উত্তরবঙ্গে রাজদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের মামলা। পত্রিকা—'রংপুর বার্ত্তাবহ'; সম্পাদক, মালিক ও প্রকাশক: জয়চন্দ্র সরকার। তাঁর এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হয়েছিল ১৯০৭ ডিসেম্বর ২৩-এ। হাইকোর্ট ১৯০৮ মে ২৬-এ সেই রায় বহাল রাখে। দ্বিতীয় দফায়, ১৯১০ জানুয়ারী ১৭-ই সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার ও মুদ্রাকর সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ীর যথাক্রমে তিন বছর ও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মে ২৬-এ হাইকোর্ট জয়চন্দ্রর দণ্ড সমর্থন করে এবং সুরেন্দ্রর ক্ষেত্রে আপীলের সময় আবদ্ধ-অবস্থা দণ্ড-ভোগ-কালে পরিণত করে।

খুলনার 'হুঙ্কার' পত্রিকার মামলা; কলিকাতায় মুদ্রাকর কালীচরণ বসুর বিরুদ্ধে। তাঁর অর্থদণ্ড হয় জানুয়ারী ১৯০৯ সালে।

'সন্তান শিক্ষা' রচনা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ত্রিপুরা)-র রামকানাই দত্ত এবং প্রকাশক হলেন যতীন্দ্রলাল দত্ত। এঁদের সাজার কথা সঠিক জানা যায়নি।

একই সঙ্গে কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হয় বরিশালে। মুকুন্দলাল দাস, ওরফে যজ্ঞেশ্বর দে (যাত্রাওয়ালা) ও তাঁর ভাই রমেশের বিরুদ্ধে মামলা হয় 'মাতৃপূজার গান' নামক বইখানি নিয়ে। দ্বিতীয় দফায় ভবরঞ্জন মজুমদার জড়িত হন 'দেশের গান' বই নিয়ে; তিনি মুদ্রাকর ও প্রকাশক। আর, নিবারণচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়কে তাঁর 'আদর্শ প্রেস'-এ ঐ দুই (নিষিদ্ধ) পুস্তকের মুদ্রণের জন্য অভিযুক্ত করা হয় বাখরগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। ভবরঞ্জনের ঘটে দেড় বৎসরের কারাবাস ও ৫০০ টাকা জরিমানা এবং নিবারণের ছয় মাস কারাদণ্ড হয় ১৯০৯ জানুয়ারী ৯-ই।

মুকুন্দর এক বৎসর ও তাঁর ভ্রাতা রমেশের নয় মাস সশ্রম জেল-বাসের হুকুম হয় ১৯০৯ জানুয়ারী ২৬-এ।

একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'পন্থাঃ', এই সময় প্রকাশিত হ'ত। প্রকাশক ছিলেন কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাজদ্রোহের মামলায়, ১৯০৯ ফেব্রুয়ারী ২৩-এ, কিরণচন্দ্রর দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

একটি ছোট্ট নাটক। পুলিশ ধরপাকড় ও মামলা যদি না করতো, এটা কারও নজরে পড়তো না। বইটির নাম 'রণজিতের জীবন-যজ্ঞ'; যথাক্রমে গ্রন্থকার ও প্রকাশক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র বসু; প্রমাণিত হ'ল বইখানি রাজদ্রোহমূলক। ত্রুটির জন্য দু'জনেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ১৯০৯ জুন ১৫-ই প্রতি জনে ১০ টাকা করে জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি পান। হরিপদর আর দু'খানা বই—'দুর্গাসুর' আর 'পদ্মিনী' গভর্ণমেণ্টের বিষনজরে পড়ে। (পরে নিষিদ্ধ পুস্তক-তালিকায় এদের নাম পাওয়া যাবে।)

'মাতৃপূজা' একখানি গানের বই, কবি হলেন কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়; প্রকাশক জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। নবীনচন্দ্র পাল হাওড়ার 'দি ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস'-এ বইখানি ছাপেন। সকলকে ধরে মামলায় টেনে জড়িয়ে দেওয়া হয় ১৯০৯ মার্চ ২-রা। জুলাই ১২-ই কুঞ্জর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুদ্রাকর নবীনচন্দ্র পালের ২০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়।

'হিতবাদী' পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক নীরদচরণ দাস রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন ১৯০৯ সেপ্টেম্বর ২৮-এ এবং তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ডর আদেশ হ'ল— ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১২-ই। হাইকোর্টের আপীলে ৩-রা জুন সাজা ছয় মাস হ্রাস করা হয়।

এ-সময় নানা পত্রিকা দেশাত্মবোধে পূর্ণ হয়েছে। সকলের নাম দেওয়া সম্ভব নয়; সব সংবাদও যে পৌঁছেচে সে-অনুমান নিতান্ত ধৃষ্টতা বলে মনে হবে। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত আর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাগেরহাটের 'পল্লী চিত্র' পত্রিকার সম্পাদক বিধুভূষণ বসু, মুদ্রাকর অবনীমোহন দে; অপরাধ ১২৪-এ ও ১৫৬-এ। ১৯০৯ ডিসেম্বর ২৩-এ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই বিভূতির চার বৎসর এবং অবনীর চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডর আদেশ হয়। সঙ্গে গ্রেপ্তার হন নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র। তিনি রাজদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন

এক কবিতা লিখে। সেটা ছাপা হয়েছিল 'পল্লী চিত্র' পত্রিকায়। ঐ একই দিনে তাঁর দু'বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

'খুলনাবাসী' পত্রিকার সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; আর, মুদ্রাকর পঞ্চানন ঘোষ। মামলা ১২৪-এ ধারায়, অর্থাৎ রাজদ্রোহ। সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করায় ১০০ টাকা জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান ১৯১০ ফেব্রুরারী ১৬-ই। ঐ দিনই পঞ্চাননের দুই দফায় প্রত্যেকটিতে দু'বৎসর করে কারাদণ্ডর আদেশ হয় এবং পর পর দু'বৎসর অর্থাৎ মোট চার বৎসর সশ্রম দণ্ড। হাইকোর্ট জুলাই ২৭-এ দুই দণ্ড একসঙ্গে ভোগ করবার নির্দ্দেশ দেয়।

পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল যতীন্দ্রনাথ বসুর 'কমলা প্রেসে'। জানুয়ারী ২৮-এ তারিখে সেটি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি করা হয়।

'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকার মুদ্রাকর হিসাবে মনোমোহন ঘোষের ১৯১০ জুন ১৮-ই ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি হাইকোর্টের বিচারে নভেম্বর ৭-ই নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় অব্যাহতি পান।

'নব্য ভারত' ছাপাখানার মালিক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, আর মুদ্রাকর ভূতনাথ পালিত; আপত্তিকর বই ছাপার জন্য মার্চ মাসে অভিযুক্ত হন। ১৯১০ সেপ্টেম্বর ৮-ই দেবীপ্রসন্নর ৭৫০ টাকা জরিমানা হয়; আপীলে ১৯১১ ফেব্রুয়ারী ২-রা পরিমাণ হ্রাস করে ৩০০ টাকা করা হয়।

সৈয়দ ইসমাইল সিরাজী 'অনল প্রভা'র গ্রন্থকার। তার মধ্যে পুলিশ রাজদ্রোহ আবিষ্কার করে। ১৯১০ সেপ্টেম্বর ১৪-ই সিরাজীর দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়।

চট্টগ্রামে মুদ্রিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত' ১৯০৯ সালের প্রথমদিকে। সেই উপলক্ষে বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী ও রমণীমোহন দাস অভিযুক্ত হন। মে ১৯-এ দু'জনেরই এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। কিন্তু দায়রা-জজ আপীলের বিচারে জুন ৭-ই বরদাচরণের সাজা আপীলে বিচারাধীন থাকার কাল জেল-বাস ও ২০০ টাকা জরিমানা করেন।

এর পর আরও নানা মামলা হয়েছে কিন্তু সে-সকলের তথ্য এখানে প্রকাশের চেষ্টা হতে বিরত হলাম। উপরে প্রদত্ত বিবরণ-প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা ভাল যে, দণ্ডিত ব্যক্তিদের রচিত, মুদ্রিত বা প্রকাশিত ছোট-বড় পুস্তিকা, পত্রিকা প্রভৃতি সরকার কর্ত্তৃক তখনই বা পরে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

'ধনঞ্জয় পর্ব্ব'

বরিশাল কন্ফারেন্সের অনাচারের পর মারের বদলে "ফিরিয়ে মারা"র কর্ম্মসূচী প্রকাশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' ও 'নবশক্তি' তো

বটেই, মাঝে মাঝে 'ভারতী'. 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকা এ নীতি প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে।

এদেরও আগে, একটি প্রায় অবজ্ঞাত, অজ্ঞাত তো বটেই, পত্রিকা নতুন সুরে গান ধরেছিল। তার নামটিও বেশ—'প্রতিজ্ঞা'।

বঙ্গভঙ্গর চার মাস আগে, ১৯০৫ জুলাই ২৬, 'প্রতিজ্ঞা' এক কবিতা প্রকাশ করে ঃ

"সূচীভেদ্য তামসী রজনী, সমস্ত নভোমণ্ডল গভীর মেঘাচ্ছন্ন, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হচ্ছে। গুরু রামদাস স্বামী আর শিষ্য শিবাজি-মহারাজ পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

'জাতির ও ব্যষ্টির কল্যাণ কি উপায়ে সম্ভব ?' জিজ্ঞাসা করলেন শিবাজি। গুরুর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে শিষ্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ভারতমাতা দণ্ডায়মানা, আস্যে মৃদু হাস্য ; ইঙ্গিতে অসি দেখিয়ে বলছেন—'জগতের মাঝে এই এক বস্তু সনাতন সত্য।'

শিবাজি শুনলেন বহু দেববালার কণ্ঠে সমবেত সঙ্গীত। তার ভাষায় রয়েছে তরবারির অজস্র গুণগান ঃ 'সকল অত্যাচার হতে মুক্তি-সাধনে, দেশের শান্তিরক্ষায়, শ্রী-সম্পদ-বৃদ্ধির সহায়তায়, মানুষের সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে এই তরবারিই একমাত্র আশ্রয়স্থল।' "

বুঝতে কষ্ট হয় না, ঘনতমসাবৃত রাত্রি দ্বারা ইংরেজ শাসনকে উদ্দেশ করা হয়েছে, বাকীটা স্বাধীনতা-লাভের পথ নির্দ্দেশ করছে।

হয়তো এ কবিতার মর্ম্ম নিয়ে মতদ্বৈধ হতে পারে, কিন্তু ১৯০৫ আগষ্ট ৩০-এ একই সঙ্গে একটি কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কবিতা বলছে—"কেবল প্রার্থনা দ্বারা ও অপরের দাক্ষিণ্যে দেশের দুর্দ্দশা দূর হবে না। শক্তির আরাধনাই স্বাধীনতার একমাত্র পথ। অতএব অস্ত্রধারণ কর এবং দেশমাতৃকার ঋণ-পরিশোধে কৃতসঙ্কল্প হও। অনাহারে ধীরে ধীরে যখন মৃত্যু অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়েছে, তখন রণভূমিতে তরবারি-হস্তে মরণে আর ভয় কেন ? এ মৃত্যু স্বর্গে তোমায় অমৃতত্ব দান করবে। বিদেশী শত্রুর রক্তপাতে প্রতিহিংসা গ্রহণ কর, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও, প্রচণ্ড নিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা করে ত্বরিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হও।"

ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত অপর এক প্রবন্ধে বক্তব্য অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হয়েছে। বলা হচ্ছে—"যখন অপর সকল প্রক্রিয়া বিকল হয়, তখন এক প্রহারই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। অন্য কোনও ব্যবস্থাই ইহার সমকক্ষ নয়।" উদাহরণের সঙ্গে একটা প্রয়োগ-ক্ষেত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পাল এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, সাধারণ পোশাকে উপস্থিত পুলিশ সে-বক্তৃতার নোট্ নিচ্ছে।

তখন 'প্রতিজ্ঞা' যুবকদের উদ্দেশ করে বলছে—"পুলিশ যখন সাধারণ নাগরিক পরিচ্ছদে এসেছে, তখন তাদের উত্তম-মধ্যম কয়েক ঘা দেওয়া উচিত ছিল।"

সে-যুগে এসকল কথা সাহস করে বলবার বা পত্র-পত্রিকায় লেখার সাহস বিশেষ কারও ছিল না। পরে উগ্রজাতীয়তার গন্ধ পাওয়া গেছে। 'প্রতিজ্ঞা'কে সে-হিসাবে "ধনঞ্জয়" ভাবধারার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। 'সন্ধ্যা' অবশ্য এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে, ১৯০৪ নভেম্বর ২৬-এ ; কিন্তু তার ভাষণ উগ্র হয়েছে ১৯০৬-এর এপ্রিল থেকে। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে অনাদৃত পত্রিকার অবদান স্মরণ করছি। পরিচালক ও প্রবন্ধ-লেখকদের দেশপ্রেম প্রাণখোলা ভাষায় প্রকাশের সৎসাহস আজও মনকে উদ্বেল করে তোলে। কেবল মনে প্রশ্ন ওঠে—"এঁরা কারা ?"

পত্রিকা না হলেও, অজ্ঞাতপরিচয় কে বা কাহারা ঐ একই সময়ে একখানি ক্ষুদ্র ইস্তাহার প্রকাশ করেন। উত্তরকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার জন্য এখানে তার উল্লেখ করলাম। 'দৈনিক হিতবাদী' ১৯০৫ আগষ্ট ৫-ই ইহা মুদ্রিত করে। আগষ্ট ৩-রা ষ্টার থিয়েটার হল্-এ বিপিনচন্দ্র পাল একটি বক্তৃতা দেন। লোক-সমাগমের সুযোগ নিয়ে অজ্ঞাত যুবকরা এটি বিতরণ করেন।

তার প্রথমেই বলা হয়েছে—"প্রকৃতির নিয়মে স্বাধীনতাই সর্ব্ব জীবের লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর স্বাধীনতাহীন মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা-লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকে।"

দ্বিতীয়তঃ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করতে স্ব-নিয়ন্ত্রণ, স্ব-রাজ অবশ্য প্রয়োজন।

যাঁরা এই রক্তাঙ্কিত পথে নিজেরা চলেছেন, অপরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাব শুরু আলোচনা করলে বিস্ময়ান্বিত হতে হয় যে, এই ক্ষীণ ধারা পরে কি বিশালতা লাভ করেছিল, যাতে শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

নিরস্ত্রের প্রত্যুত্তর

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ শ্বেতাঙ্গদেব ঔদ্ধত্য বহুলাংশে সাধারণের মধ্যে উত্তেজনার রসদ যুগিয়েছে। আপদ এসে জুটলে করিতকর্ম্মা মানুষ নিশ্চেষ্ট না থেকে উদ্ধার হবার পথ খুঁজে বার করে। জীবনের জয়যাত্রা এই এক মন্ত্রে চালিত হয়েছে। অভাববোধ এবং তাকে দূর করবার প্রচেষ্টা আজ মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে ; কয়েক দশক পূর্ব্বেও যা অভাবনীয় ছিল তাকে সহজলভ্য করেছে।

শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক, বিশেষতঃ পুলিশ কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, আহত হবার সংবাদ সে-যুগে প্রায়ই শোনা যেত, এবং সে অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য

করাই একটা রীতি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু "স্বদেশী" অর্থাৎ তার এক অর্থে আত্মসম্মান-বোধ জাতির চিত্তে ক্রমেই ফুটে উঠেছে। এমন সময় সাধারণ লোকের বোধগম্য ভাষায় নানা মন্ত্র উচ্চারিত হতে আরম্ভ হয় উগ্রমতের জাতীয়তাবাদী পত্রিকায়। সবেরই নির্গলিতার্থ ছিল মারের বদলে মার, ইংরেজি ঘুষি বনাম দেশী কিল, গালাগালির বদলে চড়, কিলের বদলে লাথি, ইত্যাদি। ইংরেজী প্রবচন "Eye for an eye ; tooth for a tooth" শিক্ষিত মহলে প্রচারিত হয়েছিল।

কলিকাতার বড়বাজারে ১৯০৫ অক্টোবর ৩-রা ছেলেদের সঙ্গে বিলাতী কাপড় বিক্রয় নিয়ে হাঙ্গামা বাধে। পুলিশ কয়েকজনকে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজতে পোরে। সংবাদ পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ছুটে গেলেন। অনেক বিতণ্ডার পর প্রত্যেকের দু'শ' টাকা হারে জামিনে ছেড়ে দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসামীরা পুলিশ কর্তৃক নির্ম্মম প্রহারের অভিযোগ করে এবং আঘাতের চিহ্ন দেখায়। পুলিশের হাতে সাজার বহর দেখে অক্টোবর ৫-ই হাকিম তাদের মুক্তি দেন।

ময়মনসিংহের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ 'বল্লা মামলা'য় অভিযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাহার মুক্তি-দিবসে 'সুহৃৎ সমিতি'র সম্পাদক কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ নিদারুণ প্রহার করে। কেদারের সঙ্গে থাকায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুরূপভাবে প্রহৃত হন। সে-সব দিনে "স্বদেশী" আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা সহানুভূতি পোষণ করা কতদূর বিপজ্জনক ছিল, এইসকল অত্যাচার তার কিছুটা সাক্ষ্য বহন করে।

১৯০৬ মার্চ ৩১-এ কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, নগেন্দ্রনাথ দাস ও ক্ষীরোদচরণ দাস পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষে জড়িত হন। তাঁদের নামে পুলিশকে মারপিট (assault and using criminal force) করার অভিযোগে আদালতে হাজির করা হয়।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ সেন ১৯০৫ ডিসেম্বর ১৪-ই পুলিশকে মারপিট (assaulting a constable) ও রাস্তা বন্ধ করা (obstructing a public thoroughfare) অপরাধে দণ্ডিত হন।

শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক অপমানের প্রতিকার-চেষ্টা নানা ক্ষেত্রে হয়েছে ; তার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ যুবকের মন আরও এক উচ্চ সুরে বাঁধা শুরু হ'ল ; অর্থাৎ পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্টও এই মনোভাব দমন করবার জন্য কঠোরতম শাস্তির পথ গ্রহণ করেছিল। কিশোর ও যুবকদের কোমল অঙ্গে কঠোর বেত্রাঘাত যেন একপ্রকার গতানুগতিক দণ্ডের পর্য্যায়ে এসে পড়েছিল।

প্রথম "রাজনৈতিক" সংঘর্ষের বৃত্তান্তটি অতি মনোজ্ঞ ; ১৯০৫ নভেম্বরের ঘটনা। আর এই থেকে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির শক্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সাধারণ একটি মদ্যপ, পুলিশের সাক্ষীতে হাবু নাথ নামে পরিচিত ; পথে 'মাতলামি'

করে চলেছিল। কর্ত্তব্যরত পুলিশ তাকে পাকড়াও করলে, সে উচ্চকণ্ঠে বার দুই "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করে ওঠে।

রাস্তার অপর পার দিয়ে চলেছিলেন জানকীনাথ দত্ত। তিনি এসেই "বন্দে মাতরম্" নাম-গ্রহণে সকল-পাপ-মুক্ত হাবুকে ছেড়ে দেবার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করলেন। তাতে অবশ্য কোনও ফল হ'ল না। তখন দু'পক্ষেই কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ ঘটলো।

তখন আবও (অধুনা-লুপ্ত) 'লালপাগড়ি' এসে জানকীনাথের ওপর হামলা করে হাজতে নিয়ে গেল। পুলিশের প্রহার এবং তার কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে কাজী কিংস্‌ফোর্ড ১৯০৫ নভেম্বর ২৮-এ জানকীনাথকে পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন। কাছারি-প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য স্থানে সেই আদেশ পালিত হয়েছিল। হাবুর ৭৫ টাকা জরিমানা হয়।

পরের হাঙ্গামার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৭ আগষ্ট ৭-ই। 'যুগান্তর' অফিস খানাতল্লাসী চলছে চাঁপাতলায় ; পুলিশ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, এ 'শুভ' কার্য্যে কোনও রকম বাধা পাবে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। ভিড় দেখে সেখানে জুটে গেল অনেক লোক। তার মধ্যে ছিলেন রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জ্যোতিষচন্দ্র রায় আর 'যুগান্তর'-এব তরুণ কর্ম্মী শৈলেন্দ্রনাথ বসু। এখানে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় সেটার গুরুত্ব নিতান্ত উপেক্ষা করার মত নয়। যা হয়েছিল, তার ওপর ১৯০৭ আগষ্ট ৮-ই 'সন্ধ্যা' লিখেছিল—"যুগান্তরে রক্তারক্তি, ফিরিঙ্গিদের ফাটলো পিত্তি"। তাৎকালিক বিবরণে পাওয়া যার যে দু'পক্ষেই বেশ খানিকটা রক্তপাত ঘটেছিল।

The Indian World পত্রিকা (আগষ্ট ১৯০৭, পৃঃ ১৬৫) লেখে—"A boy from the *Yugantar* office was handled severely by the police" and he also "dealt some telling blows on his assailant".

নিম্ন আদালতের বিচারে শৈলেনের তিন মাস ও জ্যোতিষের এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপীলে ২৮-এ আগষ্ট (১৯০৭) জ্যোতিষের সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকারে পাঁচ শত টাকা জামিন মুচলেখায় পরিণত হয়। শৈলেন আর আপীল করেননি।

সুশীল সেনের বেত্রদণ্ডের খবরটাই বেশী করে প্রচারিত হয়েছিল। জানকীনাথ দত্তর কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধে ঐ সময় আরও যে কয়জন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের নামও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন মনে করি। 'সঞ্জীবনী' প্রথমে প্রকাশ করলে, পরে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (১৯০৭ নভেম্বর ৯-ই) সে-সংবাদ পুনর্মুদ্রিত করে।

জানকীনাথ দত্তের কথা সেখানে প্রথমে দেওয়া ছিল ; দ্বিতীয় ছিল সুশীল

সেনের। তারপর পান্নালাল শেঠ ও পঞ্চানন দাসের। এঁদের প্রত্যেককেই আদালত-প্রাঙ্গণে সর্ব্বসমক্ষে দশ-দশ বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। এতেও কাজী-সাহেবের মন ওঠেনি। কালীপ্রসন্ন সাহা ও পঞ্চদশ-বয়স্ক বালক তিনকড়ি দে প্রত্যেককে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দেওয়া হয়। কালীপ্রসন্নর সাজা প্রকাশ্য স্থানে, আর তিনকড়ির সাজা প্রেসিডেন্সী জেলে সংসাধিত হয়।

আবও যে এরকম হযনি, সে কথা হলফ করে বলতে পারা যায় না। এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিযেছিল। এব পটভূমিকা গঠিত হয়েছিল কাজী কিংস্‌ফোর্ড-এর চিন্তাধারায়। তিনি এ শ্রেণীর প্রায় প্রতি মামলায় আওড়াতেন—"যুবকদের বর্ত্তমান বিদ্রোহী-মনোভাব দমন করবার জন্য এর প্রয়োজন আছে ; তারা কারণে অকাবণে পুলিশকে প্রহার করে, আর সেই কারণেই পুলিশের মর্য্যাদা-রক্ষায় এ সাজা একান্ত প্রযোজন।" (ইংরেজীতে ঃ "The punishment was called forth by the prevailing spirit of rebellion among students which prompts them to assault police whenever possible and by the necessity of upholding the authority of the police.")

এই শ্রেণীর গুরুতর শাস্তি অনবরত চলতে থাকলে, প্রকাশ্যে তো বটেই হৃদয়হীন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও এ রুক্ষতার ওপর নজর দেয়। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ওপর সরকার নির্দ্দেশ দেয় যে, ষোলোর অনধিক-বয়স্ক কিশোরদিগকে সাজা হিসাবে বেত্রাঘাত দেওয়া প্রয়োজন বোধ হলে সেটা খানিকটা "মোলায়েম" করে নিতে হবে। যদিও আইনমতে ত্রিশ-ঘা দেওয়াও সিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পনেরোই হবে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা। প্রকাশ্য স্থান পরিহার করে জেলের অভ্যন্তর বা কাছারির সন্নিকটে ঘেরা জায়গা নির্ব্বাচিত হবে। সাজার তীব্রতা আসামীর সহনশক্তির অতিরিক্ত হয় কিনা, সেটা বিচারের জন্য একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে উপস্থিত রাখা বাঞ্ছনীয়। ক্ষতস্থান যাতে বিষাক্ত হয়ে না যায় সেজন্য বীজাণুনাশক লোশনে ভিজিয়ে খানিকটা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে আঘাত দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট স্থান ঢেকে দিতে হবে। বেতটি হবে আধ ইঞ্চি ব্যাসের, কিন্তু কিশোরদের ক্ষেত্রে বেতটি হবে অপেক্ষাকৃত লঘু ওজনের। তালুতে যদি বেত মারা স্থির হয়, তাহলে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন হাতের কোনও স্থায়ী ক্ষতি না হয় (*The Indian World*, November, 1907)।

এ সতর্কবাণী পড়লে কি মনে হয় না যে, এই শ্রেণীর দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতো ? সকলেই সুশীল সেনের মত অকাতরে সহ্য করবার মত মনের শক্তির অধিকারী ছিল না। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন বেত্রদণ্ড আইন (Whipping Act) ১৮৯৯ সালে পাশ হয়, তখন ভারতীয় বহু পত্রিকা এর অপপ্রয়োগের সম্ভাব্যতায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তবু তখন তারা জানতো না যে,

সভ্য ইংরেজ রাজত্বে নির্বিবচারে এই কঠোর দণ্ড রাজনৈতিক কিশোর ও যুবক অপরাধীর উপর প্রযুক্ত হবে।

এই অবস্থার কথা বিবেচনা করে *London Daily News* লিখেছিল ঃ

"To flog young men for political offences, however foolish they have been, is the surest way of turning the whole educated sentiment of India against us."

সংক্ষেপে, "যত বড়ই বোকামির কাজ এরা করে থাকুক, রাজনৈতিক অপরাধে যুবকদের প্রতি বেত্রদণ্ড সমস্ত শিক্ষিত ভারতীয়ের মন আমাদের প্রতি বিরূপ করে তুলবে।"

অতি সত্য কথা। প্রকৃতপক্ষে যুব বাঙ্গালী মন ক্রমে এই ধরনের নির্য্যাতনের জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে এবং যে-সকল অত্যাচারের কথা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়, তাহাও অকাতবে সহ্য করেছে। অপরাপর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

পুলিশকে বিদ্রূপ বা বিপক্ষতাচরণ সম্বন্ধে কলিকাতা এবং দূর পল্লীতেও যে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্রিকায় কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি ; যা পাওয়া গিয়েছে, তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা যাচ্ছে।

সবে-মাত্র বঙ্গ-বিভাগের ঘোষণা হয়েছে ঃ লোকের মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ একদল স্বল্পবয়স্ক যুবককে—ধীরেন্দ্রনাথ রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, খগেন্দ্রজীবন রায় ও হরকিশোর ধরকে ময়মনসিংহে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাকড়াও করে। তাদের অপরাধ, থানার দারোগাকে লক্ষ্য করে তারা ঢিল ছুড়েছে। ঐ মাসেই বরিশালে ধরা পড়েন সুরেশচন্দ্র, কারণ তিনি দারোগাবাবুকে গালিগালাজ করেছেন। ভবানীপুর, কলিকাতা (১৯০৫ ডিসেম্বর ১২-ই) মামলায় হাজির করা হয় সুরথকুমার বসুকে ; অপরাধ—কনেষ্টবলকে প্রহার। জলপাইগুড়িতে দুর্গাদাস অভিযুক্ত হয়েছিলেন (১৯০৫ ডিসেম্বর ২-রা) ; তিনি বিদেশী মালের দোকানে পিকেটিংয়ে রত এবং ধৃত দু'জনকে পাহারাওয়ালার কবল থেকে মুক্ত করে দেন। তাঁর সঙ্গে আসামী ছিলেন আদ্যনাথ ও চণ্ডীদাস। দুর্গা আর আদ্যনাথের চৌদ্দ দিন করে জেল হয়, চণ্ডীর হয় ৫০ টাকা জরিমানা (১৯০৫ ডিসেম্বর ২১-এ)। আদ্যনাথ ফেব্রুয়ারী ৭-ই জেল থেকে মুক্তি পান।

মাদারিপুরে মিঃ ক্যাটেল-এর প্রতি ঢিল ছোড়ার অপরাধে অনন্তমোহন দাসকে অভিযুক্ত করা হয় জানুয়ারী ১৯০৬ সালে ; মাস দুই জেল খেটে এপ্রিল ৬-ই তিনি মুক্তি পান।

বিলাতী মদ নিয়ে একজন ময়মনসিংহে হোসেননগর থেকে যাচ্ছে কিশোরগঞ্জে।

সেটা ১৯০৭ মার্চ মাস। প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক যুবক তাতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং তাতে বেশ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। বিচারে আসামীর আড়াই মাস জেল হয়। সেই প্রফুল্লই ১৯১০ সালে এক হেড-কন্‌ষ্টেবলকে প্রহার করে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সার্জ্জেণ্টকে মারার অভিযোগে ১৯০৭ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় সুরেশচন্দ্র রায়কে অভিযুক্ত করা হয়। অক্টোবর ২-রা 'রংপুর বার্ত্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদককে রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার করলে পত্রিকা-অফিসের নিকট স্থানীয় (ন্যাশনাল) জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত. যতীন্দ্রনাথ দাস, শৈলেশচন্দ্র গুপ্ত, ভুবনচন্দ্র দত্ত ও জেলা-স্কুলের অপর দুইজন ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের মারপিট হয়। ফলে ১৮ বছরের শ্রীশের এক মাস বিনাশ্রম কারাবাস, যতীন ও শৈলেশ (বয়স ১৭) প্রত্যেকের তিন সপ্তাহ সশ্রম ও ভুবনের একমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯০৮ মার্চ কলিকাতায় পুলিশকে প্রহার করার জন্য নলিনীমোহন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রমোহন রায ও কৃষ্ণনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।

শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্যের প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি বয়স্ক লোকদেরও মন প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স, দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠাবান উকিল দুর্গাচরণ সান্যাল ১৯০৭ সেপ্টেম্বর ২২-এ দার্জ্জিলিং মেলে দিনাজপুর থেকে রংপুব যাচ্ছিলেন। যোগপুর হাট থেকে সান্তাহার ষ্টেশনের মধ্যে সহযাত্রী শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যে ব্যাপার সংঘটিত হয়, তার ফলে দুর্গাচরণের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৪ ধারা অর্থাৎ মারপিটের অভিযোগে দিনাজপুরে নালিশ রুজু হয়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তাঁর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রায়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের জন্য ১৯০৮ এপ্রিল ৩-রা হাইকোর্টে নথিপত্র (reference) প্রেরিত হয়। পুনর্বিবচারের আদেশ-বলে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় মামলা জুন ১-লা আলিপুরের দায়রা জজের কোর্টে পেশ করা হয়। জুরিরা একমতে আসামীকে 'নির্দ্দোষ' উল্লেখ করলে জজ ভিন্ন মতে হাইকোর্টের নির্দ্দেশ চান। আগষ্ট ৫-ই হাইকোর্ট আসামীর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দেন।

কারাগারের শ্রমে দুর্গাচরণের স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটে এবং ১৯০৯ মার্চ ৯-ই গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মুক্তি দেয়।

দুটি বেশ বড় রকমের মামলা হয়েছিল ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) নামক নীলকরকে হত্যা, আর হিকেনবোথাম (Hickenbotham) পাদ্রীকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে। আরও নানা হাঙ্গামা হওয়া অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, এসকল ঘটনা "হাত পাকাবার" প্রথম পর্য্যায়। তখনও দেশের যুবকরা যেন সবেমাত্র স্বপ্নোত্থিত হয়ে উঠে শক্তি-পরীক্ষার সূচনা জুড়ে দিয়েছে। এইসকল প্রাথমিক লক্ষণ আলিপুর বোমার মামলার ইঙ্গিত দিতেছিল।

কালের ভেরী

দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে। কি-ভাবে উন্মাদনা এসে গেল, তার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়) বলেছেন—কালের প্রভাবে ও ঘটনার যোগাযোগে এইরকম হতে বাধ্য। সারা বিশ্বে নানা দেশে তখন স্বাধীনতার বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে।

যাই হোক্, ভাবের তরঙ্গ দেশকে মাতিয়ে তুলেছে ; সাহিত্য-জগৎ তা'তে শক্তি-সংযোজন করছে। সেইসঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ হ'ল অপর কোন্ সূত্রে এর উৎসমুখ আরও বীর্য্যসম্পন্ন করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা দৃঢ়ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত। উপরের কাঠামোয় কিছু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সে-কারণে সমস্তটাকে পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ["My hope is to see again the strong points of that India (of glorious past), reinforced, by the strong points of this age only in a natural way."] জগতের নূতন জ্ঞান দ্বারা তার সংস্কারসাধন বিধেয়। মূল ভিত উৎখাত করে নূতন চাক্‌চিক্যময় ভঙ্গুর ইমারত গড়তে গেলে 'এ-কূল ও-কূল দুকূল যাবে'।

চিন্তাশীল দেশনায়কদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পর্ব্বতকন্দর হতে স্বতঃনিঃসৃত ক্ষীণ স্রোত ক্রমে অপরাপর জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বেগ ও বিস্তার লাভ করে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। তাৎকালিক উদ্বেলিত যুবচিত্ত মেতেছিল প্রত্যক্ষসংগ্রামে নিজের রক্তের ধারায় দেশে এক বন্যা সৃষ্টি করবে ; আর, সে-স্রোতে ভেসে যাবে ইংরেজ প্রভাব। শক্তিলাভের সন্ধানে প্রাচীনের দিকে তখন উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল।

দেখা গেল এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ; বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ যার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—"যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা"—সেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এককই স্বাধীনতাকামীর মনের সকল স্তরই প্রভাবিত করতে সক্ষম। দেশভক্তের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সর্ব্বোপরি আত্মিক-শক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলনকল্পে যে-সকল আখড়া, ক্লাব, সমিতি, আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল, যে শিক্ষাদানই হোক্, গীতার একটি উচ্চস্থান ছিল সেখানে।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে ১৮৫৭ সালে। তারপর আর নিবৃত্তি নেই। রণদামামা বেজে চলেছে ধীর বা দ্রুত তালে, প্রচণ্ড আরাবে বা মৃদু রোলে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ভারতের নানা অংশ থেকে ভেসে আসছে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজকে

বরপুত্ররূপে বরণ করে নিয়েছেন ; "খোদা ছপ্পড় ফোঁড়কে" তার জয়ের ঝুলি ভরে দিচ্ছেন। নতুন অস্ত্রশক্তির সঙ্গে ছল-চাতুরি, কূটনীতি, সাম-দান-ভেদ দণ্ড দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় যথোপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশল ইংরেজকে তখন ধাপে ধাপে শক্তি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসন পেতে দিয়েছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর সাম্রাজ্যে এখন সূর্য্য অস্ত যান না ; তাঁর মুকুটে সকল মণি-মাণিক্যের মধ্যে ভারতরূপ শ্রেষ্ঠ রত্ন সন্নিবেশিত হয়ে শোভাবর্দ্ধন করছে।

মুসলমান শাসনের পর তখন দেড়শ' বছর ইংরেজশাসন ভারতবর্ষে অমিত-বিক্রমে চলেছে। এ সময় যদি কোনও অপরিণামদর্শী অবিমৃষ্যকারী লোকের মগজে আত্মহত্যার বাতিক ভর করে থাকে, তার জন্য সমস্ত জাতি নির্য্যতনের জন্য প্রস্তুত হতে চাইবে এরূপ আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জরাগ্রস্ত, ভয়ত্রস্ত, লুপ্তবুদ্ধি এক বিরাট জাতি কতটা আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হলে তেজের তুঙ্গশিখরে অবস্থিত ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সম্মত হবে ? কিন্তু যুগদেবতা ভারতের নিকট সেই অসম অভাবনীয় রণের জন্য উদাত্ত আহ্বানে এক বিরাট রহস্য সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ভয় ও অবসাদ চিত্তকে এখনও ভরে আছে।

ভারতের ইতিহাসে এর নজির আছে। রণসজ্জায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সন্নিবেশ। সব যখন প্রস্তুত "কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ" 'মহাশঙ্খ'ধ্বনি-নিনাদে যুদ্ধারম্ভ ঘোষণা করলেন। কিন্তু স্বয়ং গাণ্ডীবী সব দেখে-শুনে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এতসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব হনন করে তিনি পাতক সঞ্চয় করতে পারবেন না।

ইংরেজের সঙ্গে গোপন বা প্রকাশ্য সমর বেঁধে উঠলে কত নিরীহ লোকের নানা দুর্দ্দশা হবে, প্রাণ যাবে,—এ যুক্তি তখন বড় করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। "অন্যে পরে কা কথা" তৃতীয় পাণ্ডব এসব দেখে বললেন—

"সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥"

—তাঁর শরীর কম্পান্বিত হচ্ছে এবং গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়ছে ; আর দেহের চর্ম্ম যেন জ্বলে যাচ্ছে। ··· "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ, ন চ রাজ্যং সুখানি চ"—জয়. রাজ্য, সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মিটে গেছে।

পার্থের এই করুণ অবস্থা দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"—এরূপ কাতরতা তোমার শোভা পায় না ; তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার কর। যুদ্ধ করতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কেউ প্রাণের পরোয়া করেন না ; তাঁদের জন্য শোক করার কোনও হেতু নেই। আত্মা কখনও হত্যা করেন না, বা নিজে হত হন না। ইনি

জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি, অবক্ষয় ও পরিণামরহিত। সুতরাং নরহত্যার পাতক বর্ত্তমানে কাকেও স্পর্শ করছে না। এটা রূপান্তর মাত্র—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।"

—জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে নতুন পরিচ্ছদ গ্রহণ করার মত আত্মা ক্ষয়শীল শরীর পরিত্যাগ করে নব কলেবর আশ্রয় করে মাত্র।

অযথা চিন্তায় কালক্ষেপ অবিধেয়। "জাতস্য হি ধ্রুবোর্ম্মৃত্যুঃ"—'জন্মিলে মরিতে হবে'—স্বাধীনতা-লাভ-প্রচেষ্টায় পরাধীন জাতিকে এ-কথা সহজ ভাবেই মেনে নিতে হবে। বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম হচ্ছে প্রতি ভারতবাসীর ধর্ম্ম; কারণ "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে"—ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ অন্য কিছু নেই। যুদ্ধ সমাগত—এই "বিষমে", মহাসঙ্কটকালে এতাদৃশ "কশ্মলং ··· অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরম্"—অনার্য্যসেবিত, অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর মোহকে মনের কোণেও স্থান দেওয়া যে যেতে পারে তা সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

'তুমি যদি যুদ্ধ হতে বিরত হও', "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" —'স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিহার করায় পাপগ্রস্ত হবে'। তার ওপর স্মরণ রাখা ভাল, মানী ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও নিন্দার্হ। মনের এরূপ অবস্থা শীঘ্র পরিহার করা বাঞ্ছনীয়, তা না হলে অপর যোদ্ধৃবর্গ মনে করবেন যে সব্যসাচী ধনঞ্জয় রণ পরিত্যাগ করতে উদ্যত। ফলে হবে—"যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্" —'যাঁদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে তাঁদের কাছে তুমি হেয় বলে পরিগণিত হবে'।

সংক্ষেপে এখানে বলে রাখা যায়, বিপদসঙ্কুল কাজ সামনে এসে গেলে তখন সহকর্ম্মীদের কাছে 'খেলো' হবার লজ্জায় আর পশ্চাদপসরণ সম্ভব হয়নি বৈপ্লবিক ঘটনার বহুক্ষেত্রে। দোদুল্যমান অব্যবস্থিত মনের অতি নিখুঁত বিশ্লেষণ।

এই ধর্ম্মযুদ্ধে জয়-পরাজয়, মৃত্যু নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া কোনও বীরের পক্ষে শোভা পায় না। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—যদি মরণই ঘটে, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত; জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবার পথে বাধা নেই। মনের সকল বাধা দূর হলেই "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ"—সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় তুল্যরূপ জ্ঞান হবে,—তাহলে অবান্তর প্রশ্ন এসে মনকে অভিভূত করবে না। সকল বাধাবিঘ্ন দূর হবে, যখন ভাবা যাবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কেবল কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নেই। কেবল অনাসক্ত হয়ে কাজ করে যাবার নির্দ্দেশ।

ইংরেজ কর্ত্তৃক শাসন-শোষণ, অত্যাচার-উৎপীড়ন, স্বাধীনতা-স্পৃহা-দলন, নির্ব্বাসন প্রভৃতি অবিরাম চলেছে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনও অপ্রিয় কথা বললেই রাজদ্রোহ। তখন বাঙ্গলার রাজনীতির কর্ণধাররা মনে করলেন, ইংরেজের "পাপের ভরা" পূর্ণ

হয়েছে এবং শ্রীভগবানের আবির্ভাব আসন্ন। ইংরেজের নিপীড়নে নিষ্পেষণে ধর্ম্ম আজ পর্য্যুদস্ত, অধর্ম্ম মাথা তুলে আপন প্রভাব বিস্তার করছে, সাধুরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছেন। এ দুরবস্থা ও দুর্দ্দশার নিরাকরণে, সাধুর উদ্ধার, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্ম্মকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর আগমনের কাল উত্তীর্ণপ্রায়। শঙ্কা নাই, "সুদর্শনধারী মুরারী" অরি-শোণিতে মেদিনী প্লাবিত করে আবির্ভূত হবেন।

মুক্তিকামী সন্তানের সামনে বিপ্লবের মূর্ত্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে—

"নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং"

—কি ভীষণ আকার! অন্তরীক্ষব্যাপী তেজোময়, বহুবর্ণধারী বিবৃতমুখ ও প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র! সে বদনমণ্ডল করাল দংষ্ট্রাযোগে ভীষণতর হয়েছে। কত নরপতির চূর্ণিত মস্তক দাঁতের ফাঁকে সংলগ্ন থেকে তার বীভৎসতা বৃদ্ধি করেছে!

"যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি"

—যেমন নানা নদীর বহুতর স্রোতধারা সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়;

"যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ"

—যেমন পতঙ্গদল মৃত্যুর জন্য প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ বীরগণ তোমার মুখবিবরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

—প্রজ্বলিত বদন মহা-আনন্দে দুরন্তরূপে লোকসমূহকে গ্রাস করছে। তোমার উগ্ররূপের প্রভা জগৎকে মুগ্ধ করছে। বিপ্লবীর নয়ন ঝল্‌সে যাবার উপক্রম হয়ে উঠছে। মন প্রব্যথিত,—ধৈর্য্য ও শান্তি পরিত্যাগ করছে।

যুবকদিগের মধ্যে গীতাশিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত শান্ত সমাহিত ক্ষুদিরামকে বেদনাতুর কোনও বড় রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"যুবক, মরতে তোমার ভয় করছে না?" সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর পেয়েছিলেন তিনি: "আমি গীতা পড়েছি।" আর একটি কথাও বলবার প্রয়োজন হয়নি; না প্রশ্নকর্ত্তার, না উত্তরদাতার।

আধার বিচার করে গীতার অংশ বেছে শিক্ষাদান করা হ'ত। এমন বিপ্লবী সে-যুগে খুব কমই ছিল, যারা গীতার শিক্ষায় কমবেশী প্রভাবিত হয়নি। সে-কারণে

গীতা পুলিশের "আপত্তিকর" পুস্তকের তালিকায় স্থান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিল।

যে সাহিত্য বাঙ্গালীর মন চঞ্চল করে তুলেছিল, প্রথমে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং কাজে তার রূপ দিতে উদ্‌বুদ্ধ করে আসছে, তার একটু পরিচয় রেখে দেওয়া দরকার। সংবাদপত্র-গোষ্ঠীর প্রভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ দেখালেন, তার পরে অনেক পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বিদেশীর প্রতি তাদের বিদ্বেষ-বৃদ্ধির কারণ বোঝা যাবে।

টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনী বলেছেন—"একটা জাতের সাহিত্য তার মনের মাপকাঠি। যদি কোনও জাতি স্বাধীনতা চায়, তার সাহিত্য থেকে সেটা বুঝতে পারা যায়, তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কতখানি। অর্থাৎ—ফিকে, ভাসা-ভাসা অথবা গভীর। লোকের মনের অবস্থা যেরকমই থাক্, তীব্র-আবেগ-প্রভাবিত লোক-সাহিত্য সাহায্যে তাঁর মনের উত্তেজনা সাধারণের মধ্যে প্রবিষ্ট করে, তাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে, অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করে বিচলিত করতে, সংগ্রামে অবতীর্ণ করতে পারে। সুতরাং সাহিত্যই কোনও মহদুদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান উপকরণ। সাহিত্যই স্বাধীনতার বেদীমূল, তার দুর্গ, তার পতাকা (প্রতীক), সনদ। স্বাধীনতার মন্দিরের পূজারী দেশ-প্রেমিকরাও। এখান থেকেই সেনা যায় রণক্ষেত্রে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে আহ্বান জানিয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, এবং জয়যুক্ত হয়ে দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করে।"

"A nation's literature is an index to its mind. If the nation has its will to win, from its literature we learn if it is half-hearted or if it cares not at all. Whatever state prevails, passionate men can pour their passion through literature to the nation's soul and make (it) burn and move and fight. For this reason it is of transcendent importance to the Cause. Literature is the shrine of Freedom, its fortress, its banner, its charter. In its great temple patriots worship ; from it soldiers go forth, wave its challenge and fight, and conquering write the charter of their country."

(T. MacSwiney : *Principles of Freedom*)

'আনন্দ মঠ'

বঙ্কিমচন্দ্র গীতার আলোচনা করেছেন। কিন্তু সে-যুগে তাঁর 'আনন্দ মঠ' বিপ্লবের গীতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—গীতার বিস্ময়কর রাজনৈতিক ফল ("astonishing political consequences") বলে 'আনন্দ মঠ' অনন্যসাধারণ পরিচিতি লাভ করে, এবং 'শনির দৃষ্টি' পড়ে বহুসংখ্যক বই পুলিশ-গারদে পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে।

বইখানি লেখা হয় ১৮৮২ সালে ; "বন্দে মাতরম্" রচিত হয়েছিল আরও দু'তিন বছর আগে। বিশ বৎসর বাদে যখন দেশ ও বিদেশের ঘটনাসংঘাতে লোকের মনে দেশাত্মবোধ দানা বেঁধে উঠেছে, তখন গীতসম্বলিত 'আনন্দ মঠ' জাতির চক্ষে নূতন আলোকপাত করেছিল। দেশপ্রেমের সমুদ্রমন্থনে ভাবতরঙ্গে উত্থিত অমৃত "বন্দে মাতরম্" মৃতপ্রায জড় জাতির দেহে সে-যুগে নবজীবন সঞ্চার করেছিল।

এই মায়েব কোলে যুগযুগান্ত ধরে বংশের ধারায় অজস্র বাঙ্গালী জন্মেছে ও মরেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি নিয়ে মায়ের রূপ অবলোকন করার শক্তি কারও ছিল না। অপার্থিব তুলিতে এ মহামহিমান্বিত শ্রীমণ্ডিত মায়ের চিত্রের রেখাপাত অপব কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে রূপে কোনও অস্পষ্টতা, আবিলতা নেই। দেশপ্রীতি নবপ্রেরণায় উৎসাবিত হচ্ছে, দেশের মাটির 'পরে মাথা ঠেকাবার জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে ; অন্তবের রুদ্ধভাব ভাষায় রূপপরিগ্রহ করে বেরিয়ে এল—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

বাঙ্গালী তখন বুঝলে, দেশ কেবল এক মৃৎপিণ্ডমাত্র নয় ; ইনি ঐশীশক্তিধারিণী মাতাব অপরূপ সৌন্দর্য্যের প্রতীক। তাঁকে আমরা দেখছি "বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং", আর প্রাণ খুলে বলছি—

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী ···"

'আনন্দ মঠ'-এ আমরা দেখলাম—মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন, মা যা হবেন,—ত্রিকালের মূর্ত্তির সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় হ'ল। যা হবেন—সন্তানরা হৃদয়শোণিত-তর্পণে তার আবাহন জানাবে, আগমের পথ নিরঙ্কুশ করবে। তখন তাঁকে আমরা দেখবো, 'কমলাকান্ত'র ভাষায়—"দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ---এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।" দেশপ্রেমে বিক্ষুব্ধ চিত্তের উদ্বেলিত মনোভাব "বন্দে মাতরম্" রূপে ভাষায় প্রকাশ-লাভ করেছিল। স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানে ভরপুর, আত্মভোলা বাঙ্গালীকে সন্তানদল গঠন করবার

প্রেরণা যুগিয়েছে 'আনন্দ মঠ'। মনস্কাম সিদ্ধি করতে গেলে জীবন ও সর্ব্বস্ব পণ করতে হবে, সঙ্গে থাকবে মাতৃসেবায় অচলাভক্তি-সমন্বিত একচিত্ততা।

ঘরছাড়া বাঙ্গালী সন্তান ভবানন্দর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছে—"আমরা অন্য মা মানিনা—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সুজলা সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা মা,—"

সন্তানের শপথগ্রহণ ছিল অবশ্যকরণীয় রীতি। ইহার মধ্যে আছে ত্যাগের মন্ত্র; যত দিন না মাতার উদ্ধার হয, ততদিন গৃহধর্ম্ম, মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, দাবাসুত, আত্মীয-স্বজন, দাসদাসী সবই পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে সন্তানকে ইন্দ্রিয জয় করতেই হবে, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন হবে ঘৃণিত আচার। সকল উপার্জ্জন বৈষ্ণব-ধনাগারে জমা দিতে হবে। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করতে হবে; রণে ভঙ্গ দেওয়া মহাপাতক। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হলে—জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হবে, বিষপানে জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

যে রাজা স্বীয় প্রজার কাছে অর্থ সংগ্রহ করে অথচ তাদের মঙ্গলে ব্যয় করে না, সে রাজার ধন লুণ্ঠন করা অপরাধ নয়। ইংরেজ ভারতের অর্থ নিয়ে যায়, তাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে, আর ভারতবাসী অনাহারে মরে। 'যুগান্তর' পত্রিকা সরকারী ধন লুণ্ঠনের জন্য প্রকাশ্যভাবেই যুবকদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

ইংরেজের সাহসকে অনুকরণ কববার নির্দ্দেশ দিয়েছে 'আনন্দ মঠ'। "সিপাহীর তোপের মুখে উড়িয়া যাইবে" বলে যে ভীতি-প্রদর্শন হ'ল, তদুত্তরে সন্তান বলছে—"একবার বৈ তো আর দু'বার মরবো না।" সিপাহীর অস্ত্র লুঠ ব্যতীত নিজেদের অস্ত্র-নির্ম্মাণের পন্থা নির্দ্দেশ করা আছে। পদচিহ্নে মহেন্দ্রর প্রাসাদে নির্ম্মিত সপ্তদশ কামান মুসলমান ও ইংরেজের সম্মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব করেছিল।

সন্তানদের নিকট কোনও কাজই কঠিন নয়। "সন্তানের নিকট কঠিন কাজ আছে কি?"—এ প্রশ্নের এক উত্তর—"না, জীবনপণে—লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে।"

সমস্ত 'আনন্দ মঠ'-ই নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা। ত্যাগ, শৌর্য্য, সেবাধর্ম্ম, ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং ধর্ম্মে রতি জাতির যুব-চরিত্রের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং শেষ জয় যে অবধারিত সে অটুট বিশ্বাস মনকে ভরে রেখে দেবে। একখানি গ্রন্থে যে শিক্ষা নিহিত ছিল, তাতে 'আনন্দ মঠ'-কে স্বরাজগীতা বলে অত্যুক্তি করা হয়নি। জাতীয় জাগরণের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" ফাঁসীর রজ্জুতে শ্বাস রোধ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশভক্ত যথাশক্তি উচ্চারণ করেছে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কিছু

আগেই "বন্দে মাতরম্" সংগ্রামী-চিত্তের ভাষা হয়ে উঠেছিল ; প্রথমে ১৯০৪ সালে ময়মনসিংহে এই ধ্বনি বহুর কণ্ঠে একত্র উচ্চারিত হয়ে, পরে আসমুদ্রহিমাচল মাতিয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেস কর্তৃক ভারত-শাসন-লাভের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলে যা পরিচিত ছিল, তাকে নির্ব্বাসন দিয়ে,—সঙ্গীতের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, বাঙ্গালীর নয়, সমগ্র জাতির অবমাননা করা হয়েছে। যে মাতৃরূপ, যে মাতৃমন্ত্র সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করে স্বাধীনতা-লাভের তূর্য্যধ্বনি ছিল, তার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

'ভবানী মন্দির'

'আনন্দ মঠ'-এর আদর্শে এবং বারীনের পরামর্শে অরবিন্দ লিখলেন 'ভবানী মন্দির'। ১৯০৪ সালে বরোদা থেকে বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল। মূল ইংরেজী ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায়। সহর থেকে দূরে, লোকের পদচিহ্নহীন স্থান, পরিবেশ শান্ত ও নির্জ্জন—সকল শক্তি পুঞ্জীভূত বলে মনে হবে—এমন এক স্থানে সর্ব্বশক্তিময়ী ভবানীর দেউল স্থাপিত হবে। রেওয়া রাজ্যের অমরকণ্টক ছিল বারীন্দ্রের মানসে নির্ব্বাচিত স্থান।

ভবানী, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, প্রেমময়ী রাধা,—সবই অনন্তের শক্তিরূপিণী। আমাদের কর্ম্মের প্রবৃত্তি সবই যোগ্য শক্তির অভাবে নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হচ্ছে। প্রারম্ভেই আমরা কায়িক, মানসিক, নৈতিক, এবং সর্ব্বোপরি আত্মিক বল অর্জ্জন করবো। শক্তিহীন হওয়ায় আমরা স্বপ্নরাজ্যের জীবে পরিণত হয়েছি। আমরা হস্ত-সংযুক্ত, কিন্তু আঘাত করার শক্তিহীন ; পদবিশিষ্ট, কিন্তু দ্রুত-চলচ্ছক্তিহীন।

জরাগ্রস্ত, চিন্তাকর্ম্মশক্তিহীন ভারতকে নবজন্ম গ্রহণ করতে হবে। 'ক্ষয়প্রাপ্ত, দুর্ব্বল, রক্তলেশহীন, তেজবীর্য্য-বিচ্যুত ভারত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে'—এ কথা অর্ব্বাচীনের উক্তি। কোটি কোটি অধিবাসীর সম্মিলিত শক্তি হ'ল 'নেশন'। আমাদের দেশমাতৃকা কেবল মৃত্তিকাস্তূপ, বাক্যের অলঙ্কার বা কল্পনার আলেখ্য নয়। যেমন শত-সহস্র দেবতার সম্মিলিত শক্তি এক দেহে পুঞ্জীভূত হয়ে মহিষমর্দ্দিনীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তেমনি আমাদের মা কোটি-কোটি সন্তানের সকল শক্তির মূর্ত্ত প্রতীক ; কিন্তু তাঁর সন্তানদের মানসিক তমসাচ্ছন্নতা, কর্ম্মবিমুখতা এবং অজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। অন্তরে ব্রহ্মের জাগৃতির সাহায্যে আমাদের মনের তমঃ বিদূরিত করতে হবে।

"জাতি হিসাবে আমরা বাঁচবো কি মরবো, সেটা নির্ভর করছে আমাদের ইচ্ছার উপর। ভারতের শত শত সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী তাঁদের শান্তিপূর্ণ নীরব সাধনার দ্বারা আমাদের জ্ঞান দান করছেন। ভগবান রামকৃষ্ণ আর তাঁর শার্দ্দূলচিত্ত ভক্ত বিবেকানন্দ আমাদের শিক্ষাদান করছেন যে—সিংহাসনারূঢ় নৃপতি হতে সাধারণ

শ্রমিক, সন্ধ্যাহ্নিক-নিরত সাধু থেকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ সকলের মধ্যে ভগবান অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আমরা প্রতিজনেই ভগবৎশক্তিসম্পন্ন ও সৃজনের অধিকারী। ভগবানের সর্ব্বতেজ আমাদের অন্তরে রয়েছে এবং আমরা তাঁর সৃষ্টির ক্রোড়ে বাস করছি। কেবল নূতনতর রূপদান নয়, রক্ষণ ও ধ্বংস সবই সৃষ্টির অঙ্গীভূত। কি আমরা সৃজন করবো সবই নির্ভর করছে আমাদের নিজের উপর, কারণ অসহায়ভাবে নিজেরা যদি মেনে না নিই তাহলে আমরা ভাগ্য অথবা মায়ার হাতের ক্রীড়নক মাত্র নয়, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তিমানের বিকাশের অংশ-বিশেষ।

সারা বিশ্বের দাবী—ভারতকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। তার কাছ থেকেই নানা দেশে ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান বিস্তারলাভ করে সকল মানবকে একাত্মতা দান করবে। এই বিরাট কাজের জন্য ভারতকে আত্মসচেতন হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণর আশীর্ব্বাদে স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বানে ভারতের মোহভঙ্গ হয়েছে। এখন দ্বিধা, ভয়, সঙ্কোচ ও আলস্যকে যদি সব আচ্ছন্ন করতে দেওয়া হয়, সে দোষ ভারতবাসীর। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম বিষয়ে প্রেরণা নানা ক্ষেত্র হতে এসেছে, কিন্তু শক্তির অভাবে জীবনে তার কোনটাই সুষ্ঠু প্রযুক্ত হয়নি।

ক্ষুদ্র জাপান কি-ভাবে জগতে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সে-বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মের ভিত্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ ভারতের বিভিন্ন কালের জাগরণ ধর্ম্মভিত্তিক, এবং তাই থেকে সে-জাগরণের উদ্ভব।

ভারতীয় দেউল, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান জাতির জীবনে একান্ত প্রয়োজন। একটি অপর হতে বিযুক্ত হলে পূর্ণ ফলপ্রসবে অশক্ত হয়। কর্ম্ম অধ্যায়ে নূতন এক ব্রহ্মচারী-দল গঠনের কথা বলা হয়েছে। স্তব, স্তুতি, শ্রদ্ধা বিফল হবে কর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত না হলে। মায়ের সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ ব্রহ্মচারী-দলের এক মঠ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। কেহ কেহ সম্পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও, কর্ম্মান্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মে ফিরে যেতে কোনও বাধা থাকবে না।

'ভবানী মন্দির' খুব বেশী প্রচারলাভ করেনি। 'আনন্দ মঠ' তখন বাঙ্গালী চিত্ত এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, 'ভবানী মন্দির' সংগ্রহ ও পাঠের আগ্রহ প্রচুর থাকলেও, মাত্র সঙ্কীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেই উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। "ভবি ভোলবার নয়", গভর্ণমেণ্ট বইটির প্রচার বন্ধ করেছিল।

'দেশের কথা'

অন্যান্য যে-সকল বই "নিষিদ্ধ" হয়েছিল, তার মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ১৯০৪ জুন ১৬-ই তারিখে

প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। খুনখারাপি, হাঁক-ডাক, উদ্দাম উত্তেজনার বাণী কিছুই ছিল না বইখানিতে। কি-ভাবে ইংরেজ তার শাসন-শোষণ-নীতি সাহায্যে ভারতকে নিঃস্ব করেছে, দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়েছে—অর্থ এবং সহায়সম্বলহীন হয়ে লোক মরণের পথে চলেছে—এটা ছিল পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদেশীর কূটবুদ্ধিতে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি-হেতু ইংরেজের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়ে, দেশ যাতে নিজ শক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে তারই কথা ছিল প্রচুর।

'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'তে (১৯০৬ এপ্রিল ২৪-এ) জনৈক পত্রপ্রেরক লেখেন যে, বইখানি পড়লে, ইংরেজদের স্বার্থপরতা, নীচতা ও কাপুরুষতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে, তার একটা ধারণা করা যায়।

Sri Aurobindo on Himself পুস্তকের (পৃঃ ৩০) মতেঃ "a book compiling all the details of India's economic servitude which had an enormous influence on the young men of Bengal and helped them to turn into revolutionaries" ; আবার বলছেন (পৃঃ ৪৬)—"It had an immense repercussion in Bengal and assisted more than anything else in the preparation of the *Swadeshi* movement."

'দেশের কথা' পর পর তিনটি সংস্করণ পার হয়ে, চতুর্থ সংস্করণে হঠাৎ ১৯১৩ সেপ্টেম্বর ২২-এ সরকারী "নিষিদ্ধ" পুস্তক-তালিকায় স্থানলাভ করে। তার পরই অক্টোবর ১-লা দেউস্কর-লিখিত 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' "একই গোত্রে" চড়ানো হয়। তাঁর 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' সরকারী মতে এই শ্রেণীভুক্ত হয়।

তাঁর 'শিবাজি চরিত' গ্রন্থ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা চলে, এই পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম "স্বরাজ" শব্দটি ব্যবহৃত হয় (*Sri Aurobindo on Himself*, p. 30) ; পরে দাদাভাই নওরোজী ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে ভাষণকালে 'স্বরাজ' শব্দের প্রয়োগ করেন এবং তখন থেকে জাতীয়তাবাদী-মাত্রেই একে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্থে ব্যবহার করে এসেছে।

'মুক্তি কোন্ পথে ?'

'মুক্তি কোন্ পথে ?'—স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও, এটি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক 'যুগান্তর'-এর বাছাই প্রবন্ধ-সমষ্টি ; ১৯০৭ জানুয়ারি (১৩১৩ মাঘ ১-লা) প্রকাশিত হয়। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য মনোবল সৃষ্টি করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিদেশী রাজা আমাদের আনুগত্য দাবী করতে পারে না। ধমনীতে এক বিন্দু আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত থাকলে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে নিষিক্ত করতে হবে। বিপ্লবের প্রচার-কার্য্যের

জন্য সঙ্গীত, সাহিত্য, যাত্রা, কথকতা ও গুপ্ত-সমিতির স্থাপন প্রয়োজন। অস্ত্র ও ধন-সংগ্রহ, যুদ্ধের প্রস্তুতি, অন্য মতবাদের বিরুদ্ধ আলোচনা, জাতির জাগরণের জন্য বিদেশীর হাতে নির্য্যাতনের প্রয়োজনীয়তার কথা লেখা হয়েছে। জীবন উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে বিদেশী সেনা-বিভাগ থেকে সৈন্য ভাঙ্গিয়ে নেওয়া খুব কষ্টকর ব্যাপার নয়। যুদ্ধের প্রেরণা, নিশ্চিত জয়ে বাঙ্গালীকে উন্মাদনাপূর্ণ করার নানা প্রবন্ধে বইখানি পূর্ণ ছিল। ১৯১০ আগষ্ট ৮-ই বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

'বর্ত্তমান রণনীতি'

'বর্ত্তমান রণনীতি' লেখেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত J. S. Bloch লিখিত *Modern Weapons and Modern Warfare* অবলম্বনে এটি রচিত এবং ১৯০৭ অক্টোবর ৭-ই প্রকাশিত। আধুনিক ছোটবড় মারণাস্ত্র, সেনা-বিভাগের নানা অংশের এবং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম, সৈন্যসজ্জার বিধি-ব্যবস্থা, কায়দাকানুন, আক্রমণ ও প্রতিরোধ-বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি, গরিলা-যুদ্ধের রীতিনীতি প্রভৃতি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ বইখানি নানা ছবির সাহায্যে সমৃদ্ধ ছিল। ১৯০৭ অক্টোবর ১৩-ই 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা করে। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"The book is a small manual which seeks to describe for the benefit of those .... who are entirely unacquainted with the subject, the nature and use of modern weapons, the meaning of military terms, the use and distribution of the various limbs of a modern army, the broad principles of guerilla warfare. These are freely illustrated by detailed references to the latest modern wars, the Boer and the Russo-Japanese, in the first of which many new developments were brought to light or tested and in the second corrected by the experience of a greater field of warfare under modern conditions. The book is a new departure in Bengali literature and one which shows the new trend of national mind ..."

১৯১০ এপ্রিল ৩০-এ বইখানি সরকারী আইনে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

'বন্দে মাতরম্'-এর শেষ মন্তব্য একটুও অত্যুক্তি নয়। "সন্তান"দের মন তখন সত্যই সংগ্রামের দিকে টেনেছে এবং এতৎসংক্রান্ত পুস্তক-পত্রিকাদি সংগ্রহ শুরু হয়েছে। খানাতল্লাসী-সূত্রে তখন নানা বই পুলিশের হস্তগত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া হচ্ছে ঃ

Sanford : *Nitro-explosives* ; Alfred Hutton : *Swordsman* ; Eissler : *Handbook of Modern Explosives* ; *Field Exercises Manuals of Military Engineering, Infantry Training, Cavalry Training, Machine-gun Training, Quick Training for War*—প্রভৃতি। (*Sedition Committee Report*, p. 102)

এই শ্রেণীব নানা বই সে-সময় (ও পরে) বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর অনেকগুলির নিষিদ্ধকরণের তারিখও পাওয়া যায়, কিন্তু অনেকের সম্বন্ধে সে-আদেশের পরিচয় আজও সংগ্রহ করা যায়নি। কেবল নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া সে-যুগের বহু কর্ম্মীর সঙ্গে আলোচনা-সূত্রে নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, প্রায় সবগুলির প্রচার তো বন্ধ হয়েছিলই, তবে সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করার হুকুম ছিল, না, অত্যুৎসাহী পুলিশ তাদের দক্ষতা প্রচার করেছিল সে-বিষয়ে বর্ত্তমানে কিছু বলা যাচ্ছে না।

নানা ছোটখাটো বই বিলুপ্ত হয়েছে ; তন্মধ্যে মাত্র কয়েকখানি, যাদের কথা লোকের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে—তারা হচ্ছে 'উদ্বোধন', 'নব উদ্দীপন', 'উচ্ছ্বাস', 'শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ', 'পল্লী বিলাপ' প্রভৃতি।

বঙ্গ-বিভাগের পর বাঙ্গলাদেশে নানা পুস্তক-পুস্তিকা বেরিয়েছে। তন্মধ্যে পুলিশের নজর পড়ে—চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ প্রণীত ৪৬-টি সংস্কৃত শ্লোক : 'বঙ্গাঙ্গচ্ছেদ সন্তাপ', কেদারনাথ দেবশর্ম্মা প্রণীত 'বঙ্গের পুনর্জন্ম', ললিতমোহন সরকার রচিত 'ছাত্র-দমন কাব্য' (প্রথম খণ্ড), ডাঃ ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি ?', কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য রচিত 'স্বদেশ গাথা', অনন্তকুমার সেনগুপ্তর 'স্বরাজ গীতা', ভুবনমোহন দাশগুপ্তর 'আমরা কোথায় ?'—প্রভৃতি গ্রন্থগুলির উপর।

এসকল ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ, এবং শীঘ্রই এরা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

বইগুলি সম্বন্ধে আলোচনাকালে যেগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞার তারিখ সঠিক জানা যাচ্ছে, সেগুলি পরে উল্লেখ করা যাচ্ছে ; আদেশের তারিখগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল। তৎপূর্ব্বে অতি প্রয়োজনীয়, পুলিশের "অবাঞ্ছিত" পুস্তক কয়েকখানির বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত' প্রথমেই স্থান গ্রহণ করতে পারে। সে যুগে শুনেছি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে বইখানি রচিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল। চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজা নন্দকুমার', 'ঝান্সীর রাণী', 'অযোধ্যার বেগম' ; সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'জালিয়াৎ ক্লাইভ', 'ছত্রপতি শিবাজী' ও 'প্রতাপাদিত্য' ; দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'স্বাধীনতার ইতিহাস'; রজনীকান্ত গুপ্তর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ; মুকুন্দলাল চৌধুরীর 'মণিপুরের ইতিহাস' ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ফিরিঙ্গি বণিক' ও 'জগৎশেঠ'—পুস্তকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বহু নাটকের প্রচার বন্ধ করা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা পরে বলা হচ্ছে। আপাততঃ উল্লেখযোগ্য—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ঃ 'রাণাপ্রতাপ', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস'; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ঃ 'দাদা ও দিদি'; মনোমোহন গোস্বামী ঃ 'সমাজ', 'সংসার', 'বীর-পূজা', 'পৃথ্বীরাজ'; হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গবিক্রম'; হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঃ 'পদ্মিনী'।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯১১ আগষ্ট ৭); হারাধন রায় প্রণীত নাটক 'মীরা উদ্ধার' ও 'সুরথ উদ্ধার' (৭-৮-১১); মনোমোহন গোস্বামী ঃ 'কর্ম্মফল' (৭-৮-১১); কুঞ্জবিহারী ঘোষাল ঃ 'মাতৃপূজা' (৭-৮-১১); ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ঃ 'নন্দকুমার' ও 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (৭-৮-১১); হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঃ 'দুর্গাসুর' ও 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ' (৭-৮-১১); অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ঃ 'সুরথ উদ্ধার' (৭-৮-১১); অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ 'আশা কুহকিনী' (২৬-৪-১০); সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু ঃ 'হলো কি ?' (২১-৬-১০); পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (১৭. ৫. ১৯১০) বাজেয়াপ্ত করা হয়।

অপরাপর বহু পুস্তক-পুস্তিকা এই শাসনে নিভৃত কোণে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়; তারপর লোপ পায়।

কয়েকখানি বই সম্বন্ধে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন মনে করি। যথা—

মণীন্দ্রনাথ বসুর 'সোফিয়া বেগম' (উপন্যাস) এপ্রিল ২৩-এ আপত্তিকর পুস্তকের তালিকায় স্থানলাভ করে। 'কুমার সিং' [সংক্ষিপ্ত জীবনী] (১৬-৫-১০); 'বন্দনা', ১ম খণ্ড—পূর্ণচন্দ্র দাস (৮-৮-১০); 'বন্দনা', ২য় খণ্ড—হরিচরণ মান্না (৮-৮-১০); 'রাখী কঙ্কণ' (রাজভক্ত আত্মীয় ও বিশ্বাসঘাতকদের হাতে দেশপ্রেমিকের নির্য্যাতন-কাহিনী)—গঙ্গাচরণ নাগ (৫-৯-১০); বাঙ্গলায় লিখিত 'মারো ফিরিঙ্গিকো' (২২-১০-১০); 'স্বদেশ গাথা' (কবিতা)—কামিনী ভট্টাচার্য্য, চট্টগ্রাম (৭-৩-১১); 'অমর কাহিনী' (কবিতা)—ভুবনমোহন দাশগুপ্ত (৭-৩-১১); 'স্বদেশ প্রসঙ্গ' (খণ্ড পত্রিকা)—কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ঢাকা (৭-৩-১১); 'প্রসূন'—দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (৭-৩-১১), প্রভৃতি।

ধারাবাহিক পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে 'যুগান্তর', 'স্বাধীন ভারত', 'ওঁ বন্দে মাতরম্', 'মুক্তি মন্ত্র' (পণ্ডিচেরী), 'সোনার বাংলা' প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ইংরেজী পুস্তিকা, পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতির প্রচার, আমদানী ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল প্রচুর। এ স্থানে সে-সকলের উল্লেখ করা অযৌক্তিক বলে মনে হ'ল। এ বিষয়ে বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধানের বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে।

দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ' বহু পূর্ব্বে (১৮৬০ সালে) প্রকাশিত হলেও, এ-সময় এর প্রচার নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

এই "নিষিদ্ধ" পুস্তক-পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার, প্রকাশক, বিক্রেতা, প্রেসের মালিকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে তা নয়, কেবলমাত্র সরকারী গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে, তারপর পুলিশ দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত করেছে, মালিককে ধরে টানাটানি করেছে। আর যাদের ওপর রাজনৈতিক কারণে সরকার সন্দেহ পোষণ করতো বা কোনও ঘটনা সম্পর্কে খানাতল্লাসী করতে যেত, সেখানে এসকল সাহিত্য সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির "চরিত্র" সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাঢ়তর করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। কোনও একটা ছেলে পাড়ায় "স্বদেশী করে", সুতরাং হয়তো গুপ্তচরের পরামর্শে পুলিশ তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো। "খাতা"য় নামও উঠে গেল। তারপর একটা অজুহাতে পুলিশ তার বাড়ী তল্লাসী করলে। অন্য কিছু অর্থাৎ বোমা, বন্দুক, রিভলভার, তরোয়াল, রামদাও, ছোরা, গুপ্তি, সড়কী, এমনকি একগাছা লাঠি না পেলেও, যদি গীতা, 'আনন্দ মঠ', স্বামীজীর 'ভাববার কথা', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি কিছু পেয়ে থাকে, তাহলে অন্ততঃপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে, হয়তো দু'চারটা গোঁত্তা, রদ্দা, ঘুষি, চড় দিয়ে এবং কুটুম্ব-সম্পর্কিত মিষ্টবচন আউড়ে থানার গারদে আটক করে রেখেছে ; "সদর" থেকে "টিকটিকি" পুলিশ এসে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান এবং প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তারপর হয়তো-বা ছেড়ে দিয়েছে, আর নয়তো বিনা বিচারে বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে।

পুস্তকের প্রকাশের ওপর বাধা-নিষেধ অর্পণ করে পুলিশ সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। ১৯০৮ ডিসেম্বর ৯-ই 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় খবর হ'ল যে, পুলিশ গ্রামাফোন-রেকর্ড-বিক্রেতার ওপর হুকুম জারি করেছে, যে তারা 'বন্দে মাতরম্', 'আমার দেশ' প্রভৃতি সঙ্গীত ও 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটকের উত্তেজনামূলক অংশের আবৃত্তি-সম্বলিত রেকর্ড-বিক্রয় বন্ধ করবে। তা না হ'লে··· ।

এরই স্বল্পকাল বাদে নাট্যশালার ওপর হামলা হয়েছিল। ১৯১০ জুন ১০-ই সরকারী আদেশে পুলিশ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী', ষ্টারে 'নন্দকুমার', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ও 'কর্ম্মফল', ন্যাশনালে 'বঙ্গ বিক্রম', কোহিনূরে 'দাদা ও দিদি' নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয়। সখের দলে যখন 'সমাজ' অভিনয় চলছে তখন পুলিশ এসে তাকে বন্ধ করে দিয়েছে, এ বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। আর, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় বন্ধ হয়েছে, তার কথা আর উল্লেখ না করলেই চলে।

কাপড়ের পাড়ের ওপরও পুলিশ লক্ষ্য রেখেছিল। ধুতির পাড়ে ছিল "বিদায়

দে মা ঘুরে আসি" আর ১৯১০ মার্চ ১২-ই সে ধুতি পরা নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সমস্ত ধুতি বাজেয়াপ্ত এবং তাঁতে বোনা বন্ধের আদেশ জারি হয়।

বিদেশ থেকে সমস্তরকম কাগজপত্র আসার ওপর নিষেধ এক-কথায় চলতো বৈদেশিক বাণিজ্যের শুল্ক-বিভাগ আইন (Sea Customs Act) অনুসারে। নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার নাম দিতে গেলে, কলেবর আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং নিরস্ত রইলাম।

গান ও কবিতা

গদ্য-সাহিত্যের পরিচয় কিছুটা দেওয়া হয়েছে। এই অংশে সমসাময়িক কবিতার কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। সংগ্রামী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে কাব্য, কবিতা, গানের মধ্য দিয়ে গদ্য-রচনার অনেক আগে থেকে। প্রকৃতপক্ষে 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার লেখায় প্রকাশ্য হিংসাত্মক প্রচার কার্য্যে প্রকট হয়েছিল, কিন্তু কাব্যে যখন প্রকাশ পেয়েছে তখনও সিপাহী-যুদ্ধের অগ্নি নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয়নি।

বলা বাহুল্য, সে-যুগে ইংরেজকে 'শত্রু' আখ্যায় অভিহিত করায় বিপদ ছিল। তার কারণ, ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের তখন শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সে নিজ শক্তির কেবল যে স্বাদ পেয়েছে তা নয়, তাকে পাকা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অতি সতর্ক দৃষ্টি মেলে রেখেছে।

কবিতা-কাব্যে সর্ব্বপ্রথমে দেশপ্রেম বিতরণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (জন্ম ইং ১৮১২)। এ বিষয়ে রামমোহনের পরই কবিবরের নাম উল্লেখ করতে হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে-ধারা প্রবর্ত্তন করেন সে-দিনে সেটা এক আকস্মিক ব্যাপার বলা চলে। কিন্তু এ ঘটনার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল—ইংরেজী ভাষায় সেটাকে বলে "historical necessity"। ১৮৩১ জানুয়ারী ২৮-এ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার জন্ম। এ পত্রিকা দেশ-প্রেমের যে-ধারা সৃষ্টি করেছিল তাতে অবগাহন করে সমকালীন বহু বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী তো বটেই, সাধারণ পাঠকও ধন্য হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহু বাক্য প্রবাদ-বচনে পরিণত হয়েছে এবং আজও স্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে তার দু-এক ছত্র উল্লেখ না করলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়। তাঁর

"মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

* * *

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

—তুলনাহীন দেশপ্রেমের কবিতা।

তাঁর 'স্বদেশ', 'মাতৃভাষা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এ-যাত্রার পথিকৃৎ। এ সুরে আরও অনেক কাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে পাঞ্জা ধরবার মত উপযোগী মন তৈরী করবার কবি খুব বেশী ছিলেন না।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, এ যাত্রায় যিনি প্রথম, তিনিই আবার প্রধানও বটে। যেমন বীরভাব, তেমনি প্রকাশভঙ্গী, সবই বর্ণনাতীত সুন্দর। তিনি গুপ্তকবির প্রধান শিষ্য-অনুগামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক'জনের অন্যতম। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক রাজপুত-কাহিনী ('পদ্মিনী উপাখ্যান') বলতে গিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করলেন (১৮৫৮ সাল), সেটা স্বাধীনতাকামী জাতির পক্ষে পরম গৌরবের বস্তু।

"স্বাধীনতা হীনতা" অবস্থার তুলনায় মৃত্যু যে অধিক বাঞ্ছনীয়, সে বেদনাবোধ তিনি জনমানসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছেন, এ অবস্থা নরকবাসের তুল্য, আর "দিনেকের স্বাধীনতা"ই স্বর্গসুখের আস্বাদ ও আনন্দ দান করতে পারে। সুতরাং পরাধীনতার যন্ত্রণা দূর করবার প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। এর উপায় নির্দ্দেশ করতে গিয়ে রঙ্গলাল যে বাণী উচ্চারণ করলেন, সেটা বাঙ্গলায় যাকে "অগ্নিযুগ" বলা হয় সে-সময়ে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, তার পূর্ব্বে নয়। পথ কি ?

"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।

* * *

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই।"

এই যে উচ্চগ্রাম সুর তিনি বেঁধে দিলেন, তার পর যা এসেছে সে-সকল এর তুলনায় মৃদু ঝঙ্কার মাত্র। মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি দেশের অতীত সম্পদ ও গৌরব এবং বর্ত্তমান (তাৎকালিক) দুরবস্থার কথা চিত্তাকর্ষক কবিতায় বলেছেন। 'মেঘনাদ বধ' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত ; বিদেশীর, স্বয়ং রামচন্দ্র হলেও, আক্রমণ হতে দেশরক্ষা—স্বাধীনতা-রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টার কাহিনী। মধুসূদনের অন্তরের কথা বুঝতে অবশ্য কোনও কষ্ট হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৮ সালে 'হিন্দু মেলা'র দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য যে অমর কবিতা রচনা করেছেন—"মিলে সব ভারত সন্তান", তাতে অতীতে যে-সকল রূপবতী সাধ্বী সতী মহীয়সী ললনাবৃন্দ, মহামুনি, ভারতভূষণ কবিকুলগণ, অমিতবিক্রম বীরগণ ছিলেন, তাঁদের লীলাক্ষেত্র ভারতের জয়গান করতে বলা হয়েছে।

ঐক্যেতে দেহ ও মনে বল পাওয়া যাবে এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল হবে, এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, "বন্দে মাতরম্" প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে। এই গানই ভারতের (বাঙ্গলার) জাতীয় সঙ্গীতরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

শান্তরসের গীত অজস্র বাঙ্গালী-মন স্পর্শ করেছিল, দেশপ্রেমের ফল্গু বয়েছিল প্রতি শ্রোতার অন্তরে—এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু দেশের অন্তরাত্মা হয়তো চাইছিল—বীর, এমন-কি রুদ্র রস, এবং মাত্র দুই বৎসর পরেই ১৮৭০ সালে বাঙ্গালীর সে-বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশ করলেন, স্বাধীনতা-লাভ পর্য্যন্ত সেই উদ্দীপনা জাতির অগ্রগতির সঙ্গে সমানে তাল রক্ষা করে চলেছে।

একেবারে নূতন সুর; প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ। উপায় নেই; মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মাদনার আবরণ গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন—"হেমচন্দ্র-রচিত 'ভারত সঙ্গীত' অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।"

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট'-এ এটি ছাপা হবার পর তাঁর ওপর গভর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টি পড়ে। প্রকাশকাল—১৮৭০, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী গ্রন্থে। পরবৎসর দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জ্জিত হলেও, তৃতীয় সংস্করণে পুনর্মুদিত হয়। প্রচলিত গল্প-মতে হেমচন্দ্র প্রথমে স্বয়ং মুহ্যমান দেশবাসীকে সম্বোধন করেছিলেন এবং নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। পরে সেই দুর্দ্দান্ত আহ্বানকে একটু মোলায়েম করলে গভর্ণমেণ্ট তুষ্ট হতে পারে বলে, দেশপ্রেমিক যুবা মাধবাচার্য্যের মুখে সে-ভাষা তুলে দিয়েছিলেন। কেবল শোনা কথা; কোথাও মুদ্রিত পত্রিকা-পুস্তকে আমি সমর্থন পাইনি। তৃতীয় সংস্করণে সম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এবং আজও তাই চলে আসছে।

এ বিতণ্ডার প্রশ্ন বাদ দিয়েই বলা যায়, হেমচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান সুপ্ত অলস বাঙ্গালী-মনকে উচ্চকিত করে তোলে। আয়তলোচন, উন্নতললাট, সুগৌরাঙ্গ তনু—সন্ন্যাসীর ঠাট, জনৈক যুবা নামাবলী গায়ে, নয়ন-জ্যোতিতে বিজলী হানিয়া (পর্ব্বত-) শিখরে দাঁড়ায়ে, মুখে শিঙ্গা তুলি যে আরাব সৃষ্টি করেছিলেন—সেটা পরাধীন জাতির সমর-প্রস্তুতির আহ্বান ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

স্থানাভাবের আশঙ্কায় সম্পূর্ণ কবিতা এখানে প্রকাশ করা গেল না,—বোধ হয়, প্রয়োজনও নেই। বাঙ্গলা-ভাষায় যাঁদের জ্ঞান, দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বলিষ্ঠ দিনের ইতিহাস জানবার আগ্রহ আছে, তাঁরা অবশ্যম্ভাবিরূপে এ-কবিতার সঙ্গে পরিচিত। "হীনবীর্য্য" জাতিকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন, এসকল ভারতবাসীকে "কুলাঙ্গার" অভিধায় আখ্যাত করেছেন। কালবিলম্ব না করে, জাতিভেদ ভুলে দৃঢ়-পণ-গ্রহণে মহীমণ্ডলে আপন মহিমা-ধ্বজা তুলে ধরবার আদেশ দিয়েছেন।

পথনির্দ্দেশে হেঁয়ালি ছিল না। একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা। প্রাচীন যে-সকল পন্থা

"জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা"

এখন বিফল। পুরাকালে অমরগণ আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে সংগ্রাম করতেন। কিন্তু সে যুগ তো চিরতরে অপগত ; তা ছাড়া

"এ সব দৈত্য নহে তেমন"

—সুতরাং যুদ্ধের প্রণালী ("ট্যাক্‌টিক্‌স্‌") পরিবর্ত্তন করতেই হবে। উপায় ?

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

তবেই প্রতিদ্বন্দ্বী-সহ সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ হওয়া সম্ভব। খোলা তরবার সাহায্যে পূর্ব্বের সকল দুর্ব্বলতা ছিন্নভিন্ন করতে হবে ঃ

"অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্মদ"

—তবেই বিপদের অবসান হবে, আর "যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও" তাকে "স্বাধীনতারূপ রতন" দ্বারা মণ্ডিত করতে পারা যাবে। (এখানে 'বর্ত্তমান রণনীতি' গ্রন্থের কথা স্মরণে আসে।)

১৮৭০ সালের পক্ষে এ উদ্দীপনা এক নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫ সাল থেকে এই ভাব ও রণনীতির সম্যক্‌ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া গেছে।

তখন দেশ কিছুটা সচকিত হয়ে উঠেছে। তাই 'ভারত সঙ্গীত'-এর অনুপূরক কবিতা ফুটে উঠেছিল ১৮৭৪-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু বিক্রম' নাটকে। তাকে তিনি তালে মানে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' পর্য্যায়ে উঠিয়েছিলেন। কবিত্বশক্তির ও বাচনভঙ্গীর পার্থক্য দৃষ্ট হলেও ভাবধারায় দুটিকে এক স্তরে স্থান দিতেই হয়।

'পুরু বিক্রম'-এ পাওয়া যাচ্ছে ঃ

"ওঠো ! জাগো বীরগণ ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,—
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥"

পরেই পাওয়া যাচ্ছে মরণের ডাক—

"স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে
শত ধিক্ তারে।
পচুক সে চিরকাল
দাসত্ব আঁধারে॥

স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সে প্রাণ লয়ে'
যে ধরে এমন প্রাণ
ধিক্ বলি তারে।
যায় যাক্ প্রাণ যাক্ স্বাধীনতা বেঁচে থাক্
বেঁচে থাক্ চিরকাল
দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর খোল সবে তরবার
ঐ শোন ঐ শোন
যবনের রব॥"

কালক্রমে এ সুর একটু খাদে নেমে পড়েছিল। বহু কবি অজস্র গান রচনা করে গেছেন, তা'তে পাওয়া গেল—সর্ব্বসম্পদের আকর, সকল সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি মায়ের মহিমময়ী মূর্ত্তি, অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির পাশেই মায়ের বেদনা-ভরা সজল আঁখি, অপহৃত সম্পত্তিতে আক্ষেপ, বৈদেশিক শক্তির অত্যাচার, ভবিষ্যতের পথে ঐক্য-বদ্ধ হয়ে নির্ভয় পদক্ষেপে চলবার প্রেরণা। কোথাও-বা কোনও কবি স্পষ্ট প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নারী-জাগরণ ভবিষ্যৎ আন্দোলনের যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে-কথাও বারে বারে বলা হয়েছে। এখানে আমরা পেলাম—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, গোবিন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, সরলা দেবী, প্রমথনাথ দত্ত, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল প্রভৃতি বহু কবিকে। এ তালিকা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় বলে, সে-চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বহু কবি বাঁশী ছেড়ে (মসীর) অসি ধারণ করেছেন। কেহ কেহ বাঙ্গলায় যে আহ্বান জানিয়েছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন, উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন, অজানার বিপদসঙ্কুল পথে ছুটে যাবার যে ডাক দিয়েছেন, তা'তে আত্মীয়-স্বজন, গৃহ ছেড়ে দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে পড়েছে। কবিরা শক্তির আবাহন জানিয়েছেন, মারবার ও মরবার পূজার বোধন করেছেন, আর ঘর-ছাড়ার দল

ধীরে ধীরে নির্য্যাতনের দিকে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছে, পিছনদিকে তাকায়নি, মায়ের কাতর আহ্বানে কান দেয়নি,—সরাসরি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছে। আর, অবিনাশী জীবনের গান গেয়ে গেছে।

এ যুগে এলেন—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রনাথ বাগচি, কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবব্রত বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মুকুন্দচন্দ্র দাস, কামিনী রায়, কুসুমকুমারী দাস, স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রভৃতি অনেকে।

এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রধানতঃ ফুটে উঠেছিল প্রবল শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের আঙ্গিক হিসাবে শক্তির আবাহন। সাহস সঞ্চয় করে সংগ্রাম ও মরণের প্রস্তুতি, বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করে প্রতিকারের জন্য উদ্দীপনা ও উপায় নির্দ্দেশ, নির্য্যাতনের মধ্য দিযে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হযে শত্রু-নিধনের নির্দ্দেশ। সর্ব্বোপরি ছিল দেশমাতৃকার সেবায় আত্মবিসর্জ্জনের ডাক।

হেমচন্দ্র আহ্বান জানিয়ে গেলেন। "যুগধর্ম্ম" অপেক্ষা করে বসেছিলেন ; তাঁর নেপথ্য ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন 'অলস শয়নে সুখ মুখ চেয়ে', দারাসুত পরিজন নিয়ে আনন্দে উপেক্ষায় কাল কাটাবার দিন অপনীত হয়েছে। তখন বাঙ্গলার দিকে দিকে

"··· শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥"

—অর্থাৎ শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (পটহ, ভেরী), গোমুখ (রণশিঙ্গা) প্রভৃতি সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠলো। আর, সঙ্গে সঙ্গে হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য', ধনঞ্জয় 'দেবদত্ত', বৃকোদর 'পৌণ্ড্র', যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়', নকুল ও সহদেব 'সুঘোষ' আর 'মণিপুষ্পক' এবং অন্যান্য সব মহারথিবৃন্দ নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়ে দিলেন। বিরাট সোরগোল পড়ে গেল।

বাঙ্গলার সমরাভিযান-বাণী ফুটেছিল নানা জনের নানা কবিতায়। যদি শঙ্খধ্বনি ও 'ব্যাণ্ড'-বাদ্য উন্মাদনা সৃষ্টি করে, মাদকতার প্রভাবে যোদ্ধাকে মরণ-আলিঙ্গনে উদ্‌বুদ্ধ করে, বাঙ্গলার কবিরা সে-কাজ করেছিলেন অপূর্ব্ব ছন্দে। এ প্রসঙ্গে সরলা দেবীর 'বীরাষ্টমীর গান' খুব প্রথম দিকের রচনা বলে মনে করা যেতে পারে ('ভারতী', কার্ত্তিক, ১৩১১ঃ Nov., 1904)। কবিতার প্রথমাংশে ভারতের সৌন্দর্য্য, সম্পদ, অতীত গৌরব বর্ণনা করে কবি বলছেন অপূর্ব ছন্দে ঃ

"স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে
অতি মহাপাপী হ'ক না কেন,
তবুও সে জন অতি মহাজন,
সার্থক জনম তাহার জেনো।

দেশহিতব্রত এ পরশমণি,
পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার
ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে,
নিজপ্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে,
অপঘাত ভয় আশু তার যায়
মরণে গোলোক যায় সেই জন।"

এই সময় এসে গেছেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি ১৯০৫ সেপ্টেম্বর ২০-এ 'হিতবাদী' পত্রিকায় চণ্ডীর আবাহন জানিয়েছিলেন, দৈত্য-উপদ্রব হতে বাঙ্গলাকে উদ্ধার করবার জন্য। লিখেছিলেন—

"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডী যুগান্তরে,
* * *
এ যুগে আবার মাগো, দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এস নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্ত্তি ধরে।
এস মা ত্রিতাপহরা! স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা,
শুম্ভনিশুম্ভের দম্ভে সর্ব্বনেত্রে অশ্রু ঝরে।
দশদিকে হর-প্রিয়া! দশভুজ প্রসারিয়া,—
ভূভার হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে।"

কামিনীকুমার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলেন,—

"এস সুদর্শনধারী মুরারি!
অবনত ভারত চাহে তোমারে।
* * *
এস অরি শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নববেশে ভীষণ অসি ধরি॥"

বাঙ্গলা সাহিত্যে কবি বলে বিপিনচন্দ্র পালের তত খ্যাতি নেই। কিন্তু তাঁর আবাহন-মন্ত্র আজও আমাদের সামনে তাঁকে জীবন্ত করে রেখেছে। কাতর নিবেদন তাঁর—

"দানবদলনী ত্রিদিবনাশিনী,
করালকৃপাণী তুমি মা!
* * *
**নয়নে অশনি জাগাও জননী!
নহিলে এ ভয় যাবেনা॥**

উর মা বাহুতে শক্তিরূপিণী
উর মা বাহুতে ও রণরঙ্গিণী,
রিপুকুল মাঝে সন্তান লয়ে
দাঁড়া মা হৃদয়-রমা ;
প্রলয় হুঙ্কারে হর-হৃদি হতে,
উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে
শোণিত তরঙ্গে মাতি রণরঙ্গে
মাভৈঃ বাণী শোনা মা !'

সংগ্রামের নানা ক্ষেত্র অবলম্বন করে যে কবিতা-স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, এখানে তার আংশিক পরিচয়ও দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্ঘর্ষ আসন্ন, মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, "বেঁচে থাকা মিছে" বলে সজীবতার লক্ষণ প্রকাশের জন্য দেশ যেন প্রলয়ের আহ্বানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। নিজেরে অক্ষম দুর্ব্বল ভেবে কেবল মায়ের যাতনাই বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার মাতৃকণ্ঠে পরাধীনতার শৃঙ্খল বাজছে তার পক্ষে নিজেকে দুর্ব্বল বা সবল বলে ভাববার সময় নেই। "যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে তোমার কাজে 'বন্দে মাতরম্' বলে।"

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ডাক দিচ্ছেন—

"কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত,
মৃত্যু নির্য্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত,
খণ্ড খণ্ড হয়ে মার মুখ চেয়ে
এস কে সহিতে পারিবে।"

প্রায়-অজানা কবি গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুরে সুর মিলিয়ে দিলেন—

"প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

বিজয়চন্দ্র অনবদ্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ডাক দিলেন—

"এ জগতে যদি বাঁচিবি,
ওরে অক্ষম ওরে দুর্ব্বল,
বীর বিক্রম কর সম্বল,
যদি জীবন ধারণে বাসনা !"

যে-সকল মায়া-মোহ জড়িয়ে থাকায় মানুষ কর্ম্মশক্তিহীন পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাকে বিদূরিত করে অগ্রসর হবার মন্ত্র দিচ্ছেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ :

"প্রাণ দিয়ে তোর জ্বেলে আগুন
জ্বালা সকল ঘরে,
স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, মৃত্যু-ভীতি
ছাই হয়ে যাক্ পুড়ে।"

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন, তোড়জোড় করতে পাঁয়তারা কষতে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে,—'বিলম্বেনালং' :

"মাতৃপূজার বসারে বোধন !

* * *

হাসি-মুখে তোরা অকাতরে কর
লক্ষটি শির দান ॥

থাকুক শিয়রে লক্ষ কৃপাণ
লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত।
মরণের ভয়ে শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃক্‌পাত।"

কেবল মরণের ভয় ত্যাগ করলেই চলবে না। জীবন বিসর্জ্জন দেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যতীন্দ্রনাথ বাগচি ডাকছেন :

"ওরে ক্ষ্যাপা ! যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিয়ে দে না !

* * *

মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দে রে মায়ের তরে।
অমর জীবন পাবিরে ভাই।
জগৎ-মায়ের বরে ॥"

কবি বিজয়চন্দ্র জাতিকে দীক্ষাদান করেছেন এবং তার যোগ্য দীক্ষা হয়েছে কিনা তার জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে বলেছেন :

"হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নিমন্ত্রে কি না !
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়,
দলিতেছে অরি চরণ-তলায়।
পোড়াতে অরিকে, পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না !

দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব
পারিবি কি না ॥

* * *

ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ,
মহা অরণ্যে করি বিচরণ।
কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধরিবি কি না ?
ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ,
পালিবি কি না ?
সৃজি হলাহল শোণিত তরল
ঢালিবি কি না ॥"

মাতৃজাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য বহু কবিতা রচিত হয়েছিল। মুকুন্দদাস বলেছিলেন—

"শক্তিরূপিণী যাঁরা
এ দুর্দ্দিনে কেন তাঁরা
ভোগবিলাসে মজে মৃতপ্রায় পড়ে রবে।"

একটা প্রশ্ন, একটা দাবী। অন্য কবিরা ভারত-ললনাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন। হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থা দিচ্ছেন—

"আজি মা গো খুলে রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা।
ভয়ঙ্করী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী,
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা।
করে লহ ক্ষিপ্র অসি ফেলে হেম বাঁশি,
দৈত্য বধি' রক্তপান কর গো মা আসি।"

দৌলতপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় (১৯০৭ সাল) নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তখন কামিনীকুমার লিখেছিলেন ঃ

"আপনার মান রাখিতে জননি !
আপনি কৃপাণ ধর গো।

* * *

এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল,
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল।

নয়নের কোণে লুকায়ে গরল
মরণে বরণ করিয়া লও গো !

* * *

শুনিয়া তোমার ভৈরব হুঙ্কার
নিখিল চমকি উঠুক্ আবার—"

মাতৃজাতি সত্য-সত্যই এ ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন "স্বদেশী" আন্দোলনে তো বটেই, সশস্ত্র বিপ্লবে তাঁদের অনেককেই পাওয়া গিয়েছিল।

এ স্রোতে বিরাম যতি ছিল না, যতদিন না বিদেশী-শক্তি আইন-সাহায্যে তাকে কেবল রুদ্ধ নয়, লোপ করে দিয়েছিল। এক একটি গান প্রকাশিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহ-দোষযুক্ত বলে পরিগণিত হয়েছে, প্রচার বন্ধ এবং গানের অনুলিপি কাছে রাখা দণ্ডনীয় করে দিয়েছে।

সরলা দেবী সমানে তাল রেখে চলেছেন সাহিত্যক্ষেত্রেও। 'ভারতী' (১৩১৩ ফাল্গুন) কবিতা ছাপায় 'আবির্ভাব',—মা এসেছেন "দৈত্যদলনী বেশে", তাঁর "দক্ষিণ করে খর করবাল, বিশ্ব কাঁপিছে ত্রাসে"। আর বাম করে "ছিন্ন অসুরের শির", তাই থেকে "ঝর ঝর ঝরিছে রুধির"। তাঁর আগমনের হেতু—সন্তানদের রক্ষা করা। চারিদিকে "ভীম হুঙ্কার" শোনা যাচ্ছে। নয়ন-বহ্নি যেখানে পড়ছে, পলকে সব ভস্মে পরিণত হচ্ছে ; "তাণ্ডব তালে দুলিছে মেদিনী" ; পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পথ নিয়েছে। এই কি আমাদের সেই রূপলাবণ্যময়ী, অভয়দায়িনী মা ? আজ তিনি ভিন্ন রূপে এসেছেন "প্রিয় সন্তান-বাসনা করিতে পূর্ণ"। দেশ আগুন নিয়ে মেতেছে, তিনি "ঘোর-ঘন-মসিবরণা বিকট-বৃহৎ-দশনা" রূপে এসেছেন। কবি বলে দিচ্ছেন "সোণার প্রতিমা কেন এই রূপে, সে যে তোরই তরে তা কি জাননা ?" অতএব

"আয়রে আয়রে ছুটে আয় আয়
এ-যে মাতা—নহে অন্য
রক্তচরণে লুটায়ে সবাই
হওরে হওরে ধন্য।
রক্তের টীকা লও লও ভালে
মায়ের আশিস্ নে রে মাথে তুলে
মা'র বলে আজ বলীয়ান্ হয়ে
বিপদ করো না গণ্য।
জননী এসেছে মোদের মাঝারে
সুত-কল্যাণ-জন্য।"

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বহু কবিতারই তুলনা পাওয়া কঠিন। তাঁর কবিতা মৃতদেহকে সঞ্জীবিত, রণোন্মত্ত করে তোলার শক্তিধারণ করে। একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে,—আবৃত্তি করলে শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত নেচে ওঠে :

"আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?
পিষিতে অস্থি শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র,
প্রেত ভয়ে ছি ! ছি ! ডরিবি কে !
মড়ার মতন না লভি মরণ,
সাধকের মত মরিবি কে ?
আয়, আজি আয় মরিবি কে ?
অসুর নিধনে কিসের তরাস্
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ,
বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে ?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর,
হাসি-মুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন জলধি মগ্ন,
তবু তরী বাহি মরিবি কে !
* * *
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে
অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে ?"

এসকল আহ্বানের পর যুবশক্তি যে মরণ-তাণ্ডবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা'তে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

ইতিহাসের শিক্ষা

দেশের মধ্যে জাতীয়তা-ভাবের জাগরণকে অধিক ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করে পৃথিবীর নানা অংশের আন্তর্জাতিক ঘটনা। সকলেই যে অত্যাচারী শক্তিমানের পরাজয় বা সম্মানহানির সংবাদ রাখতো তা নয়, কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি, দেশের চিন্তাধারার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতেন, এসকল ঘটনা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতো না।

জাতির চেতনায় দেশপ্রেম নিবদ্ধ করবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড়রকম দান করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তখন শিক্ষিত লোকেদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যেত যে-সকল ঘটনা, রাজার নিকট সে-সকলের সামান্য-প্রকাশও ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা বহন করে আনতো। ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনার পারম্পর্য্য তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন এবং ভারতের চিন্তার জগতে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করতেন।

রামমোহনের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যে যে বিরাট ঘটনা ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতিপথের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেছিল, তাদের মধ্যে দু-একটি বিষয় আলোচনা করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ভারতে উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গেই এসকল ঐতিহাসিক ঘটনাসংক্রান্ত প্রবন্ধ, পুস্তক প্রভৃতি যোগ্য লোকের কাছে সম্মানলাভ করেছে এবং জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এসকলের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা এবং তারপরই হ'ল ফরাসী-বিপ্লব-কাহিনী। দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-প্রচেষ্টায় মানবের অধিকার ও মানবিকতার বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হওয়ায় জগতে একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। এখানে কেবল তার উল্লেখ করা হ'ল।

আমেরিকা

আমেরিকার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিরোধের সূত্রপাত হয় ১৭৬৩ ফেব্রুয়ারী ১০—ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। তখন কানাডা (মূলতঃ ফরাসী শক্তি) হতে আক্রমণের ভয় দূর হয়েছে এবং আমেরিকা নিশ্চিন্তে ঘরের দিকে মুখ ফেরাবার সুযোগ পেয়েছে।

ইংল্যাণ্ডও ১৭৬৫ থেকে আমেরিকার ওপর নিজস্ব প্রভাব-বিস্তারের সুযোগ খুঁজতে থাকে। আমদানী শুল্ক, ঝোলা-গুড়ের ওপর শুল্ক, স্থানীয় (ইণ্ডিয়ান) অধিবাসীদের জমি হস্তান্তর, ইংরেজ সেনা-কটক স্থাপন ব্যাপারে পদে পদে মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে দলিল-দস্তাবেজের ওপর ষ্ট্যাম্প-বিক্রয়-লব্ধ আয়ের

অংশ ইংরেজ দাবী করলে (Stamp Act), বিরোধ বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। বেগতিক দেখে ১৭৬৬-তে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক সেই শুল্ক রহিত হলেও উপনিবেশের ওপর পার্লামেণ্টের ট্যাক্স বসাবার শক্তির কথা সদর্পে পুনরুচ্চারিত হয়েছিল।

যথানিয়মে মতান্তর আরও প্রকাশ্যভাব ধারণ করে। ১৭৬৭ সালে কাগজ, কাচদ্রব্য ও চা-এর ওপর শুল্ক বসানো হয়। পরবৎসরই অন্যগুলি বাদ দিয়ে, চা সম্বন্ধে হুকুম বহাল রাখা হয়।

যখন প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব কেবল শুরু হয়েছে, তখন ১৭৭০ মার্চ ৫-ই ইংরেজ সৈনিকের গুলিতে বোষ্টন সহরে চারজন আমেরিকান মারা পড়ে। এই ঘটনাই ইতিহাসের 'বোষ্টন হত্যাকাণ্ড' (Boston Massacre)। জুন মাসে ইংরেজের জাহাজ (Gaspee) চড়ায় আটক পড়লে, তাতে আমেরিকানরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্রমে দলবদ্ধ বাধা দেওয়া আরম্ভ হলে, ১৭৭৩ ডিসেম্বর ১৬-ই বোষ্টন বন্দরে এক রাত্রে ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত থেকে ৩৪০ পেটি চা 'বোষ্টন চা (শুল্ক-প্রতিরোধ) সঙ্ঘ' (Boston Tea Party) কর্তৃক সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়।

তার পর থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমেরিকার ১২টি রাজ্য (State) ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ১৭৭৪ সেপ্টেম্বর ৫-ই মিলিত হয়। ফলস্বরূপ, নভেম্বর মাসে আমেরিকার ন্যায্য অধিকার ও অভিযোগ (Declaration of Rights and Grievances) ঘোষিত হয়।

এর পর থেকে প্রকাশ্য সংগ্রামের তালিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৭৫ এপ্রিল ১৮-ই কন্‌কর্ড (Concord)-এ অবস্থিত ইংরেজের রণসম্ভার আমেরিকা কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এপ্রিল ১৯, লেক্সিংটন (Lexington) যুদ্ধে ইংরেজ পরাজয় স্বীকার করে। মে মাসে কানাডার প্রবেশপথে অবস্থিত টিনকন্‌ডেরোগা (Tinconderoga) ক্ষুদ্র দুর্গটি আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরে ১৭৭৫ জুন ১৭-ই বাঙ্কার হিল (Bunker Hill)-এর অপেক্ষাকৃত বড় সংগ্রাম অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও আমেরিকা এই যুদ্ধে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। জুন ১৫-ই ওয়াশিংটন (George Washington) প্রধান সেনাপতিপদে বৃত হন এবং জুলাই ৩-রা থেকে সৈন্য-পরিচালনা আরম্ভ করেন।

কালবিলম্ব না করে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৭৭৬ জুলাই ৪-ঠা। এর বয়ান সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সূচনায় বলা হয় যে, প্রকৃতির নিয়মে যদি এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করতে চায়, তাহলে পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের অবগতির জন্য তার মূল কারণ প্রকাশ করা কর্তব্য।

"সৃষ্টির নিয়মে মানুষ সকলেই এক স্তরে জন্মলাভ করেছে এবং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তারা কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী হয়েছে। জীবন,

ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সুখশান্তি লাভের প্রয়াস ও সুযোগ সকলের মৌলিক অধিকার। একে লাভ করতে হলে, নিজেদের ভিতর থেকে শাসনযন্ত্র গঠন করতে হবে, আর সেই রাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোকমতের ওপর নির্ভরশীল হবে। যখন কোনও গভর্ণমেণ্ট জাতীয় সিদ্ধির পরিপন্থী হয় তখন শাসিত জনগণ এই গভর্ণমেণ্টের রদবদল বা উচ্ছেদ-সাধনের সম্পূর্ণ অধিকারী …। যাতে সমগ্র জাতির প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে পরিপূর্ণতা-লাভের সমস্ত পথ উন্মুক্ত থাকে, সেইরকম গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করে নিজেরাই তা পরিচালনা করবে।"

ইংরেজী ভাষায় যা বলা ছিল ঃ

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such principles and organising its power on such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness."

অবশিষ্ট অংশ সংক্ষেপতঃ দাঁড়ায় যে, বহুদিন ইংরেজের নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করবার পর এখন বোঝা যাচ্ছে পূর্ব্বসম্পর্ক রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। ইংলণ্ডেশ্বরের খামখেয়ালি আমেরিকাবাসীর সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি ও নানা-ভাবে অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে এবং সে-সকল থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ইংরেজ অমানুষিক বর্ব্বরতার সাহায্যে তার উপনিবেশ শাসন করতে চায়।

সে ব্যবস্থা মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, অতএব "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে" এবং "সময় এবার হয়েছে নিকট বাঁধন ছিঁড়িতে হবে"। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা এক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে জগতে পরিগণিত হতে চেয়েছে।

স্বাধীনতা-ঘোষণা এবং স্বাধীনতা-লাভ এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। ইংল্যাণ্ড তখন ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

১৭৭৬ আগষ্ট ২৬-এ 'লঙ আইল্যাণ্ড (Long Island) যুদ্ধ' শুরু হয় আর ২৯-৩০ তারিখে আমেরিকানরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। আবার নভেম্বর ১৬-ই ইংরেজ ওয়াশিংটন দুর্গ (Fort Washington) শত্রুকবলে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলেছে। ১৭৭৬ ডিসেম্বর ২৬-এ ট্রেনটন (Trenton) এবং

১৭৭৭ জানুয়ারী ৩-রা প্রিন্সটন (Princeton) যুদ্ধে আমেরিকা জয়ী হয়। এই সময় কিছু ফরাসী সৈন্য এসে আমেরিকার বহু সুবিধা করে দেয়।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় চলতে থাকে। পরে ১৭৭৮ সালে জার্ম্মানী থেকে বিশিষ্ট সমরকুশলী ফন ষ্টয়বেন (Von Steuben) এসে সদ্য-নিয়োজিত আমেরিকান সৈন্যের সামরিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং তা'তে স্বল্পকাল-মধ্যেই আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়েছিল। তার সঙ্গে ১৭৭৮ ফেব্রুয়ারীতে ফ্রান্স, ১৭৭৯-তে স্পেন আমেরিকার পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যোগদান করে। ফ্রান্সের নৌবহরের সাহায্য পাওয়ায় ইংরেজের সহিত জলযুদ্ধে আমেরিকাকে আর পূর্ব্বের মত বিব্রত হতে হয়নি।

আমেরিকার উত্তরাংশে ইংরেজের বিশেষ অসুবিধা হলেও, ১৭৭৮—৮০ সময়টা দক্ষিণ বা নিম্ন আমেরিকায় ইংরেজ কয়েকটা যুদ্ধে জয়ী হয়।

খণ্ডযুদ্ধ সমানে চলেছে ; ১৭৮১ থেকেই ইয়র্কটাউন (Yorktown) যুদ্ধের তোড়জোড় চলতে থাকে। অক্টোবর ১৯-এ পরাজিত হয়ে কর্ণওয়ালিশ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সমরবিরতি জ্ঞাপন করেন। এক বৎসর পরে, ১৭৮২ নভেম্বর ৩০-এ সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করা হয় এবং ১৭৮৩ এপ্রিল ১১-ই দু'পক্ষই সেটা মেনে নেয়। পরে ১৭৮৩ সেপ্টেম্বর ৩-রা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ইংরেজ-কবল হতে মুক্তিলাভ করায় আমেরিকা জগতে এক নতুন ধারাব প্রবর্ত্তন করে। নয়া শাসনতন্ত্র প্রচলিত হয়েছে আমেরিকায় স্বাধীনতা-যুদ্ধারম্ভ থেকেই। ইংরেজ-নিযুক্ত শাসকবর্গ বিতাড়িত হয়ে যুদ্ধ-পোতে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা সুবিধা পেলেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। পুরাতন শাসনযন্ত্র অপসারিত হয়ে কংগ্রেস, কন্‌ভেনশন (বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সভা), সমিতি গড়ে উঠেছে। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণের মতামত দ্বারা এদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু হয়ে যায়। সাধারণ নাগরিকের শক্তিতে শক্তিমান সরকারী কর্ম্মচারী একাধারে প্রজা ও রাজারূপে শাসন-পরিচালন আরম্ভ করেছে।

ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাজ্যের বা রাষ্ট্রীয় খণ্ডের স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছে অগ্রদূত আমেরিকা। হয়তো উত্তরকালে সারা পৃথিবী এই পথ গ্রহণ করে এক বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হবে। 'লীগ অফ্ নেশন্স' (League of Nations)—'রাষ্ট্রসংঘ' এ বিষয়ে প্রথম ক্ষীণ প্রচেষ্টা, এবং 'ইউনাইটেড নেশন্স অরগ্যানিজেশন্' (United Nations Organisation)—'সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ' তার বর্ত্তমান পরীক্ষা। আরও মারাত্মক অস্ত্রাদির আবিষ্কার ও আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যখন বিধ্বংসী হয়ে উঠবে তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত একটা মহাদেশ-সমন্বয় ঘটবে বলে মনে করা যেতে পারে।

ফ্রান্স

স্বাধীন আমেরিকা সাধারণ মানুষের অধিকার যতটা মেনে নিয়েছিল, পরে ফরাসী-বিপ্লব তাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের সংগ্রামে অনেক ফরাসী সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল ; তারা স্বদেশে এক নতুন ভাবধারা বহন করে আনে। এদিকে ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় শাসনব্যাপারে তিন শতাব্দী ধরে যত কলুষ জমে উঠেছিল তাকে একটা শুষ্ক বারুদের স্তূপ বলা চলে।

সামন্ততন্ত্র (feudal system) বহুকাল একই ধারায় চলাতে, তার মধ্যে প্রচুর গলদ জমে যায় এবং ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, উত্তর ইটালী প্রভৃতি দেশ থেকে ধীরে ধীরে সে-প্রথা অপসারিত হতে থাকে। ফ্রান্সে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ কৃষিজীবীর হাতে অর্থাগম ও রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্রে অংশ-গ্রহণের স্পৃহা মনের মধ্যে জেগে উঠতে থাকে। এই অবস্থার সঙ্গে ভল্টেয়ার (Voltaire), রুশো (Rousseau) প্রভৃতি চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের প্রবন্ধাদি ধূমায়মান বহ্নিতে ইন্ধন যোগ দিতে থাকে।

১৮৭০ সাল নাগাদ ইউরোপে সকল দেশের রাজশক্তি আপনাদের প্রভাবক্ষেত্র বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে এবং প্রজাশক্তি সেটা খর্ব্ব করবার জন্য প্রস্তুত হয়। এইরকম সময়ে, ১৭৮৯ মে ৫-ই ফ্রান্সের ত্রি-সংসদ (Estates General) অর্থাৎ —(১) ধর্ম্মযাজক পাদ্রী, (২) বিত্তবান অভিজাত সম্প্রদায়, ও (৩) নিম্নমধ্যবিত্ত বা জনসাধারণ এক সভায় মিলিত হয়। এই সভা সম্রাট ষোড়শ লুই (Louis XVI)-এর মনঃপূত হয়নি এবং তিনি এটিকে তিন স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করে ফেলার আদেশ দেন। কিন্তু সংসদের প্রতিনিধিরা সরাসরি অগ্রাহ্য করে এবং জুন ১৭-ই তৃতীয় সংসদ (Third State) 'জাতীয় (সাংবিধানিক) সভা' [National (Constituent) Assembly নাম গ্রহণ করে প্রকাশ্যে রাজনীতির ও শাসনযন্ত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জুন ১৭-ই ফ্রান্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর ঘটনাস্রোত খুব দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। ১৭৮৯ জুন ২০-এ সভার অধিবেশনের জন্য গেলে, দেখা যায়, সভাকক্ষর সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ। নিরুৎসাহ না হয়ে সভ্যরা নিকটস্থ এক টেনিস-কোর্টে সভা করে এবং শপথ গ্রহণ করে যে, যতদিন না তারা ফ্রন্সের গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করতে পারে, ততদিন অধিবেশন সমানভাবেই অনুষ্ঠিত হবে।

সম্রাট (Louis XVI) ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে এবং রাজাজ্ঞায় যখন প্যারি সহরে বিরাট সৈন্যসমাবেশ হয় তখন বোঝা গেল একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছে। জুলাই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ রাজধানীতে

প্রতিনিয়ত গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতে থাকে এবং ১৭৮৯ জুলাই ১২-ই সহরেই জাতীয় রক্ষিবাহিনী (National Guard) গঠিত হয় ; আর, জুলাই ১৪-১৫-ই কুখ্যাত কারা-দুর্গ ব্যাষ্টিল (Bastille) বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়।

১৭৮৯ আগষ্ট ৪-ঠা সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার বিলোপসাধনের আদেশ প্রচার করা হয়।

অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তখন জনপ্রতিনিধিরা ফ্রান্সকে ৮৩-টি রাষ্ট্রীয় বিভাগে (Departments sub-divided into Districts, Cantons and Communes) বিভক্ত করে শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরা মাত্র জাতীয় সভার আনুগত্য স্বীকার করে, আর সরকারী আদেশ ও অনুজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এইভাবে জনপ্রতিনিধি শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং বিকল্প শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে।

ক্রমে ১৭৯১ আগষ্ট ৪-ঠা ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় (First and Second States) জাতীয় কর্তৃত্ব মেনে নেয়। আগষ্ট ২৬-এ জগতে এক অতি স্মরণীয় দিন। আমেরিকার অনুকরণে ফ্রান্সের জাতীয় সভা সাধারণ মানুষ ও নাগরিকদের ন্যায্য দাবীর কথা ঘোষণা করে (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) ; এতে বলা হয়—(ব্যক্তিগত) স্বাধীনতা, সম্পত্তি বা সম্পদ, নিরাপত্তা ও অত্যাচার-প্রতিরোধ-শক্তি ("Liberty, property, security and the rights to resist oppression") প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। সংক্ষেপতঃ এটাই হ'ল সারা জগতের কাছে পরিচিত মন্ত্র ঃ "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"।

ভার্সাই (Versailles) সহরে যখন এই সভার কাজ চলছে তখন বাজসৈন্য তথায় প্রেরিত হয়। প্যারি সহরে প্রতিনিধি-গোষ্ঠী (Commune) সম্রাটের কার্য্যে সহায়তা না করে প্রকাশ্যে জনমত সমর্থন করে। বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হলে, সম্রাট অক্টোবর ৫-ই প্রজাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন এবং গোপনে ভার্সাই সহর থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য্য হয়ে তিনি প্যারি সহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

পরে তিনি পলায়নের উদ্দেশ্যে টুলেরিজ (Tuileries) প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন ১৭৯১ জুন ২০-এ ; কিন্তু ভ্যারেন্স্ (Varennes)-এর নিকট তাঁর পথ অবরুদ্ধ হয় এবং তাঁকে রাজধানীতে ধরে আনা হয়। তখন পর্য্যন্ত সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রশ্ন ওঠেনি। ১৭৯১ জুলাই ১৭-ই জাতীয় রক্ষিবাহিনী (National Guard) প্যারি সহরের এক অঞ্চলে (Champ de Mars) এক জনতার ওপর গুলি চালায় এবং তাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। এইসময় জাতীয় সভা (National Assembly)-র মধ্যে রাজতন্ত্র-সমর্থন বা বিলোপ নিয়ে বিশেষ মতান্তর দেখা দেয়।

সংবিধান-প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে এবং সেপ্টেম্বর ৩-রা জাতীয় সভায় সেটা মনোনীত হয় ; পরে সেপ্টেম্বর ১৪-ই সম্রাটের অনুমোদন-লাভে সমর্থ হয়। সেপ্টেম্বর ৩০-এ পুরাতন এ্যাসেম্ব্লী লোপ পায়। নবগঠিত বিধান-পরিষদ (Lagislative Assembly)-এর প্রথম অধিবেশন হয ১৭৯১ অক্টোবর ১-লা।

জনতা শক্তির স্বাদ পেয়ে এবং রাজতন্ত্রের ওপর আক্রোশবশতঃ ১৭৯২ জুন ২০-এ টুলেরিজ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। ক্রমেই বামপন্থীরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে, আগষ্ট ১০-ই সম্রাট ও তাঁর পরিবাববর্গকে টেম্পল্ (Temple) নামক ধর্ম্মযাজকদের আশ্রমে (monastery)-তে বন্দী অবস্থায় রেখে দেয়। আত্মকলহ, বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা, ভীষণ আর্থিক অনটন, সরকারী অব্যবস্থা সব মিলে তখন ফ্রান্স বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৭৯২ সেপ্টেম্বর ২-রা থেকে ৭-ই এ-ক'দিনের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ-নির্ব্বিশেষে নিহত বন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২০০ বা তদধিক।

১৭৯২ আগষ্ট ১০-ই ফ্রান্সে গণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২১-এ রাজতন্ত্রের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ডান্টন (Danton), রবস্পিয়র (Robespierre) প্রভৃতি বহু মহাবিপ্লবী নেতার জীবনাবসান ঘটে বিপক্ষ দলের "অতি"-বিপ্লবীর আদেশে। ১৭৯৩ জানুয়ারী ২১-এ সম্রাট ষোড়শ লুই-এর শিরশ্ছেদ করা হয়।

স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, দায়িত্বহীন বিলাসপ্রিয় চরিত্রহীন ধনগর্ব্বিত সামন্তবর্গ এবং তাদের পার্ষদের হাত হতে মুক্তিলাভ করতে গিয়ে ফ্রান্সকে ৩০,০০০ লোকের ফাঁসিতে হত্যা ছাড়া অপরাপর ভয়াবহ পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও বলতে হয়, মানবতার দাবী "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"-বাণী যে পরাধীন জাতিকেই স্পর্শ করেছে সেই দেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করে ধন্য হয়েছে। কণ্টকাকীর্ণ স্বাধীনতার পথে এইভাবে পদক্ষেপ ছাড়া ফ্রান্সের সামনে হয়তো অন্য পথ উন্মুক্ত ছিল না।

ইটালী-স্পেন-আর্জেণ্টাইনা

যে বিপ্লবগুলির প্রতি রামমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি কার্য্যতঃ তার সিদ্ধি বা বিফলতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন, তার উল্লেখ করা চলতে পারে।

নিয়োপোলিটান—ইটালীর নেপ্‌ল্‌স্-এর অধিবাসীদের দ্বারা তদানীন্তন সম্রাটের (Joachim Umrat, 1808—15) রাজত্বকালে 'কার্ব্বনারি দল' (ইটালীয় Carbonari বা 'charcoal burners' হতে গৃহীত নাম) গঠিত হয়। ফ্রান্স, বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়ার প্রভাব থেকে ইটালীকে মুক্ত করাই ছিল এদের লক্ষ্য। ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কবি লর্ড বায়রন (Byron) ছিলেন এই দলের বড় পৃষ্ঠপোষক। বিপর্য্যস্ত

হলেও 'কার্ব্বনারি দল' সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। ১৮১৫ সালে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলে, সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড (Ferdinand IV) তাদের দমন করেন। ১৮২০ জুলাই ১-লা প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটে মণ্টফোর্ট (Montforte)-এ ; দলের স্লোগান (দলীয় ধ্বনি) হ'ল—"ঈশ্বর, সম্রাট ও সংবিধান" (God, the King and Constitution)। তাদের দমন করবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, জুলাই ১৩-ই একটি রাজ্য-পরিচালন-বিধি গৃহীত হয়। ১৮২১ সালেই সম্রাট অষ্ট্রিয়ানদের সাহায্যে কার্ব্বনারি-দলের শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে সমর্থ হন। পরে ম্যাট্‌সিনি (Giussepe Mazzini) এই সঙ্ঘের অবশিষ্ট সভ্য নিয়ে 'নব্য ইতালী (Young Italy) দল' গঠন করেন।

নিয়োপোলিটানদের উত্থান ও পতন দুইটাই রামমোহন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। প্রথমে তিনি বেশ উল্লসিত এবং পরের ঘটনায় অবসাদগ্রস্ত হন। তিনি বন্ধু বাকিং-হাম (Silk Buckinghum)-কে ১৮২৫ আগষ্ট ১১-ই লেখেন যে, স্বাধীনতার বৈরী এবং যথেচ্ছাচরণের সমর্থকগণ শেষ পর্য্যন্ত সফলতা-লাভে সমর্থ হয় না ("Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful.")

যে ঘটনা উপলক্ষে রামমোহন আনন্দাতিশয্যে টাউন-হল্-এ ভোজ দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে স্পেনের সাময়িক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা-লাভ। নেপলিয়নের সময় স্পেন সম্পূর্ণ ফ্রান্সের প্রভাবে আসতে বাধ্য হয়। পরে ১৮১৪ সাল ওয়াটারলু যুদ্ধে ফরাসী শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লে স্পেনের সম্রাট সপ্তম ফার্ডিনাণ্ড সিংহাসন ফিরে পান। তিনি এসে, ১৮১২ সালে স্পেনে যতটা গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল তা ১৮১৪-তে রদ করে দেন। ফলে, ১৮২০ সালে র‍্যাফেল রিগো (Colonel Rafel Rigo)-র অধিনায়কত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ফার্ডিনাণ্ড আত্মরক্ষার জন্য পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হন। এইটাই লোকমতের জয় বলে সে-সময় গৃহীত হয়েছিল।

পরের ঘটনাও সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রুশ, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী রাজ্যজোট থেকে ভয়ানক প্রতিবাদ ওঠে—আবার গণতন্ত্রের উদ্ভবে সম্রাটদের শক্তি ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড সে আক্রমণাত্মক দলে যোগ দিতে অস্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি।

আবিসিনীয়া

শ্বেতজাতির ঔদ্ধত্য ও কৃষ্ণকায়-জাতির স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টা একটা অতি সাধারণ ঐতিহাসিক তথ্য। সুতরাং এ-দু'য়ের দ্বন্দ্বে শ্বেতাঙ্গের পরাজয়-সংবাদ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ব্যাপার। উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, ১৮৯৬ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইটালীর

আবিসিনীয়া-আক্রমণে। মার্চ ১-লা আদোয়া (Adua) রণক্ষেত্রে কালা-সৈনিকের নিকট শ্বেতাঙ্গের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। নানা ভাবে আস্ফালন চলতে থাকলেও ১৮৯৬ অক্টোবর ২৬-এ 'আদ্দিস্ আবাবা (Addis Ababa) সন্ধি' স্থাপিত হয়। আবিসিনীয়ার উপর ইটালীর কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা এইভাবে অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শ্বেতাঙ্গ ইটালীয়ানদের পরাজয় ভারতবর্ষে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করেছিল।

বুয়র (দক্ষিণ আফ্রিকা)

দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করবার চেষ্টায় ইংরেজ কোনও ত্রুটি রাখেনি। "বুয়র" (Boer) কথাটি আসে ওলন্দাজ বোয়েরেন (Boeren) বা চাষী সম্প্রদায় হতে। এরা হল্যাণ্ড এবং তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ফ্রান্স হতে দক্ষিণ-আফ্রিকার অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট (Orange Free State) ও কেপ কলোনি (Cape Colony)-তে এসে বসবাস আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে ইংরেজ এদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছে এবং ১৮৮১ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ মাজুবা হিল্ (Majuba Hill)-এ ইংরেজের পরাজয়ে বিরোধের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু বাঙ্গলা সচকিত হয়ে ওঠে ১৮৯৯—১৯০২ সালের যুদ্ধকালে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখতে আরম্ভ করে।

কিম্বারলীতে সোনার খনি আবিষ্কারের পর বুয়র রাজ্যের ওপর ইংরেজের লোলুপদৃষ্টি আর-একবার পড়ে। রাষ্ট্রপতি ক্রুগার (Stephanus Johannes Paulus Kruger) ইংরেজের দুর্বাভিসন্ধি সন্দেহ করে সমরপ্রস্তুতি আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ অক্টোবর ১০-ই যুদ্ধারম্ভ হয় এবং বুয়রদের হাতে ইংরেজের চরম দুর্দ্দশা ঘটে। অবস্থা এত গুরুতর হয় যে, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এটাকে "কালা সপ্তাহ" (Black Week of December, 1899) বলা হয়েছে। জুবার্ট (Petrus Jeacobus Joubert), বোথা (Louis Botha), ডি ওয়েট (Christian De Wet), ক্রঞ্জি (Piet Cronje), ডি লা রে (Jacobus Hercules De La Ray) প্রমুখ সেনাপতিরা সমরবিদ্যার যে অদ্ভুত পরিচয় দেন, তার তুলনা অন্যত্র বিরল। গোপনে হঠাৎ আক্রমণ ও অন্তর্দ্ধান বা গরিলা-যুদ্ধনীতি অবলম্বন করায় ইংরেজ বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। কোথায় কি-ভাবে এই আক্রমণ এসে পড়বে তার জন্যে ইংরেজ সমরকুশলীরা নিতান্ত নিরুপায় বোধ করতে থাকেন। উত্তরকালে প্রসিদ্ধ চার্চ্চিল (Winston Leonard Spencer Churchill) বোথার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। অবশ্য বন্দী অবস্থা থেকে পলায়ন চার্চ্চিলের এক বড় কৃতিত্ব।

১৮৯৯ ডিসেম্বর ব্রিটেনের টনক নড়ে। "চাষা" বুয়রদের যত হীন দুর্ব্বল মনে করে ইংরেজ সৈন্যবল রণে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে ধারণা ছুটে যেতে বেশী সময় লাগেনি। তখন বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে "সাজ" "সাজ" রব পড়ে গেল। "গেল

রাজা, গেল মান" বলে ইংল্যাণ্ডের লোক ডাক ছাড়তে লাগল ; মজুত সেনাবাহিনী, স্বেচ্ছাসৈনিক, শস্ত্রধারী আধা-সৈনিক—সব প্রস্তুত হতে লেগে গেল। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ডে সৈন্য সংগৃহীত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হ'ল। বুলার, বাটলার প্রভৃতি সেনাপতিরা পথ ছেড়ে দিলেন লর্ড রবার্টস্ (Frederick Sleigh Roberts) ও লর্ড কিচ্‌নাব (Herbert Kitchner)-কে।

এইসকল ঘটনা থেকে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের গুরুত্ব ও বুয়রদের শৌর্য্যবীর্য্য ও রণনীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে মাত্র। ইংরেজ তখন দু'লক্ষ সৈনিক সমবেত করেছে। সাজসরঞ্জামের তো কথাই নেই, আর তাব বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অনধিক পঁচিশ হাজার বুযর। চারিদিকে বুয়র সৈন্যের উপস্থিতির বিভীষিকা ইংরেজকে অভিভূত কবে ফেলে। বুযররা ১৮৯৯ সাল কিম্বাবলী ও লেডিস্মিথ নগরী অবরোধ করে। ইংরেজ সে-অবরোধ ভাঙ্গতে সমর্থ হয়ে কতকটা ইজ্জত ফিরে পায়। ইতিমধ্যে ক্রঞ্জি-র আত্মসমর্পণ বুয়রদের পক্ষে একটা বড় দুর্ঘটনা।

১৯০০ মার্চ ১৩-ই ব্লোমফন্‌টাইন (Blomfontein)-এব পতন হলে, বুয়ররা কতকটা নিজ্জীব হয়ে পড়ে। তাদের বিপর্য্যয় শুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। হ'ল বটে সাময়িক পরাজয। কিন্তু ইংবেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ব্রিটিশ-শক্তিকে প্রতিরোধ করার অপরাপর নানা সুযোগ-সুবিধা তো ছিলই, তার ওপব ছিল—"The brilliance of their guerilla leaders and the skill, valour and resolution of the few." (তাদের গরিলা-যুদ্ধনায়কদের বিস্ময়কর কর্ম্ম ও ধীঃশক্তি এবং অল্পসংখ্যক যোদ্ধবর্গের দক্ষতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা বর্ত্তমান)। সুতরাং সে-জাতি কোনও ক্ষেত্রে পবাজিত হতে পারে, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ দমিত হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপরই দেখা যায় ঃ

"Nevertheless, right up to the last few weeks of the war, events showed a fairly even balance between the British and the Boers, and most famous of the Boer guerilla leaders were still at large at the end." (*Chambers Encyclopaedia*)

(যুদ্ধ-সমাপ্তির মাত্র শেষ কয়েক সপ্তাহ আগে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ও বুয়র-সমরশক্তি তুলাদণ্ডে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে এবং বুয়রদের সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী গরিলা-নেতারা শেষ অবধি মুক্ত অবস্থাতেই ছিলেন।)

এর পর দু'পক্ষই সন্ধির পথ খুঁজতে লেগে গেল। বহু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ১৯০২ মে ৩১-এ 'ভেরেনিগিং (Vereeniging) সন্ধি' স্থাপিত হলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ নবজাগ্রত বাঙ্গলায় বুয়র যুদ্ধ এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। পত্রিকা পড়া যাঁদের অভ্যাস তাঁরা বুয়রদের জয়ের সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে

উঠতেন, পরাজয়ের সংবাদে বিমর্ষ হয়ে পড়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। বুয়র যুদ্ধের শিক্ষা ছিল স্বাধীনতা-রক্ষায় বদ্ধপরিকর একজন দেশপ্রেমিক বিদেশী পররাজ্যলোলুপ চারজনের মহড়া ধরতে পারে। আর শিক্ষা দিয়েছিল—প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে লড়তে হলে গরিলা-যুদ্ধের সফলতা।

বুয়ব যুদ্ধটা বাঙ্গলা পত্র-পত্রিকায় খুব আলোচিত হয়েছিল। এ-সবের সার মর্ম্ম যে, ইংবেজ উচিত-শিক্ষালাভ করেছে একটি ক্ষুদ্র শক্তির কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মরুভূমিতে ইংল্যাণ্ডেব শ্বেতচর্ম্মধারীর প্রচুর রক্তপাত হয়েছে বলে মাতা ব্রিটানিকাব করুণ ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে, এ বড় ক্ষোভেব কথা —লেখে 'সমীরণ' ১৮৯৯ নভেম্বর ৮-ই। পত্রিকা আরও বলে—"বুয়ররা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, তা কোনও দেশ এব পূর্ব্বে কল্পনাই করতে পারেনি। যখন মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করে, তখন তার দেহে অভাবনীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়। বুয়রবা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। তা না হলে, এত ইংরেজ-মায়ের চক্ষু অশ্রুসজল কেন? ইংল্যাণ্ডের এত লোক শোক-ভারাক্রান্তই বা কেন? এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে ইংরেজ কখনও এত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেনি, এত বিরাট যুদ্ধায়োজনও করেনি, এত সাবধানতা অবলম্বনেব প্রযোজনও হয়নি। আমরা মনে করেছিলাম চক্ষের নিমেষে বুয়রদের সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেওয়া যাবে। হায়! সে একটা বিরাট ভ্রান্ত-ধারণা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ছোটখাটো সংঘর্ষের কথা ছেড়ে দিলেও বড় দরের ছয়টা যুদ্ধে বুয়ররা অদম্য সাহস, অপরিমেয় বীর্য্য এবং অতুলনীয় শৌর্য্যের পরিচয় দিয়েছে। যে লোকক্ষয় হয়েছে, ইংরেজের তাতে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

'হাবল্‌ল মতিন' (১৮৯৯ নভেম্বর ৬-ই) এবং অপরাপর নানা পত্রিকা একই সুরে গান ধরেছে। 'হিতবাদী' (নভেম্বর ১০-ই) প্রকাশ্যভাবেই লিখেছে—"ইংরেজের বারম্বার পরাজয়ে আমাদের দুঃখ তো হয়ইনি, বরং আমরা বিশেষ আনন্দিত। আমরা সহস্র কণ্ঠে বুয়রদের জয়গান করি। ধন্য বুয়রদের সাহস! ধন্য তাদের বীরত্ব !! ধন্য তাদের দেশপ্রেম !!!" এর ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা প্রকাশ পেয়েছে—শত্রুর পরাজয়ে নিজেদের আনন্দ।

'সমীরণ' আবার বলছে (নভেম্বর ১৫-ই): "অর্দ্ধসভ্য এক জাতির মারের কাছে বৃটিশ সিংহের মুখে চুণ-কালি পড়েছে।" 'বঙ্গবাসী' (১৮৯৯ নভেম্বর ২৫-এ) সেনাপতি জুবার্ট-এর জয়গান করছে—"তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন।"

'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি বিদেশী-পরিচালিত পত্রিকারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠেছে।' ইংরেজের পরাজয়ে ভারতবাসী উৎফুল্ল হয়েছে, এই মনোভাবের প্রতি সরকারের কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু তখন আর বাঙ্গালীর মনের আনন্দ গোপন করে রাখার উপায় ছিল না।

এ ছাড়া অন্য একদিক লক্ষ্য করবার ছিল। বুয়র সেনাপতিদের নানারকম

গুণের কথা বড় করে লেখা হয়েছিল তখনকার রীতি। সেনাপতি ক্রুগার দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বাড়ীর দরজায়, লিখলে 'সঞ্জীবনী' (১৮৯৯ ডিসেম্বর ১৪-ই), আর লেডিস্মিথ থেকে ইংরেজ-বন্দী নিয়ে যাচ্ছে বুয়র সৈন্যরা। ট্রান্সভাল রিপাবলিকের শিরোমণি ক্রুগার আনন্দ প্রকাশ তো করলেনই না, উপরন্তু মাথার টুপি উঁচু করে ধরে শত্রুসৈন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দী-সৈন্যরা সোল্লাসে প্রত্যভিবাদন জানালে। প্রশ্ন করছে 'সঞ্জীবনী': "ক'জন মহাপুরুষ আছেন যাঁরা ক্রুগারের সদাশয়তা, বীরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের মহানুভবতার সমকক্ষতা লাভ করতে পারে?" 'সঞ্জীবনী' (১৯০০ জানুয়ারী ১১-ই) সংবাদ দিচ্ছে—ক্রুগার বাৎসরিক ১,০৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০ টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করবার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

ডে লা রে ১৯০২ মার্চ ৭-ই ক্লার্কস্‌ডোর্প (Klerksdorp) যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেথুয়েন (Methuen)-কে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, মেথুয়েন-এর মত সম্মানিত বন্দীর যথোপযুক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থার সুযোগ তাঁর নেই, তিনি বন্দীকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করে ইংরেজ-শিবিরে ফিরে যাবার সকল ব্যবস্থা করেছেন।

এরকম মহানুভবতার সংবাদ প্রচারিত তো হ'তই, আরও হয়েছে বুয়রদের পরাজয়কে গৌরব-আখ্যায় অভিহিত করা। তখন বাঙ্গালী-মন বোথা, ডি ওয়েট, ডি লা রে, জুবার্ট প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। এমন পরিবার অনেক ছিল যেখানে বুয়র সেনাপতিদের নামে বাঙ্গালী শিশুদের নামকরণ হয়েছে।

আয়ার্ল্যাণ্ড

আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর ইংরেজের শাসন ভারতবর্ষ থেকে অনেক পুরাতন। কাজেই তার সংগ্রামের ধরন-ধারণ, রীতি-প্রকৃতি বাঙ্গলার নিকট একটা বড় শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন থেকে নিবিড়ভাবে ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে আইরিশ যুদ্ধের খুঁটিনাটি ভারতের সংগ্রামীরা সন্ধান করতে আরম্ভ করেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের অনুকরণে ভারত খুব দ্রুত অগ্রসর হয় এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে একই সংগ্রাম-পদ্ধতি এই দুই দেশে গৃহীত হয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিস্ফুট হবে।

শাসনযন্ত্রের সমস্ত প্রধান পদে ইংরেজ পাকাপাকি দখলিকার ছিল ১৬০৩ সাল পর্য্যন্ত। তারপর নিদারুণ জনমতের চাপে অতি ধীরে ধীরে বাঁধন শিথিল করতে থাকে। আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিকরা ছিল প্রভাবে ও সংখ্যায় প্রধান, আর ইংরেজ বরাবরই প্রটেষ্ট্যাণ্টদের সাহায্য নিয়ে তাদের নানারকম বিব্রত করেছে। ১৭২৭ নাগাদ এর তীব্রতা খুব বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেন থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যনীতি নিয়ন্ত্রিত হ'ত,

আর ১৬৮৯ থেকে প্রায় সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা হ'ল তাদের প্রকাশ্য কর্ম্মসূচী।

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রচলিত আইন রদ করে ইংরেজ নিজের আইন সেখানে চালু করেছে; তা'তে মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে দু'পক্ষে। ইংরেজ শান্তি পায়নি। নানারূপ প্রকাশ্য দমননীতি-গ্রহণ শুরু হয়েছে ১৮৪২ থেকে; পরে প্রচণ্ডতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময় দলে দলে লোক উত্তর আমেরিকা চলে গেছে। এক ১৮৪২ সালেই সংখ্যা উঠেছিল লক্ষাধিক।

আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর হাঙ্গামার চাপে ইংল্যাণ্ড ক্যাথলিকদের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করতে বাধ্য হয়। প্রটেষ্ট্যাণ্ট জমিদারের শক্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত আলু-উৎপাদনে বিঘ্ন হওয়ায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেশটাকে গ্রাস করে বসে। ১৮৫১-তে অন্ততঃ দশ লক্ষ লোকের অনাহারে জীবনান্ত ঘটে; সাড়ে বারো লক্ষ লোক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। একমাত্র পণ্য-রপ্তানী ছাড়া তার পক্ষে অপর দেশ থেকে অর্থ উপার্জ্জন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মালপত্রের দাম অসম্ভব পড়ে যেতে থাকে এবং কাজকর্ম্মের অভাবে লোকের চূড়ান্ত দুর্দ্দশা দেখা দেয়। ১৮৯৩-তে গেলিক্ ভাষাকে নির্ব্বাসন দেবার চেষ্টা করেছে ইংরেজ। আয়ার্ল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকা নির্বিবচারে লোপ করা হয়েছে। পুলিশের রিপোর্টে সভা-সমিতি ভেঙ্গে দেওয়া বা একেবারে রদ করা ছিল সাধারণ নিয়ম।

১৮৭৫ সালে দারুণ অর্থকষ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছিল; তার ওপর ১৮৭৭—৭৯ অজন্মার পর দুর্ভিক্ষ এসে দেশকে গ্রাস করে বসেছে এবং ১৮৭৯ থেকে ১৮৮২ পর্য্যন্ত যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেটা সংগ্রামপর্য্যায়ে এসে পৌঁছুলো। এই হ'ল মোটামুটি চিত্র; ভারতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য প্রচুর। দু'দেশই একই দলন-যন্ত্রে নিষ্পেষিত। যাবার আগে দেশ-বিভাগ করে দেওয়া ব্যাপারে ইংরেজী কূটনীতিতে উভয় দেশে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

এইবার সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক্। পাঠক এদিকে লক্ষ্য রাখবেন যে, উভয় দেশের সংগ্রামের পদ্ধতিতে সামান্য তারতম্য থাকলেও, একই ভাবে উভয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১১৭০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ওপর ইংল্যাণ্ডের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়; ধীরে ধীরে বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠে,—১৬৪১ সালে শত্রুকে বিতাড়িত করবার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং এসময় বহু ইংরেজ নিহত হয়েছে। বিদ্রোহ দমিত হলেও দেশে শান্তি আসেনি। লিমারিক্ (Limerick)-এর সন্ধি হয়েছিল ১৬৯১ সালে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর আয়ার্ল্যাণ্ড কিছুকাল (১৭৮২ থেকে ১৭৯৯) স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের সম্মান ও সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ১৮০১ সালে দুই দেশের পার্লামেণ্ট এক করা হয়।

ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট নিজ নিজ স্বার্থে মিলিত হয় ১৭৯১ সালে। উল্‌ফ টোন (Theobold Wolfe Tone) হলেন প্রবর্ত্তক (১৭৯২ সাল); ফিট্‌জেরাল্ড (Edward Fitzgerald) ফ্রান্সের গণবিপ্লব থেকে ফিরে এসে যোগ দেন। দলের নাম হ'ল 'ইউনাইটেড আইরিশম্যান' (United Irishman)। ১৭৯৭-৯৮ সালে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বিপ্লব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। উল্‌ফ টোন বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যা করেন (১৭৯৮ নভেম্বর ১৭-ই)। দলের অন্যতম নেতা ফিট্‌জেরাল্ড পলাতক অবস্থায় ধরা পড়ার কালে বাধা দেন এবং সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে মারা পড়েন। দলের অন্যতম নেতা রবার্ট এমেট (Robert Emmet) ডাবলিন দুর্গ (Castle) অধিকার ও রাজপ্রতিনিধি (Viceroy)-কে বন্দী করার চেষ্টায় বিফল হবার পর ইংরেজ কর্তৃক ধৃত হন এবং ১৮০৩ সেপ্টেম্বর ২০-এ ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন দেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম দমন করবার জন্য ইংরেজ আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে বহু সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তখন আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয়, যাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের দাবী মানতে ইংরেজকে বাধ্য করা যেতে পারে। এঁদের চেষ্টায় স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এর ফলে অবাধ বাণিজ্যনীতি লাভ ছাড়া, আর বিশেষ কিছুই আদায় করা গেল না।

১৮০৬ সাল থেকে ও' কোনেল (Daniel O' Connell)-এর প্রভাব আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনীতিতে বেশ গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকে। ১৮৪০ সালে তিনি পার্লামেণ্টীয় সংযোগ ছিন্ন করার দাবীতে 'রিপীল এ্যাসোসিয়েশন' (Repeal Association) গঠন করেন। এখন থেকে প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে আয়ার্ল্যাণ্ডের দাবী উত্থাপিত হতে থাকে এবং দেশবাসীর সমর্থন বৃদ্ধি পায়।

১৮৪৩ অক্টোবর ৮-ই এক আদেশে তথাকার সমস্ত প্রকাশ্য সমিতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন আইরিশ নেতারা সখেদে বলেছেন যে, একজন গুপ্তচরের রিপোর্ট এবং এক রাজপুরুষের মর্জির কাছে একটা সমস্ত জাতি অসহায়।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার জন্য ও' কোনেল কারারুদ্ধ হন। উচ্চতম আদালতের রায়ের বলে মুক্তিলাভ করার পূর্ব্বে চৌদ্দ সপ্তাহ তাঁকে কারাগৃহে অবস্থান করতে হয়। তাঁর দলের ভিতর থেকেই একটি অংশ বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করে। তারা 'আয়ার্ল্যাণ্ডের যুব সঙ্ঘ' (Young Ireland Group) নামে পরিচিত।

এই সময় আর এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ভূমির ওপর সমস্ত স্বত্ব কেবলমাত্র দেশবাসীর। তারা নিজের মতে বিলি-ব্যবস্থা করবে এবং সে দাবী মানিয়ে নিতে যথাযোগ্য শক্তিপ্রয়োগে পরাঙ্মুখ হবে না। ল্যালর (Fintan Lalor) এ-মতের উদ্যোক্তা। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য

রাজস্ব বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হ'ল। মোট কথা, স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্রের চিন্তাই এর মূল প্রেরণা। ১৮৪৮ সালে ল্যালর-এর কারাদণ্ড ঘটে।

ল্যালর হলেন 'আইরিশ কন্‌ফেডারেশন'-এর (Irish Confederation) অন্যতম সভ্য। এর প্রধান উদ্যোক্তা ও' ব্রায়েন (Smith O' Brien) ও সহকর্ম্মী ছিলেন মিচেল (John Mitchell), ডফি (Charles Gavan Duffy) ও ডেভিস (Thomas Osborne Davis)। এঁদের পত্রিকা ছিল 'দি নেশন' (The Nation) আর 'আইরিশ ফেলন' (Irish Felon)। শেষোক্ত পত্রিকায় ল্যালর-এর মতবাদ খুব বেশী প্রচারিত হ'ত। পত্রিকা দু'খানাই সরকারী হুকুমে বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্রোহ করবার চেষ্টা বিফল হলে, ১৮৪৮ সালে সঙ্ঘটিকে দমন করে দেওয়া হয়। ডেভিস, মিচেল ও সঙ্গীদের দীর্ঘ কারাবাস ঘটে।

এর পর যাঁরা এলেন তাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। আইরিশ 'ফিয়ানা' (Fianna) অর্থাৎ সৈনিক থেকে নামকরণ হয়েছিল 'ফেনিয়ান সঙ্ঘ' (Fenian Association)। আয়ার্ল্যাণ্ডের এক কিম্বদন্তী থেকে নামটি গ্রহণ করেন ও' ম্যাহনি (John F. O' Mahony)। তিনি ১৮৫৮-তে যে 'আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' (Irish Republican Brotherhood) সৃষ্টি করেন তারই একাংশের জন্য 'ফেনিয়ান' নাম গ্রহণ করা হয়েছিল। ষ্টিফেন (James Stephen) আমেরিকায় ছিলেন এই দলের কর্ণধার। আমেরিকা হতে অর্থসাহায্য আসায় আয়ার্ল্যাণ্ডের দল অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বলপ্রয়োগে নিজ দেশকে ব্রিটেন থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য বিরাট ষড়যন্ত্র হ'ল উদ্যমের মূলমন্ত্র।

ফেনিয়ানরা ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ১৮৬৭ সালে; কানাডায় এ ঘটনা হয় ১৮৬৬-তে। ইংল্যাণ্ড সর্ব্বশক্তি-প্রয়োগে প্রতিষ্ঠানকে দমন করেছে। তৎসত্ত্বেও চেষ্টার (Chester) জেলের ওপর আক্রমণ, ম্যাঞ্চেষ্টার জেলের মধ্যে আবদ্ধ বন্দীদের মুক্তিসাধন ও ক্লার্কেনওয়েল (Clerkenwell) জেল ধ্বংস-প্রচেষ্টার গুপ্ত-প্রস্তুতির সংবাদ যখন প্রচারিত হ'ল, তখন ইংরেজ জোড়াতালি দিয়ে বিদ্রোহীদের শান্ত করবার চেষ্টা করে।

১৮৬৭ সালের পর ফেনিয়ানরা দু'অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে: আমেরিকায় 'ক্লান্ না গেল্' (Clan na Gael) আর ব্রিটেনে 'আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' (Irish Republican Brotherhood)। এরা প্রথমদিকটায় পার্লামেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার পক্ষপাতী ছিল।

ইতিমধ্যে পার্নেল-এর (Charles Stewart Parnell) অভ্যুত্থান আয়ার্ল্যাণ্ডে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

১৮৭০ থেকে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত স্বায়ত্তশাসন-লাভের জন্য আন্দোলনের

তীব্রতা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ফেনিয়ানদের সঙ্গে পার্নেলের অনুচরদের সাহচর্য্য-স্থাপন-চেষ্টা বিফল হলে ফেনিয়ানদের কর্ম্মধারা উগ্ররূপ ধারণ করে।

১৮৭৯-তে ডেভিট (Michael Davitt) 'ল্যাণ্ড লীগ' (Land League) স্থাপন করেন এবং এই সময় বাঙ্গলার পল্লীর সামাজিক শাসন-অস্ত্র "একঘরে" বা "ধোপা-নাপিত-বন্ধ নীতি" চালু হয়। ইংল্যাণ্ডের বড় বড় জমিদারদের এজেন্ট বা নায়েব, তাঁদের আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রজার খাজনা হ্রাস করতে অস্বীকার করায় ১৮৮০ সেপ্টেম্বর ২৪-এ থেকে বয়কট (Charles C. Boycott)-কে 'বয়কট' করা হয়। ভাড়া-করা সশস্ত্র শ্রমিক সাহায্যে শস্য-সংগ্রহ সম্ভব হলেও, বয়কট-সাহেবকে জমিদারী থেকে চিরতরে প্রস্থান করতে হয়েছিল।

১৮৮১-তে ডেভিট-এর ল্যাণ্ড-লীগকে দমন করে দেওয়া হয়।

ফেনিয়ানদের দৌরাত্ম্য চরমে ওঠে। তাদের এক অংশ 'আইরিশ ইনভিন্‌সিব্‌ল্‌স' (Irish Invincibles) ফিনিক্স পার্ক (Phoenix Park)-এ ক্যাভেণ্ডিস (Frederick Cavendish) ও বার্ক (Thomas Henry Burke)-কে ১৮৮২ মে ৬-ই (সন্ধ্যা ৭-৮-টা) ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ঘটনার আট মাস পরে বিশ জন আসামী খাড়া করে পাঁচ জনের ফাঁসি, তিন জনের যাবজ্জীবন কারাবাস এবং নয় জনকে বিবিধ গুরুতর সাজা দেওয়া হয়। এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিল ক্যারী (James Carry)। কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই কেপটাউন থেকে নাটাল যাবার জাহাজে এক রাজমিস্ত্রী ও' ডোনেল (Patrick O' Donnell) ক্যারীকে গুলি করে হত্যা করেন। ওদিকে লণ্ডনে ও' ডোনেলের ফাঁসি হয়।

পার্নেলের যশ যখন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর প্রভাবও অসীম তখন তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে সেই জেলের নামানুসারে ১৮৮২ এপ্রিলে যুদ্ধলিপ্ত দুই দেশের মধ্যে 'কিলমেন্‌হ্যাম (Killmenham) সন্ধি' স্থাপিত হয়।

কিছু কিছু শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল। ১৮৮৬ মার্চে গ্লাডষ্টোন (William Ewart Gladstone)-এর প্রথম আয়ার্ল্যাণ্ড শাসন সংস্কার আইন উত্থাপিত হয় এবং পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় বিল্‌ কমন্স কর্ত্তৃক গৃহীত হবার পর হাউস অফ্‌ লর্ডস্‌ তাকে আর পাশ করে না।

১৮৯৬ সালে কোনোলি (James Connolly) তাঁর 'সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি' (Socialist Republican Party) ও 'আইরিশ সিটিজেন্‌স আর্ম্মি' (Irish Citizens Army) গঠন করেন। কিছুকাল এরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সঙ্ঘ ভবিষ্যৎ সংগ্রাম-বিধির ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ফেনিয়ানদের কর্ম্মকাণ্ডের তৃতীয় ধারা ১৯০৭ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত বলে

ধরা যেতে পারে। ক্লার্ক (Thomas James Clarke) এবং ও' কেলি (Sean Thomas O' Kelly) ধীরে ধীরে 'আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' (Irish Republican Brotherhood)-এর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে চলেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালে ও' কেলির উদ্যোগে 'সিন্ ফিন্' (Sinn Fein)—'আমরা নিজেরা'—'All Ourselves' দল গড়ে ওঠেছিল। এখানে মনে রাখতে হবে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগরক্ষাকামী 'আলষ্টার দল' (Ulster Unionists) 'আলষ্টার ভলাণ্টিয়ার্স' (Ulster Volunteers) চমূ সৃষ্টি করলে, ১৯১৩ সালের নভেম্বরে রেডমণ্ড (John Edward Redmond)-এর উৎসাহে 'আইরিশ ভলাণ্টিয়ার্স' (Irish Volunteers) দল গঠিত হয়। ১৯১৩ সাল থেকে ক্লার্ক আর ও' কেলি অধিক মাত্রায় সিন্-ফিন্দের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

'আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' ১৯১৪ সেপ্টেম্বর থেকে 'আইরিশ ভলাণ্টিয়ার্স'-এর মারমুখী দলকে অধিক মাত্রায় সমর্থন জানাতে থাকে এবং পিয়ার্স (Pedraic Pearse) ও প্লানকেট (James Mary Plunkett) প্রমুখ কয়েকজন প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

এই সময় ইংরেজ জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। রেডমণ্ড ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দ্দেশ দেন। তখন 'আইরিশ ভলাণ্টিয়ার্স' বা 'ন্যাশনাল ভলাণ্টিয়ার্স' সম্মত হলেও, উগ্রপন্থীরা ইংরেজের বিপদের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে চলে এবং 'ফেনিয়ান আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' (Fenian Irish Republican Brotherhood) গঠন করে আপন পথে চলতে থাকে।

বিদ্রোহী নেতারা আমেরিকাবাসী আইরিশদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বহুলাংশে সফল হয়। অপরদিকে জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগসাজসে অস্ত্র-আমদানীর ব্যবস্থাও চলতে থাকে। ১৯১৪ এপ্রিল লার্ণে (Larne)-তে ও ২৬ জুলাই হাউথ (Howth)-এ জার্ম্মান অস্ত্র নামাবার চেষ্টা আংশিক সফল হয়েছিল।

যুদ্ধ যখন পেকে উঠেছে, তখন নানা বাধা সত্ত্বেও ১৯১৪ মে ২৬-এ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'হোম রুল বিল্' পাশ করে এই সর্ত্তে যে, ঐ বিলের নির্দ্দিষ্ট বিধান যুদ্ধান্তে আয়ার্ল্যাণ্ডে কার্য্যকরী হবে। কিন্তু 'ফেনিয়ান আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' ও 'সিটিজেন্স আর্ম্মি' কালবিলম্ব না করে প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

কেস্‌মেণ্ট (Roger Casement) যুদ্ধের পূর্ব্ব থেকেই জার্ম্মানীতে অস্ত্র সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। নরওয়ের পতাকা উড়িয়ে জার্ম্মান জাহাজ (Aud) আয়ার্ল্যাণ্ডের কেরি (Kerry) উপকূলে এসেছিল ১৯১৬ এপ্রিল ২০-এ, আর তার সঙ্গে জার্ম্মান সাবমেরিনে ছিলেন স্বয়ং কেস্‌মেণ্ট। পূর্ব্ব হতে সংবাদ পেয়ে জাহাজ আটক করা হয়। কেস্‌মেণ্ট ধরা পড়েন এপ্রিল ২০-এ। তাঁর ফাঁসি হয় ১৯১৬ আগষ্ট ৩-রা।

এসকল ঘটনার পর বিদ্রোহীদের আর পিছোবার উপায় ছিল না। তখন

ক্লার্ক (Thomas James Clarke), ম্যাক্ ডিয়ারমাডা (Sean Mac Diarmada), পিয়ার্স (Pedraic Henry Pearse), কোনোলি (James Connolly), ম্যাক্‌ডোনাঘ (Thomas Magdonagh), সিঁয়া (Eammon Ceant) ও প্লাঙ্কেট (Joseph Mary Plunkett) এই সাত জনের নামে ডাবলিন জেনারেল পোষ্ট অফিস থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। দেড় হাজার সৈনিক সব ঘাঁটি দখল করে বসে ১৯১৬ এপ্রিল ২৪-এ (Easter Monday) ; আর এপ্রিল ২৯-এ পর্য্যন্ত তারা সমানে লড়াই করে দিনান্তে আত্মসমর্পণের বিষয় ঘোষণা করে।

প্রায় তিনশত যোদ্ধার জীবনান্ত ঘটে। উপরে বর্ণিত সাতজন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে আরও নয়জনকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় ৩-রা হতে ১২-ই মে তারিখের মধ্যে। পঁচাত্তর জনের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করা হয় এবং দুই-সহস্রাধিক বিপ্লবী বিনা বিচারে বন্দী হন।

এই সময় কয়েকটি পত্রিকা বিদ্রোহ-প্রচারকার্য্যে দেশের মধ্যে আগুন ছড়াতে থাকে। আগে ছিল ডেভিট্-এর 'নেশন' (Nation)। তাকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। পরে আসে ল্যালর-পরিচালিত 'আইরিশ ফেলন' (Irish Felon)। ইংরেজ খুব বিব্রত হয়ে পড়ে তাদের বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে ছিল 'সিন্ ফিন্' (Sinn Fein) ; এটি হ'ল দলের মুখপত্র। আরও যারা এ-পথের যাত্রী তার মধ্যে 'আইরিশ ওয়ার্কার' (Irish Worker) ছিল। এ দু'খানিও যথারীতি বন্ধ হ'ল। বিরাম নেই ; দেখা দিল 'আইরিশ ভলান্টিয়ার' (Irish Volunteer), 'স্পার্ক' (Spark), 'হিবারনিয়ান' (Hibernian), 'ন্যাশনালিটি' (Nationality) প্রভৃতি। সকলের মধ্যে প্রধান ছিল 'আইরিশ ভলান্টিয়ার'। এতে প্রকাশ্যভাবে গরিলা-যুদ্ধের ধরন-ধারণ, রীতি-পদ্ধতি প্রচার করা হ'ত। আত্মগোপন ও শত্রুকে অতর্কিতে ধরে গুম্ করে রাখার কায়দাকানুন শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আবার, এদেরও আগে ছিল কোনোলি-র 'ওয়ার্কার্স রিপাবলিক' (Workers Republic)—এটিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বললে অত্যুক্তি হয় না। আর, এরই সহায়তায় কোনোলি শ্রমিকদের কেবল সঙ্ঘবদ্ধ করা নয়, রীতিমত ঘোর ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইষ্টার-বিদ্রোহের পর ১৯২০-তে 'গভর্ণমেণ্ট অফ্ আয়ার্ল্যাণ্ড এ্যাক্ট' (The Government of Ireland Act) পাশ হয়। এখানেই আলষ্টার দলের সৃষ্টি ; এরা ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। সিন্-ফিন্ দল এ আইন অমান্য করে এবং সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ফলে, ১৯২১ ডিসেম্বর ৬-ই 'আইরিশ ফ্রি ষ্টেট' (Irish Free State) জন্মলাভ করে এবং গ্রিফিথ (Arthur Griffith) 'ডেল এরান' (Dail Eireann)-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২১—২৩ সালে খুব অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং প্রথমের দিকেই উগ্রদলের অন্যতম প্রধান সংগ্রামী কলিন্স (Michael Collins) নিহত হন। কস্‌গ্রেভ (William Thomas Cosgrave) তখন শাসনভার গ্রহণ করেন।

এর পরের ঘটনা বিবৃত করার আর প্রয়োজন নেই। তখন ভারতবর্ষ প্রথম পর্ব্বের সংগ্রাম শেষ করে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মডারেটদের রাজনীতির সমাধি হয়ে গেছে বলা চলে।

সার্বিয়া

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান বাঙ্গালীর নজর প্রায়ই এড়িয়ে যেতে পেত না।

সার্বিয়া থেকে সংবাদ পৌঁছাল—সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার (Alexander Obrenovic)-এর রাজ্যের প্রজা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তিনি রাজ্ঞী ড্রাগা (Draga)-র প্রভাবে পড়ে দেশকে দেশ শান্তির সমাধিস্তূপে (?) পরিণত করেছেন এবং প্রজাগণ সে-অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। প্রজারা দুর্দ্দান্ত শাসকের অপসারণের জন্য উপায় খুঁজতে লাগলো ; গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। ১৯০৩ জুন ১১-ই সম্রাট আলেকজাণ্ডার, পত্নী ড্রাগা, প্রধানমন্ত্রী, সমর-সচিব এবং সম্রাটের দুই ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনভার বিপ্লবী সেনানায়কদের হাতে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত চরম-মতাবলম্বী দলপতিকে আহ্বান করে তাঁর ওপর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়।

রাশিয়া

অত্যাচারীব বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর যাত্রা এইভাবে শুরু হয়েছিল। পরবৎসর, ১৯০৪ জুলাই ২৪-এ ঘটনার ক্ষেত্র রাশিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। তখন রুশসম্রাট ও পার্ষদদের অত্যাচারে রাশিয়া একেবারে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সাধারণ নাগরিকের ধন, মান, স্বাধীনতা, জীবন কিছুই নিরাপদ ছিল না। সন্ত্রাসের রাজত্ব দেশকে অভিভূত করে ফেলেছিল। তখন সমস্ত বিপদ ও নির্য্যাতনের আতঙ্ক উপেক্ষা করে দেশে বিদ্রোহীসঙ্ঘ, প্রধানতঃ 'নিহিলিষ্ট' (Nihilist) দল গড়ে উঠেছিল। সকলপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংস করাই হয়েছিল এদের ব্রত। অত্যাচারের অনুপাতে গুপ্ত-সমিতির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। রুশ-জাপান বিরোধের কালে এদের প্রভাব ও উৎপাত চরমে উঠেছিল।

গুপ্তহত্যার লীলা আরম্ভ হয় ১৯০১ সালে। প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বোগোলেপফ্ (Bogolepoff) ও সিপিয়াজিন (Sipyagin)—এই দুই প্রভাবশালী সচিবকে যথাক্রমে ১৯০১ ও ১৯০২ সালে হত্যা করা হয়। পরেই স্বরাষ্ট্র (Minister of the Interior)-বিভাগের দুর্দ্দান্ত পারিষদ ডি' প্লেভে (D' Plehve)-কে হত্যা করা হয় ১৯০৪ জুলাই ২৪-এ। আরও কয়েকটা খুনখারাপি হয়েছে। দেশ প্রায় অরাজক অবস্থায় পৌঁছেচে। প্লেভের ঘটনা

নিয়ে ভারতের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা কার্য্যের সমর্থন জানিয়ে আলোচনা করে। সে-সকল লেখা বিশ্লেষণ করলে ভারতের উগ্রপন্থীদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে হত্যাকারী প্রাণভিক্ষা করেননি। জোরের সঙ্গে তাঁর ছ'দফা দাবী পেশ করেন। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত লোকসভা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, নির্য্যাতন ও নিবর্ত্তনমূলক আইনের প্রত্যাহার, জাপানের সহিত যুদ্ধবিরতি, দুর্ভিক্ষরোধের সুব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কারণে বন্দীসকলের মুক্তি এই কয়টি অশান্তির কারণ দূর করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলে প্রকাশ করা হয়।

একেবারে ভারতবর্ষের দাবীর প্রতিচ্ছবি। ১৯০৪ আগষ্ট ২৬-এ তিলক-বন্ধু পারাঞ্জপের পত্রিকা 'কাল' লিখে বসলো—"নিহিলিষ্টদের দাবী পড়লে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্রতিনিয়ত ভারতে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, আর ভারত সরকার তিব্বতের সঙ্গে যুদ্ধ চালিযে যাচ্ছে গত কয়েক বৎসর ধবে। পরিতাপের বিষয়, দুর্ভিক্ষ-বোধ ও যুদ্ধ-পরিসমাপ্তির জন্য ভারতে নিহিলিষ্ট নেই।"

'গুপ্তহত্যার শিক্ষা' (The Educative Value of Murder) শিরোনামায় ২-রা সেপ্টেম্বর 'কাল' লিখেছিল—"রাজনৈতিক ও সাধারণ হত্যা কখনই এক নয়। যখন কোনও রাজা বা প্রধান অমাত্যরা নিহত হন, তখন সাবা পৃথিবীতে তার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। এরূপ হত্যার সংবাদে কোনও উল্কার আবির্ভাব বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেব মতই মনকে অভিভূত করে ফেলে।...... এজাতীয় হত্যায় কাবও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা নীচ জিঘাংসা-বৃত্তির চরিতার্থতার গন্ধ নেই। সমাজ বা রাষ্ট্রের বিষাক্ত অংশকে বিদায় করে অবশিষ্ট অংশের স্বাস্থ্যরক্ষাই এরূপ হত্যার মহদুদ্দেশ্য বলে মনে করা যেতে পারে। ভণিতা ছেড়ে দিলে বলতে হয়, এ হত্যা-প্রচেষ্টা প্রমোদমত্ত, বিলাসমগ্ন, এবং অনাচারের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারী ধনীর বিরুদ্ধে। প্রত্যুত, এটা নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, সহায়সম্বলহীন হতভাগ্যের কর্ণবিদারক কাতর রোদনধ্বনি। এরূপ হত্যায় কোনও গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই। জগতের কল্যাণেই এসকল ঘটনা সংসাধিত হয়। প্রথমে কিছু অজানা থাকলেও, স্বল্পকালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী এর সুফলের অংশভাগী হয়।"

'কাল' বলেছিল, অনাচারের প্রসূতফল হিসাবে প্লেভের হত্যাকে গ্রহণ করতে হবে। নানা প্রকারে পত্রিকাখানি এই হত্যাকে সমর্থন জানিয়েছে। যে গুপ্ত-সমিতির মনোভাব দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে ইন্ধন যোগ হয়েছে মাত্র। একেবারে ঘরের কথায় এনে তিলক বলেছেন—"কার্জ্জনের সঙ্গে তুলনা করলে প্লেভের অত্যাচার-তালিকা অতি ক্ষুদ্র বলেই মনে হবে।" অপরাপর অনেক পত্রিকা এই তালে তাল দিয়েছে ; বিস্তৃত আলোচনার আর প্রয়োজন নেই।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রধান কর্ম্মচারী নিহত হওয়া এবং রাজ্য-পরিচালনায় ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির আশঙ্কায় সম্রাট প্রথম নিকোলাস (Nicholas I) ১৯০৫ অক্টোবর

১৭-ই জনপ্রতিনিধি এক সভা (Duma) গঠন করতে বাধ্য হন এবং নানাক্ষেত্রে যাতে স্বাধীনভাবে কর্ম্মপরিচালনার বাধা বিদূরিত হয়, তার আদেশ জারি করেন। শাসক ও শাসিতেব মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ না থাকলে দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে অমঙ্গল বৃদ্ধি পাবে। অতএব রুশসম্রাট নাগরিকদের ব্যক্তিগত পূর্ণ নিরাপত্তা, বিবেকপূত কাজ, ভাষণ, মিলন, সঙ্ঘ-গঠন করবার স্বাধীনতা মেনে নেন। ডুমার অনুমোদন ব্যতীত কোনও আইন বলবৎ হবে না, সে কথা ঐ সঙ্গে প্রচারিত হয়। সর্ব্বশেষ, সকলের সহযোগিতা, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম মিলিত হয়ে রুশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিয়োজিত হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন, বলে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

এসকল সংবাদ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছুলে বিপ্লবীদের প্রাণে বল-সঞ্চার হয়। অত্যাচারী রাজশক্তি যে "শক্তের ভক্ত" এই নীতি-প্রচাবে উৎসাহী কর্ম্মীরা লেগে যান এবং দেশের মধ্যে নবপ্রেরণার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রুশ-জাপান সমর

এসকলের চেয়ে রুশ-জাপান যুদ্ধ ভারতীয় মনকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মাত্রায় আলোড়িত করেছিল। রাশিয়া তখন বিরাটকায় মহাবলশালী দৈত্য বলে পরিগণিত হ'ত ; আর, জাপান পীতকায়, ক্ষুদ্রাকৃতি, দুর্ব্বল, "বামন" এশিয়াবাসী—এক নগণ্য শক্তি। "কালায়-ধলায়" মর্য্যাদাব লড়াই সারা পৃথিবীব কাছে এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা এবং সমস্ত শ্বেতচর্ম্মধারী ও অশ্বেতকায় জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বিপরীত স্বার্থে অধীর আগ্রহে ফলাফল লক্ষ্য করছিল।

শস্ত্রের ঝনৃঝনা মাত্র সবে শুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের বিলম্ব আর কতটা তখনও কল্পনার পর্য্যায়ে ঝুলছে। সে সময় 'ট্রিবিউন' (১৯০৩ নভেম্বর ১২-ই) লিখেছিল—"ক্ষুদ্রাকৃতি জাপান কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে অসম এক দৈত্যের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে। শেষ পর্য্যন্ত জাপান জয়ী হলে সমগ্র এশিয়া রক্ষা পাবে ; তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না ; মর্য্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র জাপান দূর প্রাচ্যে প্রভাতী তারার জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে ; এর দ্বারা সমগ্র এশিয়ার জনজাগরণ সূচিত হচ্ছে।"

প্রায় তিন মাস পরে রুশ-জাপান কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়, ১৯০৪ ফেব্রুয়ারী ৭-ই। পরদিনই জাপান পোর্ট আর্থারে অবস্থিত রুশ-নৌবহর আক্রমণ করে ; আর যুদ্ধ বিঘোষিত হয় ফেব্রুয়ারী ১০-ই। ফেব্রুয়ারী ১৮-ই জাপানী সৈন্য কোরিয়ার ভূমিতে অবতরণ করে। কুরোকি (Kuroki)-তে গুরুতর সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল এপ্রিল ২৬-এ, আর মে ১-লা রুশ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। মে ২৬-এ দ্বিতীয় প্রচণ্ড স্থলযুদ্ধ হয় এবং দু'পক্ষের ষোলো-ঘণ্টা-ব্যাপী নিদারুণ রক্তক্ষয় ও

জীবননাশের পর বিজয়লক্ষ্মী জাপানের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেন। আগষ্ট ১০-ই দু'পক্ষের প্রচণ্ড নৌসংগ্রামে জাপানের অচিন্তিতপূর্ব্ব জয় বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়।

বছর শেষ হ'ল; ভাগ্যলক্ষ্মী দোদুল্যমানা, যদিও জাপানের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত প্রদর্শন করছেন। কিন্তু ১৯০৫ জানুয়ারী ২-রা রুশ নৌবহর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মার্চ ১০-ই জাপানীরা মুক্‌ডেন (Mukden) দখল করে। এখানে ৫০,০০০ জাপসৈন্যের প্রাণ-বিনিময়ে জাপানীরা প্রতিপক্ষের ৩০,০০০ সৈন্যের প্রাণনাশ ও ৪০,০০০ সৈন্যকে বন্দী করে। সে সংবাদে এশিয়া উল্লসিত হয়ে উঠে।

আরও যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেটা সংঘটিত হয় ১৯০৫ মে ২৭-এ—নৌ-সেনাপতি টোগো (Heihachuro Togo) জাপানীদের উদ্দেশে বলেছিলেন—"এই দিনের যুদ্ধে জাপান সাম্রাজ্যের সকল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যে পদে যে আছ, তোমার জীবন দিয়ে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হবে বলে আমি ভাবতেও পারি না।"

যুদ্ধারম্ভের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফলাফল সম্বন্ধে সকল অনিশ্চয়তা কাটিয়ে জাপানের জয়জয়কারে সমগ্র এশিয়া প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার পরাজয়ের অবশিষ্ট যা ছিল সেটা জাপানীরা ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন করে।

এইবার সন্ধি-প্রস্তাব; ঘটক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt)। ১৯০৫ আগষ্ট ৫-ই 'মে ফ্লাওয়ার' (May Flower) জাহাজের ওপর রুশ-পক্ষে উইটে (Sergius Witte) ও রোজেন (Baron Rosen) আর জাপ-পক্ষে কোমুরা (Baron Komura) ও তাকাহিরো (Togoro Takahiro) সন্ধিসর্ত্ত আলোচনা করতে থাকেন। খসড়া মনোনীত হলে, আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার (New Hampshire)-এর পোর্টস্‌মথ (Portsmouth)-এ মিলিত হয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, ১৯০৫ আগষ্ট ২৯-এ।

ভারতবাসী এ যুদ্ধকে অত্যন্ত নিজের বলে মনে করেছে। যুদ্ধে আহত ও নিহত জাপানী সৈন্যের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে পথে পথে অর্থসংগ্রহ করেছে। অপরপক্ষে ইংরেজ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গজাতি রাশিয়ার প্রতিটি বিপর্য্যয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে—এই জয় সমগ্র দুর্ব্বল জাতির চিত্তে যে সাহস দান করবে, তাতে ভারতবাসীরা একদিন ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে বদ্ধ-পরিকর হবে।

কার্জ্জন-সাহেব বলে উঠেছিলেন (১৯০৮ জুলাই ১-লা),—"মৃদুগুঞ্জনে (সভয়ে ঘরোয়া বৈঠকে) সাধারণ লোকসমাগমস্থলে আলোচিত এই বিজয়-সংবাদ বজ্রনির্ঘোষের মত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।" (The reverberations of that victory have gone like a thunderclap through the whispering galleries of the East.")

বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন তখন বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক যে-সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভারতের হৃদয়ে বা বাহুতে বল সঞ্চার করেছে, তার মধ্যে রুশ-জাপানের যুদ্ধ সর্ব্বপ্রধান বলে গৃহীত হয়ে থাকে।

পোর্টুগাল

পোর্টুগালেব রাজপথে যুবরাজকে নিয়ে সম্রাট কার্লোস (Dan Carlos) চলেছেন—এমন সময় গুপ্তঘাতক অতর্কিতে আবির্ভূত হয়ে দু'জনকেই হত্যা করে ১৯০৮ জানুয়ারী-তে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পত্রিকা, যেমন 'অরুণোদয়' (১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ৯-ই) বলে উঠলো—"এই ঘটনা হতে সকল দেশের যথেচ্ছাচারী রাজার শিক্ষালাভ করা উচিত যে, যাঁর যত শক্তিই থাকুক, তাঁর পক্ষে তরবারি-সাহায্যে উৎপীড়িত প্রজাদেব চিরকাল শাসনে রাখা সম্ভব নয়।" 'বিহারী' পত্রিকা (১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ১০-ই) লেখে—"অতি পরিতাপের বিষয় দুর্ব্বল ভারতবাসী এ থেকে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করছে না—'সজীব থাকিলে এখনই উঠিত' এবং পোর্টুগাল-নাগরিকদের মত অত্যাচারীকে অপসারণ করে দেশে শান্তি স্থাপিত করতে পারতো।" অপরাপর অনেক পত্রিকাও এই সুরে গান গেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশের প্রারম্ভে পৃথিবীতে অত্যাচারীর দমন, স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা বা এতৎসংক্রান্ত যে-সকল ঘটনা ঘটে সে-সব সতর্ক লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কোনও-না-কোনও পত্রিকায়, বা নেতার ভাষণে অথবা লেখায় তার আভাস পাওয়া গেছে। মাত্র যেগুলি প্রধান, তারই উল্লেখ করা হ'ল।

মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক হতেই জাতীয় ভাবধারা বাঙ্গলায় উৎপত্তিলাভ করলেও বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার ও কার্য্য-প্রয়োগ-ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রকে সম্মানের আসন ছেড়ে দিতে হয়। মহারাষ্ট্রশক্তি ইংরেজের হাতে মার খেয়ে বেশ হীনবল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে তেজ একেবারে অন্তর্হিত হয়নি।

সিপাহী-সংগ্রামে মহারাষ্ট্রের নানা সাহেবের একটা বিশিষ্ট অংশ ছিল। তার পর দেখা দিলেন চিৎপাবন-ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কে। ইংরেজ-উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। রামোসী এবং অন্যান্য অরণ্যচারী জাতিদিগকে একত্র করে তিনি প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেন। ১৮৭৯ সালে তাঁর দলের আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠিত হতে থাকে। ইংরেজ রাজশক্তি একেবারে বিব্রত বিপন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ অসম দ্বন্দ্ব খুব বেশীদিন আর চলেনি। রণক্লান্ত বাসুদেব (১৮৭৯ জুলাই ২০-এ) বিজাপুরের মধ্যে দেভার নাভাডগিতে ধরা পড়েন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম, রাজদ্রোহ, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নভেম্বর ৭-ই তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্টের শুনানির পর ডিসেম্বর ১৮-ই তাঁর আপীল নাকচ হয় এবং 'তেহরান' জাহাজ সাহায্যে ১৮৮০ জানুয়ারী ৩-রা তাঁকে এডেন দুর্গে পাঠিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।

এ কারাবাস তাঁর মৃত্যু অপেক্ষা ক্লেশদায়ক। নিশ্চেষ্ট তিনি থাকেননি, প্রায় দশ মাস পরে অক্টোবর ১২-ই তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন। জেলখানায় অনশন বা অর্দ্ধাহার, নানা নির্য্যাতনের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বনের সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় থাকলে যা হয়, তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুর্ব্বল ক্ষীণ শরীর; অপরিচিত স্থান, কয়েদীর বেশে তিনি খুব বেশী দূর যেতে পারেননি; মাত্র দশ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ে যান। ভারতের স্বাধীনতা-লাভ-প্রচেষ্টার অক্লান্ত বীর ১৮৮৩ ফেব্রুয়ারী ১৭-ই তারিখে কারাগৃহে লোকচক্ষুর অন্তরালে শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। ভারতমাতার কণ্ঠে বন্ধনের ফাঁস আরও দৃঢ় হয়ে চেপে বসে।

এর পর প্রায় দশ বৎসর মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে আসে যেন নব প্রেরণায় জেগে উঠবে বলে। তিলক-মহারাজ ও তাঁর সামান্য দু'তিনটি সহকর্ম্মীর চেষ্টায় আবার ধূমায়িত বহ্নি শিখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রারম্ভিক প্রস্তুতি ঠিক ফাড্‌কে-অনুসৃত পন্থায় নয়, হয়েছিল আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার শুভ প্রচেষ্টায়।

১৮৯৩ সালে বোম্বাই প্রদেশে উৎকট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। সংখ্যায় বেশী হয়েও মুসলমানদের হাতে হিন্দুর পক্ষে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। সে-সময় চিন্তাশীল লোকে এই দুর্দ্দশার মধ্যে একটি কারণ আবিষ্কারে সমর্থ হন। দেখা গেল অন্য সব শক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে বিপক্ষের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় পরাঙ্মুখতা একটা বড় দুর্ব্বলতা।

একটা উপলক্ষ না থাকলে মিলনের ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। মুসলমানদের মহরম আছে, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি (গুপ্তশক্তির আধার) দেবদেবী বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকলেও, একটি বড় মিলনের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেননি। বিভিন্ন দেব-দেবীর অজস্র বিভিন্ন উপাসক বা ভক্ত। তাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদের অন্ত নেই। তার ওপর দেব-সেবা, ধর্ম্মাচরণ সব আত্মিক ব্যাপার, বাহ্যিক নয়। এর ভিতর সংবর্ষের চিন্তা স্থান পায় না। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বারে বারে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে এবং তার ফল হয় অতি শোচনীয়।

এতদবস্থার প্রতিকারের জন্য একটা সর্ব্বসাধারণের পূজার কথা চিন্তাশীলের মাথায় এসেছিল। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশপূজা মহারাষ্ট্রে অনাড়ম্বরভাবে প্রচলিত ছিল। দাঙ্গার পরবৎসর (১৮৯৪ সাল) এই পূজার প্রকৃতিতে নতুন ধাঁচ বা নতুন ধরন এবং একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সংযোজিত হয়েছিল। ঐ বৎসরে কার্য্যসূচী বেশ পাকা হয়ে উঠলে, ১৮৯৫ সাল হতে একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার হয়ে ওঠে।

গণপতিকে মহারাষ্ট্রীরা গজাসুর-বিজয়ী বলে মনে করে। (অবিভক্ত) বাঙ্গলাদেশে পৌরাণিক গল্পে স্বয়ং মহেশ্বর গজাসুর-নিহন্তা। তিলক ও তদ্‌বন্ধু (শিবরাম মহাদেও) পারাঞ্জপের উদ্দীপনায় ও নির্দ্দেশে গণপতি উৎসব ধর্ম্মমত-নির্ব্বিশেষে সকলকে একত্র করে সর্ব্বজনীন উৎসবে পরিণত করা হয়। প্রচ্ছন্ন অর্থপূর্ণ শ্লোক আবৃত্তির সঙ্গে লোকে গ্রাম পরিক্রমা করতো। তার মুখ্য অর্থ গ্রহণে কারও অসুবিধা হ'ত না। কতগুলি 'গাথা' প্রকাশ্যেই শ্বেতাঙ্গ-হত্যা সমর্থন করতো এবং অনিবার্য্য আগামী সংগ্রামের আবাহন জানাতো।

এইভাবে যখন কয়েক বৎসর চলছে তখন নেতারা ভাবলেন, মনকে ধরে রাখতে হলে সামনের আদর্শ দেবতা হতে তাঁকে মানুষের পর্য্যায়ে আনা একান্ত প্রয়োজন ; তাঁদের লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হলে কর্ম্মপ্রেরণা আসবে বেশী। মহারাষ্ট্রীয়দের মনে শিবাজি-চিত্র তখনও জাজ্বল্যমান। মহারাজ দেহত্যাগ করেন রায়গড় দুর্গে ১৬৮০ সালের এপ্রিল ১৪-ই। সে-দুর্গের তখন অতি জীর্ণাবস্থা ; সংস্কার হয়নি বহুকাল। সুতরাং শিবাজি-মহারাজের স্মৃতির প্রতি যে চরম অসম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে সে-কথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মন দারুণ ভাবে বিচলিত হয়ে উঠলো।

তিলক রায়গড়ের দুর্গ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে 'শিবাজি উৎসব' প্রচলিত করলেন। প্রথম উৎসব অনুষ্ঠানের স্থান নির্ব্বাচনে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যায়। তিলক বললেন, রায়গড় দুর্গ ছাড়া সারা মহারাষ্ট্রে আর কোনও স্থান উদ্দেশ্যের পক্ষে বেশী উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। এর পর বক্তৃতায় যখন তিলক স্পষ্টভাবেই বলে দিলেন (‘কেশরী’, ১৮৯৭ জুন ১৫-ই) যে, আফজল খাঁ হত্যায় শিবাজি কোনও পাপ করেননি; ন্যায্য পথই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদাহরণটি বড় চমৎকার ঃ ঘরে যদি দস্যু ঢোকে এবং তাকে অন্য উপায়ে জব্দ করার বিশেষ অসুবিধা থাকে, তখন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পুড়িয়ে মারাই যুক্তিযুক্ত। বলা বাহুল্য, এই লেখার অপরাধে তিলকের কারাদণ্ড হয়েছিল। অপরাপর মারাঠা-পত্রিকার সুব কোনটাব নরম, আর কোথাও-বা বেশ গরম হয়ে ফুটে বেরিয়েছিল।

নূতন প্রেরণা জেগেছিল যুবকদের মনে। শরীর-চর্চা, নানাবকম ক্লেশকর ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, তরবারি-লাঠি-ছোবা খেলা, আক্রমণ ও প্রতিরোধের কলাকৌশল শিক্ষা প্রভৃতি এসে উৎসবেব অঙ্গ হিসাবে আবির্ভূত হ’ল।

এ প্রবাহ বাঙ্গলায় এসে পৌঁছেচে একটু পরে। তার বিবরণ দেবার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা-লাভের চেতনা যে ফল প্রসব করেছিল এবং পরে যা ভারতের নানা স্থানে সম্ভব হয়েছিল, সে গুরুতর ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া সমীচীন।

সাক্ষাৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ না হলেও, যে ঘটনা ভারতে তার প্রচণ্ড প্রভাবে আত্মপ্রকাশ কবে, সেটা হচ্ছে ১৮৯৬ সালে বোম্বাইতে প্লেগের আত্মপ্রকাশ এবং তৎসংক্রান্ত সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ। হু-হু করে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে, লোক প্রাণভয়ে সহর গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে—মৃতের অন্ত্যেষ্টির দিকে মনোযোগ দেবার সময় পর্য্যন্ত নেই। এ-সময় গভর্ণমেণ্ট প্লেগ-নিরাকরণ-কল্পে এক কমিশন সৃষ্টি করলো এবং তার কমিশনার হলেন র্যাণ্ড (Walter Charles Rand) নামক এক হৃদয়হীন ইংরেজ। ইনি ছিলেন সাতারার এ্যাসিষ্টাণ্ট কালেক্টর। তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় সে-অঞ্চলের লোক উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল।

প্লেগ-কমিশনার হিসাবে র্যাণ্ডেব হৃদয়হীনতা, অনভিজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতা ফুটে বেরুতে মোটেই বিলম্ব হয়নি। হিন্দু-বিদ্বেষী র্যাণ্ড যেভাবে প্লেগ-নিবারণ-ব্যবস্থার শুভারম্ভ করলেন, সেটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। নানা স্থান থেকে অসহায়ের কান্না ভেসে উঠলো; পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে দিল।

রোগী খুঁজে বার করবার অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন কমিশনার-সাহেব। প্লেগ-অধ্যুষিত অঞ্চলে রোগীর সন্ধানে এসে পুলিশ ও মিলিটারী অকথ্য অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতে থাকে। যেখানে এই ‘অনুসন্ধান’-কার্য্য সুসম্পন্ন হ’ত, সেটা দেখে স্বতঃই মনে হয়েছে যে সবেমাত্র নির্ম্মম চেঙ্গিস্ খাঁ, মহম্মদ ঘোরী, তুঘলক বা তৈমুরলঙ্গ দেশ-লুণ্ঠন কার্য্য সমাধা করেছে। বাড়ী-ঘর তছ্‌নছ্‌, প্লেগ-

হাসপাতালে স্থানাভাব ও চরম অব্যবস্থা তো ছিলই, তার ওপর ছিল রোগী-পরীক্ষার ব্যাপারে অপরাপর আপত্তিকর প্রক্রিয়ার সঙ্গে রোগাক্রান্ত সন্দেহে রোগীর দেহ-পরীক্ষা-পদ্ধতি। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের ওপর শত শত পুরুষকে উলঙ্গ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত। মহিলা-সম্বন্ধে আদেশ ছিল—তাঁরা উপর-দেহের আবরণ বা চোলি (bodice) খুলে রাখবেন আর নিম্নাবরণ ঘাঘরা দু'হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে থাকবেন। এতে বগল ও কুঁচকি (উরু-তলপেট সঙ্গমস্থল) পরীক্ষার সময় কেবল চোখে দেখা নয়, হাত দিয়ে (গ্ল্যাণ্ড) টিপে পরীক্ষার সময় যেন অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়। প্রথম প্রবল আপত্তি আসে 'জ্ঞান সাগর' পত্রিকার পক্ষ থেকে (১৮৯৮ মার্চ ১১-ই): 'দেশ মিত্র', 'জ্ঞান প্রকাশ', 'কেশবী' একেবারে গর্জ্জে উঠেছিল। তিলক দেশের লোকের ঔদাসীন্যে গভীর ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করলেন, সহযোগিতার দ্বারা দেশীয় লোকের অহেতুক যন্ত্রণা দূর করবার প্রচেষ্টা করলেন ; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

'সুধারক' পত্রিকা (১৮৯৮ এপ্রিল ১৯-এ) ক্ষোভে ধিক্কার দিয়েছিলে যে, পুনার পুরুষের মত এত হীন জীব পৃথিবীব আর কোথাও দেখা যায় না। তখন (মে ৩-রা) নির্দ্দেশ দিলে—"আইন-ভঙ্গকারী অত্যাচারীকে সমুচিত শিক্ষা দাও এবং সকল অপকর্ম্মে প্রকাশ্য বাধা দান কর।" 'মহারাষ্ট্র মিত্র' (১৮৯৭ এপ্রিল ২৯-এ) ঘৃণিত পলায়ন-পন্থা ছেড়ে অত্যাচারী অনুসন্ধানকারী পুলিশকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হবার কথা লিখলো।

সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষা, নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বাধাদান ও আত্মরক্ষার পথ আত্মপ্রকাশ করেছিল ব্যাপকভাবে। এ সুপরামর্শ কার্য্যে পরিণত হতে কালবিলম্ব হয়নি। ১৮৯৭ জুন ২২-এ মহারাণীর শাসনের হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবের দিন পুনা গণেশ-খিন্দ অঞ্চলে তিন ভাই চাপেকর দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও ও বাসুদেও-সখা মহাদেব বিনায়ক রাণাডের ষড়যন্ত্র ও কর্ম্মকুশলতার ফলস্বরূপ র‍্যাণ্ড ও অপর এক সামরিক অফিসার লেঃ আয়র্ষ্ট নিহত হন।

র‍্যাণ্ড-হত্যাই ভারতে সর্ব্বপ্রথম সফল শাস্তি-প্রচেষ্টা। চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য ১৮৯৮ সালের কংগ্রেস এই ঘটনার ওপর যথারীতি নিন্দাসূচক মন্তব্য গ্রহণ করেছিল।

র‍্যাণ্ড কেবল নিজ মৃত্যু ডেকে আনেননি। একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করেছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে রক্তের প্লাবন ঘটাতে, জীবন নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে শিখিয়েছিলেন। স্বরাজের রুদ্ধদ্বারে চিড় খাইয়ে ভিতরটা দেখবার সুযোগ করেছিলেন। এর পূর্ব্বে শিক্ষিত নাগরিকদের উচ্চস্তরের এক শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজ ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জমে ছিল। কিছু প্লেগ-আক্রান্ত সন্দেহে রোগী-পরীক্ষা ও তৎসংক্রান্ত

বিলি-ব্যবস্থায় নিরক্ষর, দীন, রাজনীতি বা শাসন-যন্ত্রের গলদ বিষয়ে অনভিজ্ঞ নাগরিকও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারাও কায়মনোবাক্যে ইংরেজ শাসনের অবসান প্রার্থনা জুড়ে দিয়েছিল।

অবধারিত ফল ফলতে মোটেই বিলম্ব হয়নি। র‍্যাণ্ড-আয়র্ষ্ট হত্যাপরাধে দামোদর ও বালকৃষ্ণ দণ্ডিত হন। এঁদের ছোটভাই বাসুদেও ও সঙ্গী রাণাডে ধৃত হলেন—ষড়যন্ত্র ও দুটি গুপ্তচর হত্যার অপরাধে। দুই মামলায় চার জনের মৃত্যু-দণ্ডাদেশ হয় এবং দামোদর ১৮-ই এপ্রিল, বাসুদেও ৮-ই মে, রাণাডে ১০-ই মে এবং সর্ব্বশেষে বালকৃষ্ণ ১৮৯৯ মে ১২-ই ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনাহুতি দিয়েছিলেন।

সংক্ষেপতঃ এই হ'ল ইংরেজের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের বিজয়-অভিযান। একটি ঘটনা উপলক্ষ করে দু'জন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, চারজন দেশপ্রেমিক ও দু'জন দেশদ্রোহীর প্রাণনাশ হয়েছিল। আর ঘটে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্ব্বাসন ও তিলকের কারাদণ্ড। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রাপথ রক্তস্রোতে পিচ্ছিল হয়ে পড়েছিল, সেটা আগামী দিনের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পথের সঙ্কেত দিতেছিল।

শিবাজী-উৎসবই কুরুক্ষেত্র-সমরের মহাশঙ্খধ্বনি। বাঙ্গলায় ঘাঁটী তৈরী হয়ে উঠেছিল অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ, পি. মিত্র, ওকাকুরা ও সরলা দেবীর যুক্ত প্রচেষ্টায়। এই ১৯০২ সাল বাঙ্গলার তথা ভারতের মহা যুগসন্ধিক্ষণ। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শিবাজি-উৎসব বাঙ্গালীর কানে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। শিবাজি-মহারাজের "এক-ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি" হুঙ্কার সে-সময় বাঙ্গালীর অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলতে পারেনি। কবিগুরু তাই পরিতাপের সঙ্গে বলেছেন ঃ

"সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ—
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ—"

মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যে প্রারম্ভিক পরিচয় সেটা হয়েছিল বিদেশীর ইতিবৃত্ত সাহায্যে। তারা তোমায় "দস্যু বলি করে পরিহাস অট্টহাস্যরবে", সুতরাং "তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস এই জানে সবে"।

বাঙ্গালী সন্তান মাতৃক্রোড়ে শুয়ে শুনেছে—"ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে", আর কবি ক্ষোভ করে বলছেন—

"তোমার কৃপাণদীপ্ত একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্য্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা-
লুকানু তরাসে॥"

সুতরাং সে মহাসমারোহের দিন আমাদের কাছে নূতন আলো, নূতন উদ্দীপনা আনতে পারেনি। মহারাষ্ট্র-শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যেতে চক্ষের সামনে দেখেছিলাম মারাঠা-ইংরেজ তৃতীয় সমরে।

বাঙ্গলায় ১৯০২ সালে অনুষ্ঠিত শিবাজি-উৎসব সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। সম্ভবতঃ ১৯০০ সালেই অতি ধীরে শান্ত রূপে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকবে। তবে এটুকু জানা গেছে (Ram Gopal : *Lokmanya Tilak*, p. 108) ১৮৯৬ নভেম্বর ২২-এ হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সভাপতি করে কলিকাতায় 'শিবাজি উৎসব' পালনের আলোচনা হয়েছিল। ফুটে উঠতে একটু সময় লেগে যায়। বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০২ সালের শিবাজি-উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন [*Swadesh and Swaraj* (1954), p. 73] যে গতবৎসরের পূর্ব্ববৎসরে যখন শিবাজি-উৎসব বাঙ্গলায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি (বিপিনচন্দ্র) বলেছিলেন যে মহারাষ্ট্র-শক্তি-জোট সমস্ত হিন্দুর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের সূচনা করছে ("As we pointed out year before last, when the *Sivaji* celebrations were first started in Calcutta....") তখন এই ধারণা হয়েছিল যে এই উৎসবকে উপলক্ষ করে সারা ভারতব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠবে। ১৯০৩ জুলাই ১৭-ই কলিকাতায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সে-সম্বন্ধে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ঐ দিনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল—"ভারতে শিবাজি-উৎসব সকল জাতি ও শ্রেণীর যে একতার সূত্র বাঁধছে সেইটাই ইংরেজ শাসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'স্মৃতিস্তম্ভ' বলে মনে করা যেতে পারে" (অর্থাৎ কুশাসন-জর্জ্জরিত হয়ে ভারতবাসী ঐক্যস্থাপন করে ইংরেজের উচ্ছেদের চেষ্টা করছে)। ঐ দিনে ক্লাসিক থিয়েটার হল্-এ বিকালে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ বলেন—"ইংরেজ যখন তিলককে লৌহশৃঙ্খলে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করে, সেই সময় সাধারণ লোকে দেশের হিতব্রতী আত্মবলিদানকারী তিলকের শিরে স্বর্ণের রাজকিরীট পরিয়ে দিয়েছে।"

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কবিতা 'শিবাজি-উৎসব' রচিত হয় এবং ১৩১১ আশ্বিন-সংখ্যায় যুগপৎ 'বঙ্গদর্শন' (পৃঃ ৩১৮) ও 'ভারতী' (পৃঃ ৫৮০)-তে প্রকাশিত হয়। এই অনবদ্য কবিতায় বাঙ্গালীর অন্তরের ভাষা স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। বহুকাল আগে "তব ধ্বজা, সৈন্য, রণ-অশ্বদল, অস্ত্র খরতর" বিলীন হয়ে গেছে। "আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল 'হর, হর হর' " নিনাদ। কিন্তু আমরা দেখছি—

"তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ॥"

আর—

“ ··· বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা ॥”

সকল লজ্জা-সঙ্কোচ, সকল ক্ষোভ-শঙ্কা পরিহার করে বাঙ্গালী আজ এগিয়ে আসছে ‘শিবাজি উৎসব’ পালন করতে, শিবাজির আদর্শ সফল করতে তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য। তাই—

“মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
‘জয়তু শিবাজি’।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে,
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে ॥”

বলা বাহুল্য, কবিগুরুর উৎসাহ-বাণী পেয়ে শিবাজি-উৎসব আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯০৬ জুন ৪-ঠা থেকে ১২-ই ‘ফিল্ড এ্যাণ্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব’ মাঠে (‘পান্তির মাঠ’—বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল যে জমিতে অবস্থিত) শিবাজির আরাধ্যা দেবী ভবানীর বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত করে ধুমধামের সঙ্গে পূজা করা হয়। সহস্র সহস্র লোক সে-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। স্বয়ং তিলক ও বন্ধু খাপার্দে কলিকাতায় এসে পূজামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে বাঙ্গলাদেশে আচরিত শিবাজি-উৎসবের ধরন দেখে পরম পরিতুষ্ট হন। ৫-ই জুন ময়দানে এক বিরাট সভায় উপস্থিত হয়ে তিলক এক বক্তৃতা দেন, এবং একই উদ্দেশ্যে দুই অঞ্চলে সহযোগিতা যে পরম কাম্য সে-বিষয় উল্লেখ করেন। জুন ৭-ই কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে (আজাদ হিন্দ্ বাগ) সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্রীয় নেতৃদ্বয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

১৬-ই অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগ কার্য্যে পরিণত করা হলে, বাঙ্গলায় অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। তখন উগ্র কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের জন্য বাঙ্গালী যুবকরা মেতে ওঠে। শিবাজি-উৎসব তার উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। সভা-সমিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার দিন অপগত, সুতরাং দ্বন্দ্বের উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে উঠলো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে—অরবিন্দ মহারাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র বরোদায় বসে বাঙ্গলার বিপ্লবের কার্য্যসূচীর খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। তাঁর মন্ত্রগুরু ছিলেন ঠাকুর-সাহেব বলে পরিচিত, উদয়পুরের রাজন্যবর্গের পরিবারভুক্ত একজন। তিনি উত্তর ভারতে এক বিদ্রোহী দল গঠনে নিযুক্ত ছিলেন এবং মহারাষ্ট্রে যে শাখা অবস্থিত ছিল, তিনি ছিলেন তাঁর নেতা। অরবিন্দর সঙ্গে এ-কারণেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রভাব অরবিন্দর মন গড়ে তোলবার বিষয়ে কিছু কাজ করে থাকাই সম্ভব।

এসব ব্যাপারের সঙ্গে মনে পড়ে সখারাম গণেশ দেউস্করের কথা। তিনি মহারাষ্ট্র থেকে এসে বাঙ্গালায় অবস্থান করেন এবং কাজে-কর্ম্মে, ভাষায়-চিন্তায় এবং বিপ্লবী মন প্রস্তুত করার কাজে এক শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নানা দিক থেকেই মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গলার মিলন ভারতের বিপ্লবী সংগ্রাম শক্তিশালী করেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

INDEX

General Index

Associations

[*akhra, bhandar, club, Council, League, sabha, samaj, samiti, sammilani, Society*]

Books, Tracts, etc. deemed *OBJECTIONABLE* by the Government

Institutions (Educational)

Newspapers, Periodicals, etc.

Personages

যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

অনন্ত সিংহ—অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

অরবিন্দ ঘোষ—কারাকাহিনী

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

কৃষ্ণকুমার মিত্র—আত্মজীবনচরিত

জীবনতারা হালদার—অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী—জেলে ত্রিশ বছর

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়

নলিনীকান্ত গুপ্ত—স্মৃতির পাতা

নাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায—বিপ্লবের সন্ধানে

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বিপ্লবী যুগের কথা

বলাই দেবশর্ম্মা—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় —অগ্নিযুগের মানুষ

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

যোগেশচন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত

রাজনারায়ণ বসু—আত্মজীবনচরিত

শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মজীবনচরিত

Andrews C. F. and Mukherjee H – *Rise and Growth of the Congress*

Annie Besant —*How India Wrought for Freedom*

(*Sri*) *Aurobindo on Himself and on the Mother*

Banerjea Surendra Nath—*A Nation in Making*

Bose Subhas Chandra—*Indian Struggle*

Broomfield J. H.—*Elite Conflict in a Plural Society*

Buckland C. E.—*Bengal under the Lieutenant Governors*

Chattopadhyaya Gautam—*Awakening in Bengal*

Dey Lal Behari—*Recollections of my School-days*
Kling B. B.—*The Blue Mutiny*
Mayhew A.—*Education of India*
Mazumdar R. C.—*India's Struggle for Freedom*
Potts E. D.—*British Baptist Missionaries of India 1793—1897*
Ramgopal—*Lokmanya Tilak*
Ronaldshay (Lord)—*Life of Lord Curzon*
Sedition Committee Report 1918
Singh Roy P. N.—*Chronicle of the British Indian Association*
Hundred Years of University of Calcutta
Ministry of Education, Government of India—*Who's Who of Indian Martyrs*